চলচ্চিত্র
প্রথম পর্যায়

প্রগতির স্বপক্ষে

চলচ্চিত্র

প্রথম পর্যায়

সিগনেট প্রেস : কলিকাতা ২০

প্রথম পর্যায়
আশ্বিন ১৩৫৭
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলিকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
শিবরাম দাস
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট ও ছবি ছেপেছেন
গসেন অ্যান্ড কোম্পানি
১ শর্ট স্ট্রিট
ব্লক তৈরি করেছেন
প্রোসেস অটো অ্যান্ড প্রিণ্ট
২৭৫ বহুবাজার স্ট্রিট
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট
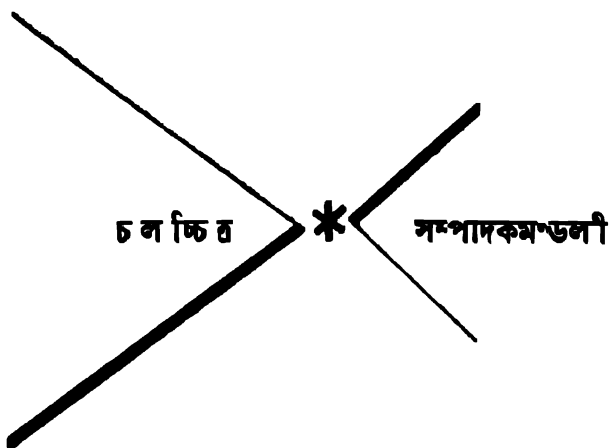
দাম চার টাকা

চলচ্চিত্র
সম্পাদকমণ্ডলী
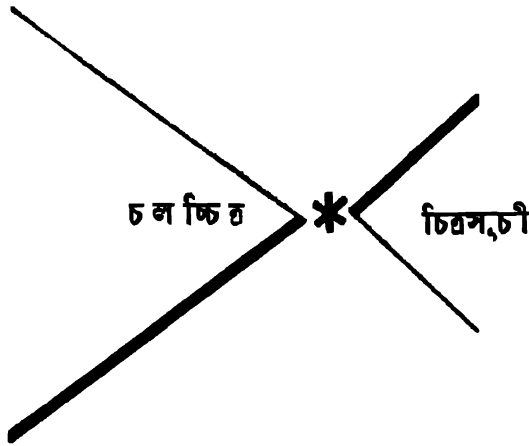
(১) ভিত্তোরিয়ো ডি সিকা (পৃঃ ২২)। (২) রবার্তো রসেলিনী (পৃঃ ২৩)। (৩) অ্যালবার্তো লাতুয়াদা (পৃঃ ২৪)। (৪) জাঁ রেনোয়া ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। (৫) রাধা শ্রীরাম। (৬) 'দি রিভার' চিত্রে বাঙলার আল্‌পনা। (৭) পরিচালনারত রেনোয়া। (৮) পরিচালনারত রেনোয়া। (৯) পরিচালনারত রেনোয়া। (১০) রেনোয়া-র ছবিতে বাঙলাদেশ। (১১) কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সম্বর্ধনা সভায়। স্টার্নবার্গের বিভিন্ন চিত্রে মার্লিন ডিট্রিশ : (১২) 'দি ব্লু এন্‌জেল'। (১৩) 'মরক্কো'। (১৪) 'ব্লন্দ্‌ ভিনাস'। (১৫) 'সাংহাই এক্‌স্‌প্রেস'। (১৬) 'ডিজ্‌অনার্ড্‌'। (১৭) 'স্কারলেট এম্‌প্রেস'। (১৮) 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান'। (১৯) মার্লিন ডিট্রিশের এখনকার ছবি। (২০) নার্গিস। (২১) বেগম পারা (এক)। (২২) বেগম পারা (দুই)। (২৩) মধুবালা। (২৪) কামিনী কৌশল। (২৫) গীতা বলী। (২৬) সুরাইয়া। (২৭) প্রতিমা দাশগুপ্তা। (২৮) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। (২৯) সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। (৩০) শোভা সেন। (৩১) অনুভা গুপ্তা। (৩২) স্মৃতিরেখা বিশ্বাস। (৩৩) কমল মিত্র। (৩৪) বিকাশ রায় ও নীলিমা দাস। (৩৫) বিকাশ রায় ও শিপ্রা দেবী। (৩৬) বিকাশ রায়। (৩৭) অভি ভট্টাচার্য। (৩৮) ব্যঙ্গচিত্র (পৃঃ ৯)। (৩৯) ব্যঙ্গচিত্র (পৃঃ ১২২)।

(১), (২) ও (৩) নম্বর ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন রেবতীভূষণ ঘোষ। ছবি তুলেছেন গোপাল সান্যাল, শম্ভু সাহা, সুনীল জানা, সুব্রত মিত্র ও স্টুডিও এভারেস্ট।

চলচ্চিত্র
সূচীপত্র

নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন, ভাস্কর্য, সাহিত্য ইত্যাদি পরিচিত শিল্পকলার বয়সের তুলনায় চলচ্চিত্রের বয়স এতই কম, তার জন্মবৃত্তান্ত এত আধুনিক, অস্থির শৈশব কাটিয়ে তার সাবালকত্বে পোঁছানোর ইতিহাস এত অল্পদিনের যে চলচ্চিত্রকে অভিজাত শিল্পের বনেদী পাড়ায় আদৌ ঢুকতে দেওয়া হবে কি হবে না—তা নিয়ে মতান্তরের আর শেষ নেই। চলচ্চিত্রের জন্ম ইউরোপে। ক্রমে সেদেশের বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি চলচ্চিত্রকে তাঁদের ষড়-শিল্প-কলার অতিরিক্ত 'সপ্তম-কলা' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন যে চলচ্চিত্রকে এখন আর শিল্প নয় বলে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বিখ্যাত পরিচালক জাঁ ককতো গ্রীক রীতির অনুসরণ করে চলচ্চিত্রকে বলেছেন শিল্পগ্রহমণ্ডলীর দশম গ্রহ বা টেন্‌থ মিউজ। ইউরোপের অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক আর গুণীজন বর্তমানে এই মত পোষণ করেন। অন্য পক্ষে চলচ্চিত্রকে শিল্পের সম্মান দিতে যাঁদের ঘোরতর আপত্তি তাঁদের সংখ্যা কম হলেও নগণ্য নয়। কেন আমরা চলচ্চিত্রকে শিল্পকলা বলে মেনে নিয়েছি—সেকথা বলার আগে, কি কি কারণে এখনো অনেকে চলচ্চিত্রকে পতিত করে রাখতে চান সেকথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

চলচ্চিত্রের জন্মের কোনো কৌলিন্য নেই, তার আদিপর্বের খোঁজে অতীতের অন্ধকারে হাতড়াতে হয় না—এটাই হয়তো অনেকের মতে চলচ্চিত্র যে শিল্পপদবাচ্য নয় তার চাক্ষুষ বড় প্রমাণ। কিন্তু একমাত্র বয়েসের প্রবীণতাই যে কোনো কাজকে শিল্পের মর্যাদা দিতে পারে না সে কথা কে না স্বীকার করবেন? পবিত্র প্রাচীন ভূর্জপত্রে লিখিত হলেও অক্ষম পদ্য কি কবিতা? সাততলা মাটি খুঁড়ে যেমন তেমন ভাবে গড়া পাথরের এক মূর্তি আবিষ্কার করলেই কি তা ভাস্কর্য? কাজেই বিষয়ের প্রবীণতা আর শিল্পের কৌলিন্য এক কথা নয়। আর তা যদি হয় তাহলে প্রকরণের নবীনতা আর শিল্পে অস্পৃশ্যতাই বা সমার্থক হবে কেন?

তার চেয়েও বড় আপত্তির কারণ বোধহয় চলচ্চিত্রের যন্ত্রনির্ভরতা। ক্যামেরা ঘুরিয়ে সেলুলয়েড ফিতের উপরে ছবি তোলা থেকে আরম্ভ করে দর্শকদের সামনে সে-ছবি দেখানোর সময় পর্যন্ত দৃশ্যত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেশি। অথচ আমরা জানি কোনো শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে মানুষ সৃষ্টি করে তার মন, তার কল্পনা, তার কুশলতা। আর সমস্তই হচ্ছে উপায় আর উপকরণ। রসলোকে পৌঁছানোর রাস্তা মাত্র। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে যন্ত্রের বাহুল্যে শিল্পীর স্রষ্টা মন এখানে বুঝি আচ্ছন্ন, অবলুপ্ত। বিশেষত বহুলোকের জটিল সহযোগিতা না হলে, কোনো একজন শিল্পীর একক চেষ্টায় চলচ্চিত্রের সৃষ্টি যখন সম্ভব নয় তখন এ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ ছিল বলেই পিরানদেল্লোর মতো মহৎ লেখকও—মাত্র বছর ত্রিশেক আগে তাঁর এক উপন্যাসে কোনো শিল্পী-জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি দেখাতে গিয়ে তাকে দিয়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা-হাতল ঘুরিয়েছিলেন। তাঁর চোখে তখনকার দিনে সেটাই ছিল শিল্পীর অপমৃত্যু। ত্রিশ বছর আগে সেটা হয়তো মিথ্যা ছিল না। কিন্তু সময়ের বদল হয়েছে। অনেকেই বুঝতে পেরেছেন শিল্পের চর্চায় যন্ত্রের ব্যবহার হলেই শিল্প হিসাবে তা পতিত হবে এমন কোনো কথা নেই। এমন কি অতি জটিল যন্ত্রকেও আয়ত্ত করে শিল্পীর স্রষ্টা-মনের বিকাশ সম্ভব। ত্রিশ বছর আগে কে কল্পনা করতে পারতেন যে টাইপরাইটার যন্ত্র দিয়ে কবিতা লেখা যায়? অথচ ইউরোপের বহু সার্থক কবিই আজকাল কবিতা লিখতে টাইপরাইটার ব্যবহার করেন। আর বহু লোকের সমবেত প্রচেষ্টার কথাই যদি তোলা যায়, তাহলে অজন্তা ইলোরার মতো জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। শত শত শিল্পী আর কারিগরের সহযোগিতা ছাড়া তাজমহলের মতো মহান স্মৃতিসৌধ নির্মাণই কি সম্ভব হত? অথচ তাই বলে এমন কথা কেউ বলবেন না যে তাজমহল শিল্প-কর্মের নিদর্শন নয়। কাজেই চলচ্চিত্রের যন্ত্রনির্ভরতা কিম্বা সমবেত প্রয়াসের ফলে তার নির্মাণকৌশল—এসবও চলচ্চিত্রের পক্ষে শিল্প হওয়ার পথে বাধা হতে পারে না।

তাহলে আর যে আপত্তি উঠতে পারে তা হচ্ছে এই যে আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে যত ছবি তৈরি হয়েছে তার একটা অতি বড় অংশ কুরুচিকর, নিকৃষ্ট। বহু ছবি ধরাবাঁধা নিয়মের ছকে ফেলে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দানের জন্য আঁটঘাঁট বেঁধে তৈরি করা। বহু ছবি গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সে কথা বলতে গেলে সুদীর্ঘ ইতিহাসের তুলনায় সাহিত্য বা চিত্রকলার মধ্যেই বা অসামান্য কীর্তি কতটা? অপরিণত, অযোগ্য, অক্ষম রচনার অবিচিত্র সমভূমির মধ্যে সময়ে সময়ে অসামান্য প্রতিভার শিখর আকাশের দিকে উঠেছে—এই তো? চলচ্চিত্রের ইতিহাস কি তার তুলনায় অন্যরকম?

আসলে উপায় আর উপকরণ বিচার করে শিল্পের জাত বিচার করতে বসা—

নিরর্থক গোঁড়ামি। রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা—সেটাই হল প্রধান কথা। ছন্দোবন্ধ বাক্যরাশি তখনই কবিতা, মাটি আর পাথরে তৈরি মূর্তি তখনই ভাস্কর্য, যন্ত্র বা কণ্ঠযোগে সুরোৎপাদন তখনই গান—যখন তা মানুষের মনে আনন্দের সাড়া জাগাতে পারে। বহু মানুষের সমবেত প্রয়াসে, জটিল যন্ত্র সহযোগে সেলুলয়েডের ফিতের উপরে তোলা চলচ্চিত্র যদি মানুষের মনে সেই রকম অহেতুক আনন্দের জন্ম দিতে পারে, তাহলে রসোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রকেও শিল্পের সম্মান দিতে কুণ্ঠা করলে চলবে না। মানুষের সৃষ্টি-ক্ষমতাকে চলচ্চিত্র নতুন ভাষা দান করেছে। শিল্পের বিচিত্র পদ্ধতির বিকাশ তো এই জন্য প্রয়োজন যে এক পদ্ধতিতে মনের যে ভাব, যে আবেগ যে রকম করে প্রকাশ করা যায় ভিন্ন পদ্ধতিতে ঠিক সে রকম করা যায় না। গান দিয়ে কবিতার কাজ হয় না, কবিতা দিয়ে ছবির কাজ হয় না, ছবি দিয়ে ভাস্কর্যের স্বাদ মেটানো সম্ভব নয়। আবার কবিতা, গান, ছবি কোনো উপায়েই মনের যে ছন্দ প্রকাশ অসম্ভব তার জন্য হয়তো নৃত্যের সাধনা করতে হয়। চলচ্চিত্র যদি রসোপলব্ধির নতুনতর বাতায়ন খুলে না দিত তাহলে শিল্পপ্রকরণ হিসাবে তার অস্তিত্ব থাকা অকারণ হত। কিন্তু একথা আজ কে না স্বীকার করবেন যে প্রচলিত পদ্ধতিতে নৃত্যগীত, এমনকি রঙ্গমঞ্চের অভিনয় আমাদের মনে যে রসের সঞ্চার করে, চলচ্চিত্র তার চাইতেও ভিন্ন কিছু করে, ভিন্ন কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব? চলচ্চিত্রে আমরা কোনো কাহিনীর দৃশ্যরূপ দেখতে যাই। উপন্যাস বা গল্পও আমাদের এই তৃষ্ণা অনেকদূর মেটাতে পারে। উপন্যাসে বা গল্পে আমরা চোখে কিছু না দেখলেও বর্ণনা থেকে মনে মনে সমস্ত দৃশ্য কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু নিছক ভাষা দিয়ে অতি বড় প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেও যা করা সাধ্যের অতীত, দিব্যচক্ষু ক্যামেরার ভাষা দিয়ে চলচ্চিত্র তা সম্ভব করতে পারে বলেই শিল্প হিসাবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মূল্যবান। এই জন্যই বহু প্রতিভাশালী নরনারী আর কৃতী শিল্পী চলচ্চিত্রকে তাঁদের জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন।

বস্তুত চলচ্চিত্রের মতো সার্বজনীন শিল্পরূপ আজ আর দ্বিতীয় একটি নেই। পৃথিবীর সমস্ত দেশে এর জনপ্রিয়তা সে কথাই প্রমাণ করে। গ্রন্থপাঠে নিরক্ষরতা কিম্বা ভাষার ভিন্নতা বাধা হতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা মানুষ মাত্রেরই মনে পৌঁছায়। জীবনের পরিবেশ ভিন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীবনের কান্নাহাসি, সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা কিম্বা সার্থকতার দৃশ্যরূপ সমস্ত মানুষের কাছেই এক। তার কোনো কাল নেই, দেশ নেই। চ্যাপলিনের ছবি দেখে তাই অক্সফোর্ড-এর বিদগ্ধ অধ্যাপক আর পিকিং-এর চীনা ব্যবসায়ী, মার্কিনী টাইপিস্ট মেয়ে আর গৃহসর্বস্ব ভারতীয় মহিলা, এমনকি মরুভূমির বেদুইন, নিউগিনির অধিবাসী—সকলেই হাসতে পারেন কিম্বা সকলেরই চোখ ছলছল করে ওঠে। পরস্পরকে জানা শোনা, পরস্পরের সুখদুঃখের পরিচয়ের মধ্যে দিয়েই দূর হতে পারে নিকট বন্ধু, পর হতে পারে ভাই। জাঁ বেনোয়া লেভীর কথাই একদিন হয়তো

সত্যি হবে—চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেশবিদেশের এই পরিচয় একদিন হয়তো সমগ্র পৃথিবীকে ভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে দেবে।

পৃথিবীর আশীহাজার প্রেক্ষাগৃহে কমবেশি ত্রিশকোটি নরনারী প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চলচ্চিত্রের দর্শক। এ থেকে মানুষের মনে, তার চিন্তায়, তার দৈনন্দিন ব্যবহারে চলচ্চিত্র যে কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ অনুমান যে নিরর্থক নয় তা সমাজতত্ত্ববিদ আর মনোবিজ্ঞানীর আধুনিক গবেষণাই প্রমাণ করছে। কাজেই বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী আবিষ্কার চলচ্চিত্র—এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

পৃথিবীব্যাপী চলচ্চিত্রের এই অসামান্য প্রভাব আছে বলেই তার দায়িত্বও সেই অনুপাতে বেশি। শিল্পসৃষ্টি আমাদের মনে শুধু অকারণ আনন্দের সঞ্চারই করে না, আমাদের মনের মালিন্যও দূর করে, অনুভূতিকে তীক্ষ্ন করে, হৃদয়কে প্রসারিত করে। শিল্প হিসাবে সার্থক হতে হলে চলচ্চিত্রকেও এ দায়িত্বের ভাগ নিতে হয়। বেশি করেই নিতে হয়, কেননা তার স্বর পৃথিবীর এমন সব মনের দরজায় পৌঁছায় যেখানে সাহিত্যের যাতায়াত নেই, কবিতা যেখানে অস্পৃশ্য, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কীর্তি যেখানে নামেমাত্র উপস্থিত। একথার এমন অর্থ করা ভুল হবে যে আমরা চলচ্চিত্রকে সুনীতিবোধ আর প্রেক্ষাগৃহকে পাঠশালায় পরিণত করার পক্ষপাতী। চলচ্চিত্র শুধু চিত্তবিনোদনের উপায়মাত্র নয়, তা মানুষের অমূল্য সংস্কৃতির ধারক এবং পরিবাহক—এটাই আমাদের বলার কথা। ইচ্ছা করলেই চলচ্চিত্রের আশ্চর্য সহ-যোগিতায় আমরা শিল্পের শেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি, সর্বাধিক মানুষের দুর্গম মনের দরজায় পৌঁছিয়ে দিতে পারি সংস্কৃতির সেই শ্রেষ্ঠ বাণী—যে বাণী মানুষকে প্রত্যহের সংকীর্ণ অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়, জাগ্রত করে চৈতন্যের সুস্থ বোধ।

চলচ্চিত্রের এই বিপুল সম্ভাবনাকে যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সমাজে এ বিষয়ে আলোচনা, গবেষণার শেষ নেই। চলচ্চিত্রের কিসে উন্নতি হবে, শিল্প হিসাবে কিভাবে তার আরো বিকাশ হবে তা নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট শক্তি আর চিন্তা প্রতিনিয়ত উদ্যত। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত এবং গুণী ব্যক্তিদের চলচ্চিত্র বিষয়ে উদাসীনতা রীতিমতো প্রকট। এবিষয়ে তাঁদের যে কোনো দায়িত্ব থাকতে পারে সেকথাই তাঁরা বিশ্বাস করেন না। সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত কি নাটক সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হয়, উপেক্ষিত হয় শুধু চলচ্চিত্র। কেননা, তাঁদের চোখে সস্তা মনোরঞ্জন অথবা নিম্নস্তরের চিত্তবিনোদন ছাড়া চলচ্চিত্রের আর কিছুই করার নেই। এদেশে চলচ্চিত্রের একমাত্র আলোচনা করেন তাঁরাই—ভালো করে দু'লাইন শুদ্ধ বাংলা লিখতে গেলে যাঁদের কলম ভেঙে যায়, 'শব্দগ্রহণ আরো ভালো হইলে ভালো হইত,' কিম্বা 'ক্যামেরার কাজ ততদূর সন্তোষজনক হয় নাই'—

এ ধরনের অশিক্ষিত সাধারণ মন্তব্য করা ছাড়া যাঁদের আর কোনো যোগ্যতাই নেই। যে কোনো বিষয়ে যথার্থ আলোচনা করতে গেলে সেবিষয়ে শিক্ষা থাকা দরকার, অধ্যয়ন, অনুশীলন এবং চিন্তা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সমালোচক শপথ করে বলতে পারেন যে ঐ সমস্ত আনুষঙ্গিক বদভ্যাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ-ভাবে মুক্ত।

'চ ল চ্চি ত্র' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের এই মনোভাব দূর করা। শিল্পী, গুণী, দর্শক, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী সকলকেই সামাজিক ও শিল্পীক শক্তি হিসাবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আর তার সম্ভাবনার প্রতি অবহিত করে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পে উন্নতির পথ সুগম করাই আমাদের অভিপ্রায়। কাজেই আমাদের আলোচনা, সমালোচনা প্রবন্ধাদিতে দেশীয় চলচ্চিত্রের কথাই বেশি থাকবে। কিন্তু অগ্রসর দেশের উৎকৃষ্ট ধারার পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। তাই দেশীয় চলচ্চিত্রের শিল্পীক ত্রুটিবিচ্যুতি, নিন্দা প্রশংসা, ব্যবসায় সংক্রান্ত নীতি, এর বর্তমান অবস্থা আর ভবিষ্যৎ গতির আলোচনার সঙ্গে বিদেশীয় চলচ্চিত্রের ধারা, স্মরণীয় স্রষ্টা আর শিল্পীদের জীবন আর সাধনার এবং সুধীব্যক্তিদের এবিষয়ে মতামত প্রভৃতির আলোচনাও আমরা নিয়মিত প্রকাশ করব। বিদেশের অন্ধ অনুকরণে গা না ভাসিয়ে তাদের যথার্থ গুণগুলি যদি আমাদের চলচ্চিত্রে আয়ত্ত করা যায়, তাহলেই সৃষ্টি হবে শক্তিশালী দেশী চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট রূপ, নিজস্ব ভঙ্গী, অন্তরঙ্গ ভাষা।

'চ ল চ্চি ত্রে'র বর্তমান সংখ্যার প্রবন্ধাদি থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য আর দৃষ্টি-ভঙ্গী সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বদেশের খণ্ডিত সীমান্তের মধ্যেই আমরা দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিনি। কেননা শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের ভাষা আন্তর্জাতিক। তা সত্ত্বেও এক ধরনের স্বদেশ প্রেমিকের চোখে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু অতি ম্লেচ্ছ বলে মনে হতে পারে। সে সম্ভাবনাকে মনে রেখেই আমরা এবিষয়ে মনস্থির করেছি। কিন্তু এ অর্থে যাঁরা কঠোর দেশ প্রেমিক নন তাঁদের মধ্যেও অনেককে হয়তো আমরা সন্তুষ্ট করতে পারব না। কেননা বিদেশী চলচ্চিত্রের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের পরম প্রিয় হলিউডকে আমরা তেমন আমল না দিয়ে বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এমন অনেক দেশের প্রতি, একমাত্র ভূগোলে ছাড়া যেসব দেশের অস্তিত্বই এখনো আমরা স্বীকার করতে শিখিনি। প্রথমত সেসব দেশের আশ্চর্য সব চলচ্চিত্র স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমাদের কদাচিৎ আসে মাত্র। এলেও—আমাদের শিক্ষা আর রুচি এখন পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হয়নি যে সেসব ছবি আমরা উৎসাহ নিয়ে দেখতে যাব।

হলিউড চলচ্চিত্রের মাতৃভূমি একথা সকলেই জানেন এবং মানেন। চলচ্চিত্রের

ক্রমবিকাশেও সেই হলিউডের ধাত্রীত্ব আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব। কিন্তু হলিউড আজ বণিক বুদ্ধিতে এতদূর আচ্ছন্ন যে চলচ্চিত্র সেখানে শিল্পসৃষ্টি না হয়ে অর্থকরী বৃহৎ পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে অধিকাংশ হলিউড নিঃসৃত চলচ্চিত্রের সম্পর্ক প্রায় বিপরীত মেরুর তুল্য। অবশ্য চলচ্চিত্র এমন জিনিস যা একাধারে শিল্পসৃষ্টি আর ব্যবসায়ের পণ্য তা জানা কথা। কিন্তু হলিউডের কাছে এই দ্বিতীয়টাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে চ্যাপলিন আর মুষ্টিমেয় জনকতক পরিচালকের তৈরি ছবি ছাড়া হলিউডের বিশেষ কিছুই আজ আর উল্লেখযোগ্য নয়। মার্কিন দেশের গুণী ব্যক্তিরাও একথা স্বীকার করছেন। অথচ তবু আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র এই প্রগতিবিমুখ হলিউডের প্রেমে এরকম আকণ্ঠ ডুবে আছে যে দেখে কষ্ট হয়।

যত টাকা খাটছে আর সংখ্যায় যত ছবি উৎপন্ন হচ্ছে সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হলিউডের পরেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে ভারতের স্থান। এই বৃহৎ ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্র হচ্ছে বোম্বাই আর বোম্বাই হচ্ছে ভারতের হলিউড। হলিউডের মারাত্মক রীতির এমন অক্ষম অনুকরণ পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। তার ফলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটা অতি বড় অংশ মেকী জীবনের দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। হলিউডের তবু একটু সান্ত্বনা আছে যে ব্যবসায় হিসাবে সেখানকার সংগঠনকুশলতা সমস্ত পৃথিবীর ঈর্ষাযোগ্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সে সান্ত্বনাও নেই। চলচ্চিত্র এদেশে না অর্থকরী ব্যবসায়, না উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম। তার মধ্যে একমাত্র বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রে হলিউডের প্রভাব ততটা হয়তো এখনো প্রকট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার পরিবর্তে এমন কোনো দেশীয় শিল্প-রীতিরও জন্ম হয়নি যা বিশেষভাবে বাঙলাদেশের। বাঙালী পটুয়ার আঁকা ছবি, বাঙলাদেশের বাউল আর কীর্তনের সুর, বাংলা সাহিত্য, কবিতা, জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য— সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা বাঙালী চরিত্র আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের সূত্রপাত যদিও সর্বপ্রথমে বাঙলাদেশেই হয়েছিল আর বাংলা চলচ্চিত্রে কাহিনী, শিল্পচাতুর্য, সুরুচির একটা উৎসাহজনক সমন্বয়ের সূচনাও প্রথম এখানেই দেখা গিয়েছিল, তবু এতদিনের মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রে বাঙালীয়ানার বিকাশ হতে পারল না। বাঙলাদেশেই প্রথম সার্থক ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্ম হবে বলে দশ বছর আগেও লোকের মনে যে আশা ছিল তা ভুল প্রতিপন্ন করে, পূর্বগামী স্রষ্টাদের সুনাম নষ্ট করে বাংলা চলচ্চিত্র এখন হলিউডের অপকৃষ্ট ঠাটঠমকের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এই—যেন টাকাপয়সা থাকলে, হায় রে, আমরাও হলিউডের মতো চিত্তচাঞ্চল্যকর ছবি বানাতে পারতাম।

শুধু ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার তাগিদ না থাকলে চলচ্চিত্রকে কতদূর রুচিকর নিপুণ শিল্পকর্ম করে তোলা যায় রুশদেশ তার প্রমাণ দিয়েছে। অর্থকরী

হয়েও শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রের যে কি আশ্চর্য বিকাশ সম্ভব তার প্রমাণ ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালির, এমনকি ইংলণ্ডের অনেক ছবি। দেশী ছবির দোষত্রুটির কথা উঠলেই আমাদের চলচ্চিত্র-নির্মাতারা এই বলে এড়িয়ে যেতে চান যে আমাদের না আছে অর্থ, না আছে আধুনিক যন্ত্রপাতির সামর্থ্য। কাজেই বিদেশের সঙ্গে তুলনা দিতে গেলে চলবে কেন? কিন্তু সত্যি কি কথাটা তাই? অন্ততপক্ষে ইতালির দৃষ্টান্ত মনে রেখে একথা অনায়াসে বলা যায় যে আমাদের অভাব অর্থেরও নয়, যন্ত্রেরও নয়, অভাব হচ্ছে শিল্পরুচির, কলানৈপুণ্যের। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের যাঁরা কর্ণ ধারণ করে আছেন তাঁদের মধ্যে, দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, ব্যবসায়িক বুদ্ধিরও যেমন অভাব, তেমনই অভাব প্রয়োজনীয় শিক্ষা, নিম্নতম সংস্কৃতির। হঠাৎ-বড়লোক হয়ে যাঁরা আরো বড়লোক হওয়ার অভিপ্রায়ে সহজ রাস্তার খোঁজে চলচ্চিত্রের পাড়ায় একদা ভিড় জমিয়েছিলেন—একথা শুধু তাঁদের পক্ষেই সত্য নয়। কাজেই এ'দের অধীনে যাঁরা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেন তাঁদের মধ্যেও নিপুণ লোকের সংখ্যা কম। এই বিরাট অজ্ঞ-সমবায়-সমিতির মস্তিষ্ক এবং হৃদয় থেকে যে জিনিস প্রসূত হয়—সেটাই আমাদের চলচ্চিত্র।

এই অবস্থার বিহিত হতে পারে যদি শিক্ষায়, রুচিতে, শক্তিতে যোগ্যতর লোকরা চলচ্চিত্র জগতের অশুভব্যূহ ভেদ করে এই শিল্পলোকে প্রবেশ করতে পারেন কোনো দিন। বাঙলাদেশের স্টুডিওগুলিতে যে সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা আর দুর্নীতির রাজত্ব চলছে—তা যতদিন চলবে ততদিন ভদ্র ছেলেমেয়েদের কাজ করা একরকম অসম্ভব, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এখনো এবিষয়ে উদাসীন হয়ে থাকলে অচিরেই এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যখন সর্বনাশের হাত থেকে বাংলা চলচ্চিত্রকে কিছুতেই আর বাঁচানো যাবে না।

বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে 'দি রিভার' ছবিটি তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন অধিকাংশই এ দেশের লোক। সুরুচি আর যোগ্যতা থাকলে, কল্পনার প্রসার আর মনের উদারতা থাকলে, কলকাতায় বসেও চলচ্চিত্রে কি পরিবর্তন আনা যায় শিগগিরই আমরা 'দি রিভার' ছবিতে তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে পাব। এমনকি, রেনোয়া-র কথা বিশ্বাস করতে হলে, আমাদের যন্ত্রপাতি নিয়েও আশ্চর্য কাজ করা সম্ভব। বাংলা চলচ্চিত্রের এই দুর্দিনে জাঁ রেনোয়া-র দৃষ্টান্ত যদি আমাদের প্রেরণা দিতে না পারে তাহলে তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কি? আমরা আশা করি রেনোয়া-র সঙ্গে কাজ করার সুযোগ যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা বৃথা হবে না, বাংলা চলচ্চিত্রে সেই অভিজ্ঞতা ব্যবহারের সুযোগও তাঁরা পাবেন। ব্যবসায়ের কথাই যদি ধরা যায় তাহলেও একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে জিনিস ভালো না হলে কেউ টাকা দেয় না। আর্থিক সফলতারও আর কোনো সরল সদুপায় নেই।

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের উন্নতির পক্ষে আরো কতগুলি বাধা আছে। ছবি তোলা হয়; কিন্তু প্রযোজক, পরিবেশক আর প্রদর্শকের মধ্যে সুষম-সহযোগিতা গড়ে তোলার এখনো কোনো ব্যবস্থা নেই। বোম্বাইর প্রযোজকরা এসব বাধা-বিঘ্ন অনেকটা দূর করতে পেরেছেন। পিছিয়ে আছে বাঙলাদেশ। প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শককে কেন্দ্র করে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব বাঙলাদেশে হয়, যথাস্থানে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ব্যবসায় হিসাবে চলচ্চিত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আরো একটা জিনিস অপরিহার্য। সে হচ্ছে সুবিবেচিত বিজ্ঞাপন। খবরের কাগজে ব্যর্থ-বিশেষণ কণ্টকিত অপাঠ্য বাকবিস্তার, দৃষ্টিকটু কুৎসিত প্রাচীরপত্র, আর দেয়ালের গায় রঙচঙ করা ছবি দিয়ে কিছুতেই ভালো ফল পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট ছবি হলে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন দিয়েও কিছু হয় না একথা সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলে বাঙালী দর্শক যখন চতুর্থ শ্রেণীর বিদেশী ছবি দেখতে ভিড় করেন, তখন একথা মনে না হয়েই পারে না যে দক্ষ লোকের সহায়তায় সুবিবেচিত আর রুচিসঙ্গত বিজ্ঞাপন দিতে পারলে এই সব ভ্রান্ত দর্শকদেরই হয়তো—তুলনায় ভালো অথচ সাধারণত উপেক্ষিত বাংলা ছবি দেখতে রাজী করানো চলত। এই এক কলকাতা শহরের জন-সংখ্যাই কমবেশি ষাট লক্ষ। তার মধ্যে অর্ধেক অন্তত বাঙালী। শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ আর অক্ষম লোকের কথা ছেড়ে দিলে এই ত্রিশ লক্ষের মধ্যে অন্তত দশ লক্ষ লোক বাংলা ছবির দর্শক হতে পারেন। অথচ এর অতি সামান্য অংশই বর্তমানে বাংলা ছবির বিষয়ে উৎসাহী।

সর্বশেষে বাঙালী দর্শকদের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে বাংলা ছবিমাত্রেই দেখার অযোগ্য, বাংলা ছবি দেখতে যাওয়া অসম্মানের ব্যাপার—এই কুসংস্কার যেন তাঁরা দয়া করে দূর করেন। খারাপ হলে শুধু বাংলা কেন, যেকোনো ভাষার চলচ্চিত্র বর্জন করুন, কারো আপত্তি হবে না। কিন্তু ভালোমন্দ নির্বিশেষে ইংরেজী বা হিন্দী ছবি সহ্য করে— একমাত্র বাংলা ছবির ক্ষেত্রেই যদি অসহিষ্ণু হওয়া যায় তাহলে একমাত্র শুধু এই অসহযোগিতার ফলেই বাংলা ছবি কোনো দিন দাঁড়াতে পারবে না। বাংলা ছবির প্রধান নির্ভর প্রধানত বাঙালী দর্শকের উপর। একথা অস্বীকার করা যায় না যে দর্শকদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বড় অংশ চলচ্চিত্র দেখতে যান শুধু আর কিছু করার নেই বলে, সময় কাটাবার একটা প্রতিশেধক হিসাবে।

ছবির ভালোমন্দে তাঁদের তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই উদাসীন দর্শকদের নিয়ে চলচ্চিত্রের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। দর্শকদের মধ্যে চলচ্চিত্রের উন্নতি করতে পারেন তাঁরাই, চলচ্চিত্রকে যাঁরা আধুনিক শিল্পরূপ হিসাবে গ্রহণ করে সজ্ঞানে তার যথার্থ উন্নতি কামনা করেন। আরো একটা কথা ভাবার আছে। হিন্দী বা ইংরেজী ছবির কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রায় সকলের কাছেই অবোধ্য

থাকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আর যাই হোক, বাংলা ছবির সমস্তটাই বাঙালী দর্শক বুঝতে পারেন। একমাত্র বাধা হতে পারে বাংলা ছবিতে রুচিবিকার, অভিনয়ের ত্রুটি আর অপরিণত ভাব ভাষা। শিক্ষিত বাঙালী যদি বাংলা ছবির সহৃদয় দর্শক হতে পারেন তাহলে তাঁদের রুচির দাবি চলচ্চিত্র-নির্মাতাকে মেটাতেই হবে।

'চ ল চ্চি ত্র' নিয়মিত সময় অন্তর প্রকাশ করা হবে। দেশী চলচ্চিত্রশিল্পের যথার্থ উন্নতির জন্য আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হতে হলে উৎসাহী পাঠকের সহৃদয় সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা আশা করি সে সহযোগিতা আমরা পাব।

*

"বাত্ এহি আছে, ডাইরেক্টরবাবু, এত্‌তা মরদকা নাচ কভি বক্‌স্‌অফিস হোবে না। হামি বোলচে কি, এক মজেদার আউরত এরাহি সাথে লাগিয়ে দিন...হাম আভি মিস কাক্কুকে ফোন কোরে দিচ্ছি, আপনি গিয়ে লিয়ে আসুন..."
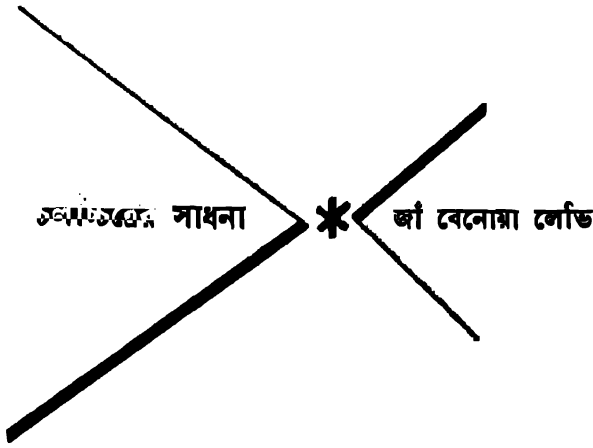
মানুষ মানুষের আপনার জন—সিনেমা একথাই আমাদের উপলব্ধি করাতে পারে। আধুনিক জীবনে সিনেমার অসামান্য প্রভাব। জীবনের হাসি কান্না, সাধনা সংগ্রাম, হতাশা আর সার্থকতা মানুষের জাতি, ভাষা, দেশ বা ভৌগোলিক সীমানা ভেদে ভিন্ন হয় না। কেন না এসব হচ্ছে মানব চরিত্রের মৌলিক উপাদান। দুঃখ আছে, আনন্দ আছে, বেদনা আছে, কৌতুক আছে—সকল কালে, সকল দেশেই এসব যুগপৎ উপস্থিত। যাঁরা চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেন এই সব আবেগ অনুভূতিকে রূপ দিতে হয় বলে তাঁদের পক্ষে মস্ত সুবিধা এই যে সকলের মনেই তার আবেদন পৌঁছয়, সকলেই তার অর্থবোধ করে। সত্যের মতোই তা ধ্রুব। তাই ধর্মবোধ প্রণোদিতই হোক বা রাজনৈতিক সমস্যা সঞ্জাতই হোক, আনন্দ অনুকম্পা-সঞ্চারী চলচ্চিত্র রচনার মধ্যে অসীম সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। এজন্যই চটুল রঙ্গরস বিতরণ করার চেয়েও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া চলচ্চিত্রের প্রতি আমাদের অধিকতর উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখানো উচিত। এমন কথা বলছি না যে বিশুদ্ধ প্রমোদচিত্র তৈরি করার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রমোদচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি সংখ্যায় সেই সব চিত্রও তৈরি করা প্রয়োজন—যার নাম অনেকে দিয়েছেন 'থিংক্ ফিল্ম্'—যেসব চিত্র 'মনে ভাবনার উদ্রেক করে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দর্শকের মনে ভাবনা সঞ্চার করার ভার না নিলে সিনেমার অপমৃত্যু হবে। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস থেকেই দেখা যায় যে সেই সব নাটকই শেষ পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করেছে তাদের ভাবনাকে যার কোনো না কোনো সমস্যা এসে দোলা দেয়, কোনো সমস্যা নিয়ে জাগ্রত বুদ্ধির বিশ্লেষণ থাকে যার মধ্যে। কেননা জীবজগতে চিন্তার ক্ষমতা আছে একমাত্র মানুষের মনে। বলেছি—'সিনেমার অপমৃত্যু হবে', কিন্তু তাই বলে যে সিনেমা একদিন পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে তা নয়। উচ্চতর শিল্পকর্ম হিসাবে তার অপমৃত্যু ঘটবে;

ঘটবে তাদের কাছে যাদের বুদ্ধিবৃত্তি সজাগ, মন সন্ধানী। আর অপমৃত্যু ঘটবে সিনেমার মানবিক দায়িত্বের।

আমেরিকায় সিনেমাশিল্পের বিচিত্র বিষয়ে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার মনে হয় যে ধরনের ফিল্মের কথা আমি বলছি আমেরিকাতেও সে ধরনের ফিল্ম আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত। আমেরিকার সামর্থ্য নেই, সেকথা বলছি না। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ চরিত্র প্রকাশ পায় সেকথাও সত্য। কিন্তু মানবতার তো দেশ নেই! আমেরিকায় তার বিশিষ্ট মার্কিন রূপ প্রকাশ হতে পারত। আর তা হলে জাতীয় বিশিষ্টতার ছাপ থাকা সত্ত্বেও সমস্ত অমার্কিন দেশেও তার আবেদন পৌঁছত; যেসব চিত্তবৃত্তি সমস্ত মানুষের পক্ষে সত্য সকলেই তা উপলব্ধি করতে পারত।

এ বিষয়ে আমার নিজের দেশের প্রয়াসের উল্লেখ করতে হচ্ছে বলে সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে উক্ত উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ফরাসীরা বহু চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। 'সু লে তোয়া দ্য পারি', 'আ নু লা লিবর্তে', 'লা গ্রাঁদ ইলিউসিয়', 'রগ্যাঁ', 'আঁ কার্নে দ্য বাল' প্রভৃতি অনেক অনেক ফরাসী ছবি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর পেয়েছে। দৈবাৎ এসব ছবির জন্ম হয়নি; এসব ছবি একাগ্র প্রয়াসেরই পরিণতি। এসব ছবিতেও হয়তো আমার স্বদেশের পরিবেশ জল হাওয়া আকাশের স্বাদ আছে, কিন্তু নিতান্ত ফরাসী-আনার ঊর্ধ্বে আরো কিছু গুণ এদের মধ্যে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে যার ভাষা সকলের কাছেই বোধ্য।

মানুষের প্রতি মানুষ আজ আস্থা হারিয়েছে। মানুষের এই হৃত আস্থাকে পুনরায় ফিরে পেতে হবে। সমগ্র মানুষের প্রতি প্রীতিবোধের উদ্বোধন না হলে মৈত্রীর আশা দুরাশামাত্র; আর বিনা মৈত্রীতে নিশ্চিত সর্বনাশ। এই বিরাট দায়িত্ব এ যুগের চলচ্চিত্রের সম্মুখে : জীবনের ধ্রুবমূল্যের উদ্বোধনে ফিল্ম যেখানে সহায়তা করতে পারে।

[জাঁ বেনোয়া লেভি বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-পরিচালক,
বর্তমানে ইউনেস্কোর ফিল্ম ডিভিসনের প্রধান কর্মকর্তা]

চলচ্চিত্রের সৃষ্টি

পর্দার গায়ে যে চলচ্চিত্র আমরা দেখি তা তৈরি করতে অন্তত তিনশো বিভিন্ন শিল্প আর কর্ম-প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাগে। হাজার হাজার কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন এই সব ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের কাজে। ছবি দেখার সময় তাঁদের অদৃশ্য হাত কারো দৃষ্টিতে না পড়তে পারে, কিন্তু ছবির প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে তাঁরা উপস্থিত। তাঁরাই চলচ্চিত্রের স্রষ্টা।

বাস্তবের পথে চলচ্চিত্র

সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্রের ইতিহাস পরিধিতে সংক্ষিপ্ত হলেও বহু ঘটনায় আবর্তিত। চলচ্চিত্র প্রবর্তনের পরে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ গেছে, বিশ্ববাণিজ্যের বাজারে ক্রমান্বয়ে সাংঘাতিক ওঠাপড়া হয়েছে, এবং বিজ্ঞান গবেষণায় অকল্পনীয় উন্নতির পরিণতি ঘটেছে পরমাণুর পরম বিস্ফোরণে। চলচ্চিত্রের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানবজীবন, কাজেই মানব-ইতিহাসের সঙ্গে তার ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গী গ্রথিত। মানব সমাজের প্রতিটি পরিবর্তন তার চিহ্ন রেখে গেছে চলচ্চিত্রের বিকাশের পথে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের সৃষ্টি-চেতনাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। আর সেই আঘাতের ফলে চলচ্চিত্র-শিল্প পরিণতির পথে হঠাৎ এক লম্ফে যতদূর অগ্রসর হয়েছে তার প্রতিতুলনা বিরল। যুদ্ধের সময় যন্ত্র-শিল্প উদ্ভাবনায় যা উন্নতি হয়েছে চলচ্চিত্রের পরিণত বিকাশের পক্ষে নিঃসন্দেহে তার দান প্রভূত। ফলে এই শিল্পের মধ্যবর্তিতায় ভাব প্রকাশের শক্তি গেছে অনেক বেড়ে।

ফিল্ম তোলার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির এতদূর আজ উন্নতি হয়েছে যে কল্পনায় কি বাস্তবের জগতে হেন বস্তু নেই পরিচালকের ইচ্ছামতো যাকে দৃশ্যপর্দায় রূপ দেওয়া না যায়। অবশ্য শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট উপাদানই উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির একমাত্র সর্ত নয়, উৎকৃষ্ট পোট্রেট আঁকায় যেমন যথেষ্ট নয় উৎকৃষ্ট ইজেল। উপাদান হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক। যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর অনুভবের প্রকৃতির উপরেই চলচ্চিত্রের তথা সমস্ত সৃষ্টিকর্মের উৎকর্ষের নির্ভর। যদি রুচি না থাকে, যদি কল্পনা পঙ্গু হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্তের সেরা উপাদান একত্র করেও সিদ্ধি হবে না।

যুদ্ধান্তিক চলচ্চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। স্বতন্ত্র কারণবশত ভারতবর্ষকে যদি ধরা না যায় তাহলে দেখা যাবে চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রধান প্রধান দেশগুলি যন্ত্রোৎকর্ষের সচ্ছল সুখ যতই ভোগ করুক

না কেন, সমসাময়িক চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি এসেছে যে দেশ থেকে সেই ইতালিতে সেদিন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ছিল আদ্যিকালের।

ইতালীয় ফিল্মের এই বহুখ্যাত বাস্তবিকতা, সারল্য আর মানবতাই এ যুগের চলচ্চিত্র-শিল্পের যথার্থ সুরের সন্ধান দিয়েছে।

চলচ্চিত্রে এই বাস্তবিকতার প্রবর্তনা বিশেষভাবে যুদ্ধান্ত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, এবং রোমেও তার উৎস নয়। বহুদিন আগে—১৯২৩ সালে হলিউডে 'গ্রীড' নামে যে ছবিটি তোলা হয়েছিল, ফিল্মে বাস্তবিকতার সেটি একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অতুলনীয় চ্যাপলিন-এর সৃষ্টিপ্রেরণাও বাস্তবিকতার গভীরে নিহিত। তাছাড়া পরিদৃশ্যমানের অন্তরালে যে স্বরূপ লুকিয়ে আছে চলচ্চিত্র নির্মাণকারী প্রত্যেক দেশই মাঝে মাঝে তার মর্মোদ্ঘাটন করে দেখিয়েছে। সম্প্রতি সেই পুরাতন ফিল্মগুলি পুনরায় দেখে সকলেই স্বীকার করেছেন যে বাস্তবপন্থী ফিল্ম সময়ের অগ্নিপরীক্ষা যেমন পার হতে পেরেছে আর কোনো ফিল্ম তা পারেনি।

কিন্তু অতীতে সংখ্যায় সেগুলি নগণ্য ছিল। সম্প্রতি গোটা চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রধান গতি হচ্ছে এই বাস্তবিকতার পথে।

বাস্তবিকতা বলতে অবশ্য একটিমাত্র জিনিস বোঝায় না। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে—চলচ্চিত্রের দুদিক থেকে বিচার চলে—ভিতরের বস্তু আর বাইরের রূপ।

কাহিনীর গঠন, সৃষ্ট চরিত্রের সমস্যা, তাদের চরিত্ররূপ, পরস্পরের সম্পর্কঘটিত নাট্যগতির রস আর তাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশভঙ্গী—এই সব হচ্ছে এক শ্রেণীর বিচার্য। গ্রন্থাকারে, চলচ্চিত্রে বা মঞ্চের অভিনয়ে সর্বত্রই কাহিনী বর্ণনা করতে গেলেই এই সব সমস্যা এসে পড়ে।

কিন্তু ফিল্মের যেটা দৃশ্যরূপ—চোখের সামনে আমরা কি জিনিস দেখছি এবং কোন জিনিস কি ভাবে দেখানো হচ্ছে—তার সমস্যা হচ্ছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব সমস্যা। পরিচালক তাঁর ক্যামেরার সাহায্যে কি করেছেন তার উপরেই এই দৃশ্যরূপের নির্ভর।

বলা বাহুল্য পরিচালকের সামর্থ্য অনুযায়ী চলচ্চিত্রের এই দুই অংশেরই প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের কোনো এক অংশের যুগপৎ ব্যাখ্যা এবং যথাযথ প্রতিরূপ আঁকার সময় তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করেন সেটা পরিচালক ভেদেও একই থাকে।

উল্লিখিত দুইটি দিকের কোনো এক অংশে বাস্তব যথার্থতার হানি হলে সমগ্র সৃষ্টির পক্ষে ক্ষতি হয়। আশা উদ্রেককারী বহু মার্কিন ছবি আমাদের যে শেষ পর্যন্ত হতাশ করে তার কারণ হচ্ছে যে উপরোক্ত যে কোনো একদিকে কিম্বা উভয়দিকেই সেগুলির ব্যর্থতা। আর যুগপৎ উভয়বিধ বাস্তবিকতাই ইতালীয় ছবিতে উৎকর্ষের মূল।

বাস্তবমুখিনতাই যখন আধুনিক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য তখন ছবির বহিরঙ্গের

রূপটিকেই ভালো করে আলোচনা করা যাক। কল্পনালোক সৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের যে সব পরিণতি ঘটেছে সে বিষয়ে বর্তমানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেননা বিষয়ভেদে তার রসসৃষ্টির সমস্যাও ভিন্ন।

দৃশ্য-শিল্পরূপের প্রকৃতি বিচার করলেই বাস্তবিকতায় সিদ্ধিলাভের যে কতখানি মূল্য তা হৃদয়ঙ্গম হবে। দেখতে হবে শিল্পস্রষ্টার ব্যবহার্য উপকরণের মধ্যবর্তিতায় বাস্তবিকতাকে কতদূর রসরূপে রূপান্তরিত করা গেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণে চতুষ্কোণ সেলুলয়েড ফিতার উপর বাস্তবদৃশ্যের যথাযথ রূপান্তরের প্রথম সহায় হচ্ছে ক্যামেরা। পরের কাজটুকু চিত্র-সম্পাদকের। চিত্র-সম্পাদকই প্রয়োজন মতো ছাঁটকাট করে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমবায়ে সমগ্র ছবিতে ছন্দগতি এবং ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন।

এই সব পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য বাস্তবিকতার যেটুকু হানি হয় সেটা গ্রাহ্য। শিল্প-সৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রে এই রূপান্তর স্বীকার করতে হয়। শিল্পী মাত্রেই বাস্তব বিশ্বের নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করে থাকেন। বর্জন করে এভাবে গ্রহণ করার মধ্যেই শিল্পীর শিল্পীত্ব। গ্রহণে বর্জনেই বাস্তব বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি শিল্পের নির্দিষ্ট কোনো রূপ দান করে ভাব সঞ্চার করেন।

কিন্তু যেসব উপকরণ নিয়ে শিল্পের সৃষ্টি সেই উপকরণই যদি যথার্থ বাস্তবিক জীবনের বিকৃতি হয় তাহলে তার পরিণামে ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। হলিউডেব অপ্রাকৃত দৃশ্য, জমকালো সাজসজ্জা, লাস্যময়ী নটী আর দর্জির বিজ্ঞাপন সদৃশ নট জীবনের বাস্তবিকতা সৃষ্টির পথে প্রকাণ্ড বাধা।

স্টুডিও-জাত বাস্তবের অনুকৃতি কিছু পরিমাণে প্রকৃত বাস্তবের অভাব পূরণ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু অনুকৃতি যত পুঙ্খানুপুঙ্খই হোক না কেন বাস্তবের সঙ্গে তার প্রভেদ বিস্তর। অপ্রাকৃত পরিবেশ এবং দৃশ্য রচনার এই দুর্বলতা দূর করতে হলে উৎকৃষ্ট কাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টির গভীরতা চাই।

এই জাজ্জ্বল্যমান কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে হলিউডের এতদিন লাগল এটাই তাজ্জবকর। ব্রিটেনেও মাত্র যুদ্ধের সময় ডকুমেণ্টারি ফিল্মের প্রভূত প্রসার হওয়ার ফলে চলচ্চিত্রে সম্প্রতি এই বোধ দেখা দিয়েছে। অথচ যে প্রচুর উপকরণের সম্ভার চলচ্চিত্রে এবংবিধ প্রবঞ্চনার সহায় সেই সমস্ত উপকরণের অভাব থাকাতেই ইতালীয় চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাস্তবপন্থী হতে হয়েছিল। ভালো স্টুডিও না থাকায় বাস্তব দৃশ্য নিয়েই তাঁদের ছবি তুলতে হয়েছে। অভিনয় যাদেব পেশা নয়, তাদের নিলে খরচ কম, কাজেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নর-নারী-শিশুদের নিয়ে তাদের অভ্যস্ত পেশা অনুযায়ী ভূমিকায় অভিনয় করাতে হয়েছে। সুখের কথা এই যে ইতালীয়রা—অন্তত তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা—এ সমস্ত কাঁচা উপাদান নিয়েই আশ্চর্য প্রতিভাবলে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছেন। ইতালীয় ফিল্ম যে আজ এতদূর খ্যাতি পেয়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে, নিঃসন্দেহে সেগুলি তার যোগ্য।

জনকয়েক রুশ চলচ্চিত্র-পরিচালকও অতীতে এ ধরনের পরীক্ষা করেছেন—বাধ্য

হয়ে নয়, তাঁদের শিল্পীক আদর্শের দরুন। তার ফলেই 'পোটেমকিন', 'রোড টু লাইফ', 'চাইল্ডহুড অভ ম্যাক্সিম গোর্কী', 'প্রফেসার ম্যামলক' প্রভৃতি ছবিতে সাম্প্রতিক ইতালীয় ফিল্মের বাস্তবানুগতি এতদূর প্রকট হতে পেরেছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে আজও 'পোটেমকিন'-এর বাস্তবিকতা আমাদের চিত্তহরণ করে—এ বাস্তবিকতা দৃশ্য এবং আন্তর—উভয়বিধ। তবে গঠনরীতির কতিপয় কৌশল নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকার দরুন আইসেন্‌স্টাইন-এর ফিল্মগুলি একটু আড়ষ্ট হয়েছে।

গ্রিফিথ, স্ট্রোহাইম, আইসেন্‌স্টাইন প্রমুখ মহৎ চলচ্চিত্র-শিল্পীরা যেমন বাস্তব-মুখী আধুনিক কাহিনী চিত্রের, ফ্ল্যাহার্টি তেমনি ডকুমেণ্টারি চলচ্চিত্রের আদি স্রষ্টা। এমন কি এই বরেণ্য শিল্পীদের সাধনার ফলেই ডকুমেণ্টারি চলচ্চিত্রের উন্মেষ হয়। সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মনে উল্লিখিত বরেণ্যদের দৃষ্টান্ত যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বিদেশী চলচ্চিত্রের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

আমেরিকায় এই বাস্তবমুখী সার্থক সৃষ্টির মধ্যে 'দি গ্রেপস অভ রথ্', 'অক্স-বো ইনসিডেণ্ট', 'দি লস্ট্ উইক-এণ্ড', 'দি সাদার্নার' প্রভৃতির নাম করা যায়। 'দি মার্চ অভ টাইম' সিরিজের উদ্যোক্তা লুই ডি রশ্‌মণ্ট এদিকে যথেষ্ট উদ্যম দেখিয়েছেন, এবং বাস্তব পরিবেশে স্বাভাবিক নরনারীদের সাহায্যে ছবি তোলার কাজে অগ্রসর হয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

সম্প্রতি একাধিক চলচ্চিত্র প্রযোজকের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে বলে এই মার্কিনী স্টুডিও থেকেই সম্প্রতি বেশ কয়েকখানি এমন ছবি বেরিয়েছে যার বাস্তবানুগতি রীতিমতো তাক লাগায়। আর 'বুমেরাঙ', 'দি নেকেড সিটি', 'ক্রসফায়ার', 'দি সার্চ' বা 'জনি বেলিণ্ডা'-র মতো যেসব ছবিতে পূর্বে উল্লিখিত দ্বিবিধ বাস্তবিকতার মিলন ঘটেছে সে সব ছবিই যুগপৎ রসোত্তীর্ণ এবং অর্থকরী হতে পেরেছে।

বাস্তবসন্ধানী তরুণ চিত্র-পরিচালকের সংখ্যা এখন আর নগণ্য নয়। নাম করতে গেলে এলিয়া কাজান, এডোয়ার্ড ডিমিট্রীক, জুল্‌স্ ড্যাসিন, রবার্ট রসেন, নিকোলাস রে, ফ্রেড জিনেম্যান, মার্ক রবসন প্রভৃতির সঙ্গে আরো অনেকের কথা বলতে হয়। এঁদের মধ্যে সকলের শক্তি এক নয়; কিন্তু অবাস্তব চাকচিক্যের প্রতি এঁদের বিতৃষ্ণা সমপরিমাণে উগ্র। বিষয়ের গভীর মর্ম উদ্ঘাটনে এঁদের সকলেরই সমান আগ্রহ। প্রতিষ্ঠাবান বয়োজ্যেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকেরা পর্যন্ত ধীরে ধীরে এই পথে আসছেন। এই নব্যরীতিতে তাঁদেরও যে আস্থা আছে, তাঁরাও যে এই রীতির শক্তির কথা জানেন তা উইলিয়াম ওয়াইলার-এর 'দি বেস্ট ইয়ারস অভ আওয়ার লাইভ্‌স্', বিলি ওয়াইল্ডার-এর 'দি লস্ট উইক-এণ্ড' আর 'ডাব্‌ল্ ইণ্ডেম্‌নিটি', জন হাস্টন-এর 'ট্রেজার অভ সিয়েরা মাদ্রে' সে কথার সাক্ষ্য দেবে।

ইংলণ্ডে ডকুমেণ্টারি ফিল্মের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, কাজেই এই বাস্তব রীতিতে তাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। অলিভিয়ার-এর সেক্সপীয়ার চিত্র এবং পাওয়েল আর

প্রেসবার্গার-এর ফিল্মে কল্পলোক সৃষ্টির কথা না ধরলে অধিকাংশ ইংরেজ চলচ্চিত্র-পরিচালকই এ পথের পথিক। ডেভিড লীন আর নোয়েল কাওয়ার্ড-এর 'ব্রীফ এনকাউণ্টার' ছবিটি সে দেশে বাস্তবরীতির সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আইরিশ রূপক অনুসরণে ক্যারল রীড অবশ্য প্রতীক পন্থার সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছবিতেও ডাবলিন শহরকে তিনি জীবন্তভাবে উপস্থিত করেছেন। এমন কি ডিকেন্স-এর 'অলিভার টুইস্ট' আর 'গ্রেট এক্সপেক্টেশান্স'-এর চলচ্চিত্ররূপ-এ লীন আশ্চর্য নিপুণভাবে উনিশ-শতকী ইংলণ্ডের পুনরাবতরণা করেছেন।

যে ফরাসী ছবির কথা আমরা প্রচুর শুনি, সামান্য দেখি—সেই ফরাসী ফিল্মেও বাস্তবিকতার প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সাম্প্রতিক ফিল্মগুলিতেও—অন্তত খবর পড়ে যা মনে হয়—এর ব্যতিক্রম নেই। জাক বীকার, জর্জ ক্লুজো, জাঁ দেলানয় আর ক্লদ ওতাঁ-লারা-র ন্যায় তরুণ চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা রেনোয়া, কার্নে, দ্যুভিভিয়ে, প্যাঞোল-এর ন্যায় অগ্রজগুণীদের সাধনার উত্তরাধিকার লাভ করে বাস্তবপন্থী চলচ্চিত্রের ধারা অব্যাহত রাখছেন।

ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রও এই এক পথেই চলেছে। প্রবন্ধ শেষ করার আগে আর একবার ইতালীয় সিনেমায় ফিরে আসা যাক। ইতালীয় ফিল্ম এত আলোড়ন তুলেছে কেন ভেবে দেখতে গেলে কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। হলিউড এতকাল ধরে তিলে তিলে যে সমস্ত অবাস্তব রীতির প্রতিষ্ঠা করেছে, একমাত্র ইতালি পেরেছে সেই আজগুবী রীতিকে ফুঁ দিয়ে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে। অভিনয়ের জন্য তারকারাজি সম্মেলন করার রীতি যে কত বড় বিরাট মূর্খতা, ইতালীয়রা তা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে ছবি তুলতে কুবের ভাণ্ডার উজাড় করার, কিম্বা চটুল চাকচিক্যের জৌলুষ দেওয়ার এবং সেই ছবি কাটতির জন্য একটা বিশ্বব্যাপী হৈহৈ রৈরৈ আওয়াজ তোলার কোনোই প্রয়োজন নেই। বলতে গেলে প্রায় সূচনা থেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়েছে বলে ইতালীয়রা চলচ্চিত্রের মূল ভিত্তির সন্ধান রাখেন। ব্যাপারটা বড় সহজ হয়নি। চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতিটাই তো জটিল। কিন্তু তার মধ্যেই ইতালীয়রা সারল্যে, সততায়, বাস্তবিকতায় সিদ্ধি-লাভের চেষ্টা করে এসেছেন। নতুন পদ্ধতির এই নতুন পাঠশালায় রসেলিনী, ডি সিকা, ভিস্‌কোন্তি, লাতুয়াদা—এ'রাই হচ্ছেন গুরু। দেশ নির্বিশেষে তাঁদের সাধনা প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাতার অনুকরণযোগ্য। এ'দের বিষয়ে আলোচনা পাঠ করলেও মনে উৎসাহ জাগে। চলচ্চিত্রের মানুষ যে স্বাভাবিক মানুষের মতোই হাত-পা নেড়ে কথাবার্তা বলে, পুতুলের মতো মুখ নাড়ে না, এবং তার দৃশ্যাবলী যে হাতে আঁকা পট না হয়ে যথার্থই বাস্তব দৃশ্য হতে পারে, আমাদের চলচ্চিত্র পরিচালকবর্গ হেন কথা কোনো কালে শ্রবণ করেছেন বলেও বোধ হয় না। ইতালীয় ফিল্মগুলি স্বচক্ষে দেখলে তাঁদের সম্বিৎ হতে পারে।

চলচ্চিত্রে ইতালীয় ধারা

মীরা সেন

সিনেমার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে তার পঞ্চাশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে তার প্রেরণার কেন্দ্র দেশ থেকে দেশান্তরে গতিশীল। চলচ্চিত্রের [illegible]। কখনো এর অঙ্কশায়িতা কখনো ওর; পর পর হলিউড, জার্মানি, রাশিয়া, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকে প্রকাশ করেছে। আরো দেখা যায় যে সিনেমার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হয়েছে ব্যবসায়িক শৃঙ্খলার চৌহদ্দির মধ্যে নয়; বরঞ্চ ব্যবসায়িক ছাঁদের বাইরে ছবি তৈরি যেখানে আর্থিক অনিশ্চয়তায় সংকটাপন্ন, সেখানেই তার আশ্চর্য পরিণতি। তাই যুদ্ধের পূর্বে ফরাসী সিনেমা যখন সারা পৃথিবীর শিক্ষাগুরু তখন রেনোয়া, কার্ণে, প্রেভে ও ভিগো এবং সেযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা পৃথিবীর একাধিক শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাণ করেছেন দারুণ আর্থিক দুর্গতির মধ্যেই। ডকুমেণ্টারি ছবির চরম উৎকর্ষ যে ইংরেজ সিনেমাশিল্পীরা দেখিয়েছিলেন আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে সারা পৃথিবীতে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত।

কিন্তু ইতালিতে ডি সিকা, রসেলিনী বা লাতুয়াদা প্রমুখ শিল্পীদের সিদ্ধি-লাভের পিছনে আর্থিক অনটন এবং অনিশ্চয়তা ছাড়াও আরো অনেক কারণ ছিল। ইতালি তখন প্রকৃতপক্ষে জার্মানির কবলে। তার ফলে এঁদের শিল্পীমন পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছিল। তারপর যখন যুদ্ধ লাগল দেখতে দেখতে সারা দেশটা ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। চতুর্দিকে তখন শুধু অরাজকতা আর নির্মম দারিদ্র্য। এদিকে ফাশিস্ট আমলের নানা বিধিনিষেধ তখনো দেশ থেকে একেবারে বিদায় নেয়নি। ছবি তৈরির কোনোরকম সুবিধেই তখন ছিল না, কারণ ইতালির গোটা চলচ্চিত্রশিল্পটাই তখন লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থারই ফল হয়ে দাঁড়াল মহৎ। দিনের পর দিন অত্যাচার সয়েও ভিক্ষা এবং ঋণলব্ধ মালমশলার সাহায্যে এই শিল্পীরা যে সব ছবি সৃষ্টি করলেন তার তুলনা নেই। রাতারাতি ইতালি চলচ্চিত্র শিল্পের পীঠস্থান হয়ে

দাঁড়াল। বিখ্যাত অভিনেত্রী ভ্যালেণ্টিনা কার্জের ভাষায়, ডি সিকার 'শু শাইন', রসেলিনীর 'ওপেন সিটি' এবং লাতুয়াদার 'উয়িদাউট পিটি' আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে জীবনের অতর্কিত রূপটিকে ধরেছে। এই ছবি কখানি নিয়ে শুধু যে সমালোচক, চিত্রবিশারদ ও বাছাই করা দর্শকেরাই মেতে উঠেছিলেন তা নয়, ইংলণ্ডের অতি সাধারণ দর্শকেরা পর্যন্ত এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। যার ফলে ইংলণ্ডের চিত্রনির্মাতারা এমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ইংলণ্ডে ভালো বিদেশী ছবি দেখানোই প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, কারণ তাতে তাদের তৈরি ছবির দৈন্য বড় প্রকট হয়ে পড়ে। একটা কথা এখানে বলে রাখা ভালো। বিদেশের কথা বাদ দিলেও খোদ ইতালিতেই উপরোক্ত তিন শিল্পী বা অন্য যে কোনো নামকরা নব্য-বাস্তববাদী পরিচালকের কোনো সার্থক ছবি দেখতে পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। স্থানীয় শিল্পপতিরা এবং শহুরে দর্শকেরাও এসব ছবিকে পাত্তা দিতে নারাজ। তারা বরঞ্চ হলিউডের ছাঁচে ইতালীয় বিয়োগান্ত নাটকের রস পরিবেশন করে হলিউডের সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দেবেন।

ডি সিকা, রসেলিনী এবং লাতুয়াদা—তিন জনেরই শিল্পদৃষ্টিতে যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়, যথা, কৃত্রিম পরিবেশের চাইতে বাস্তবের দিকে এবং অপেশাদারী অভিনেতাদের নিয়ে ছবি তোলার দিকে এ'দের সকলেরই ঝোঁক বেশি। ইতালীয়দের একটা স্বাভাবিক অভিনয়-ক্ষমতা থাকার দরুন এবং ইতালীয় পরিবেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকু ছবিতে সহজেই ধরা পড়ে বলে অবিশ্যি এ'দের কাজের অনেক সুবিধে হয়েছে। বেশিরভাগ ইতালীয়কেই যে নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে অহর্নিশি লড়াই করতে হয় তার সম্বন্ধে এ'রা অতিমাত্রায় সচেতন এবং সুন্দর স্বচ্ছল জীবনের উল্লেখ এ'দের ছবিতে যতটুকু পাওয়া যায় শ্লেষই তাতে মুখ্য।

ইতালির চলচ্চিত্রশিল্প যেভাবে মার্কিন এবং ইতালীয় মূলধনের আওতায় পড়ে স্রেফ ব্যবসায় পরিণত হবার উপক্রম করেছে তাতে এই তিন জন শিল্পী বেশ একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তবে আশার কথা এই যে এখন পর্যন্ত শিল্পটিকে পূর্বোক্ত মূলধনীরা একেবারে গ্রাস করতে পারেনি। তাছাড়া তিন জনেরই ব্যক্তিত্ব এত প্রখর যে হলিউডের একাধিক লোভনীয় আমন্ত্রণেও তাঁদের মন টলেনি। আবার আর একটা ব্যাপারও এ'দের পক্ষে শাপে বর গেছের। সেটা হল ইতালীয় প্রতিষ্ঠান-মাত্রেরই স্বাভাবিক শৃঙ্খলাহীনতা। এছাড়া 'শিল্পের' প্রতি ইতালীয়দের জন্মগত মর্যাদাবোধ তো আছেই। এই শিল্পের কদর ইতালির বাইরেও বর্তমান।

উৎসাহের আতিশয্যে যাঁরা এককালে বলেছিলেন, 'চলচ্চিত্রশিল্পে গত বিশ বছরে রসেলিনীর মতো প্রতিভা আর জন্মায়নি', তাঁরাই এখন স্বীকার করেন যে ডি সিকার প্রতিভা আরো গভীর আরো ব্যাপক। ভিত্তোরিয়ো ডি সিকা শিক্ষিত সুদর্শন মানুষ। সাতচল্লিশের কোঠায় বয়স। অতি অমায়িক। ১৯৪০ সালে প্রথম ছবি তৈরির কাজে হাত দেন। তার আগে বহু ইতালীয় ছবিতে তিনি বালক-

চরিত্রে এবং হাল্কা ধরনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর নিজের তৈরি ছবির ক্ষেত্রে সাধারণত তিনি অনেকের সহযোগিতায় চিত্রনাট্য লিখে থাকেন। তবে তাঁর স্বরচিত চিত্রনাট্যও কিছু আছে। গোড়ার দিকে অর্থাৎ 'শু শাইনে'র আগে পর্যন্ত তাঁর কোনো ছবিই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মোটামুটি উপভোগ্য। কিন্তু ১৯৪৬ সালে তোলা 'শু শাইন' ছবিটিতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগেকার ছবিতে যে সস্তাভাব ছিল সে সব কাটিয়ে উঠে তিনি যেন নবচেতনা লাভ করলেন। জীবনের বাস্তবতাকে হুবহু ফুটিয়ে তুলতে তিনি তাঁর ছবি থেকে পেশাদার অভিনেতাদের পর্যন্ত বর্জন করলেন।

তাঁর নতুন ছবি 'লাদ্রি দি বিসিক্লেত্তে', বা 'বাইসিকল্ থিভ্স্' তাঁর এই বাস্তব দৃষ্টির একটি আশ্চর্য নিদর্শন। তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য বিকাশ এই ছবিটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রথমবার রোমে এই ছবিটি দেখবার পর মনে হয়েছিল 'ল্য জুর স্য লেভ' (১৯৩৪) ছবির পর এত সার্থক সৃষ্টি আর হয়নি। আর একবার দেখলে নিশ্চয়ই রেনে ক্লেয়ারের সঙ্গে একমত হব যে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এটিই সব চেয়ে সার্থক সৃষ্টি। এই ছবির নায়ক হালের বাস্তবঘেঁষা অন্য যে কোনো ইতালীয় ছবির নায়কের মতোই এক নগন্য ব্যক্তি। যে-নিয়তি তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ করছে, সেই নিয়তির বিরুদ্ধেই তার জেহাদ। শঙ্কিতচিত্ত ভাগ্যানিপীড়িত এই হতভাগ্য যেন ইতালির ভাগ্য-বিপর্যয়ের প্রতীক। 'বাইসিকল্ থিভ্স্'এ ডি সিকা 'শু শাইনে'র ভাবালুতা এবং দৃশ্যসৌন্দর্যের মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। কোথাও কোনোরকম কারুকার্য না করে গল্পটিকে তিনি সরাসরি বলে গেছেন এবং তাতে সাফল্যও লাভ করেছেন আশ্চর্যরকম।

'বাইসিকল্ থিভ্স্' ছবিটিতে শোনবার চাইতে দেখবার জিনিসই বেশি। রোমের এক শ্রমিক ও তার শিশুপুত্রের জীবনের এক মলিন ভাগ্যলাঞ্ছিত দিনের কাহিনী নিয়েই এই ছবি। ল্যামবার্তো ম্যাজিওরানি, যিনি শ্রমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, একজন সাধারণ কামার। বেকারত্বের গ্লানি তাঁর মন থেকে গিয়েও যায়নি। বালক এঞ্জো স্তাইওলা, যার অবিশ্বাস্য অভিনয় প্রতিভা, অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে।

গল্পটিও অত্যন্ত সরল সুন্দর। ছবির নায়ক বহুকাল যাবৎ বেকার। হঠাৎ সে রাস্তায় রাস্তায় প্ল্যাকার্ড মারার একটা কাজ পেয়ে গেল। কিন্তু একাজ করতে গেলে একটি সাইকেল দরকার। তার নিজের বাঁধা দেওয়া সাইকেলটিকে ছাড়িয়ে আনতে সে পরিবারের সকলের জামাকাপড় বাঁধা দিলে। তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। কিন্তু প্রথমদিনই সকালে রিটা হেওয়ার্থের পোস্টার লাগাবার সময়ে সাইকেলটি চুরি গেল। রোমের অলিতে গলিতে হারানো সাইকেলের খোঁজে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এলোমেলোভাবে বৃথাই ঘুরে বেড়াল। শেষটায় উপায়ান্তর না দেখে

বাড়িতে স্ত্রীর গালাগালের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বোকার মতো আর একজনের সাইকেল চুরি করে বসল। ধরাও পড়ল। শেষটায় সাইকেল মালিকের কাছে প্রচুর গালমন্দ খেয়ে ছেলের হাত ধরে মুখচুন করে বাড়ি ফিরে এল। এই একটি দিনের উদয়াস্তের মধ্যেই ইতালীয় জীবনের স্বরূপটি সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে—চতুর্দিকে আছে শুধু হতাশা আর শ্রীহীনতা, আর আছে চার্চের দায়-সারা নিস্পৃহ কৃপা, আর সর্বদুঃখের সস্তা ওষধি—ব্যাধিবর্জিত সরকারী বেশ্যালয় ও বস্তির গণকঠাকুরের দল। বিদেশী ভ্রমণকারীর চোখে-দেখা সে রোমনগরী এ নয়, এর স্বরূপ ভিন্ন। আলোচ্য ছবিতে এই মর্মান্তিক অবস্থার কোনো সমাধান না মিললেও একেবারে নিরাশার সুরে কাহিনীর শেষ হয়নি। হতভাগ্য শ্রমিকটি শেষ পর্যন্ত সঙ্গীসাথীদের সহানুভূতি ও অন্তরঙ্গতার গুণে নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতকেও কাটিয়ে উঠল। এটাই আশার কথা।

রবার্তো রসেলিনীর বয়স তেতাল্লিশ। রোমের এক অবস্থাপন্ন এঞ্জিনীয়ারের ছেলে। যেমন অদম্য তাঁর উৎসাহ, তেমনি উদ্দাম অসহিষ্ণু তাঁর চরিত্র। ১৯৩৫ সালে তিনি প্রথম ইতালির চলচ্চিত্র শিল্পে যোগ দেন—একেবারে নিচের ধাপে। তার আগে তিনি স্রেফ্ হেসেখেলেই সময় কাটাতেন। ১৯৩৮ সালে তিনি চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করে দিয়েছেন এবং ছোটো ছোটো ডকুমেণ্টারি ছবিও তুলছেন। সারা যুদ্ধের সময়টা তিনি বহু বড় ছবির (ফিচার) উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু তাঁর কবিমন বেশিদিন বাঁধাধরা গণ্ডিতে বদ্ধ রইল না। ফলে চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল। ১৯৪৪ সালে তিনি 'ওপেন সিটি' ছবির কাজে হাত দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু মালমশলা, যন্ত্রপাতি বা অর্থ কোনোটাই তাঁর নেই। অগত্যা টাকা ধার করলেন, যথাসর্বস্ব বিক্রি করলেন নয় বাঁধা দিলেন। ছবি তৈরি হল। বিক্রিও হয়ে গেল। কিন্তু রসেলিনী যে কপর্দকহীন সেই কপর্দকহীন। এটাই তাঁর জীবনের ধরন। চিত্রনির্মাতার পক্ষে এধরনের জীবন হয়তো বা বাঞ্ছনীয়, কারণ এতে আর যাই হোক বৈচিত্র্যের অভাব হবে না।

সমসাময়িক অন্য সব দেশের ছবির একঘেয়ে পালিশকরা রূপের পাশে 'ওপেন সিটি', 'পাইসান' ও 'জার্মানি ইয়ার জিরো' ছবি তিনটির সহজ অমার্জিত রূপ আশ্চর্য তৃপ্তিদায়ক। ধরাবাঁধা নিয়মে আঁকা নিষ্প্রাণ কোনো ছবির পাশে যেন হৃদয়ের উত্তাপে প্রাণবন্ত একটি বিচিত্র খসড়া—স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুঃখের বিষয় 'পাইসান'-এর পর রসেলিনী তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ছবি করেননি। আনা মানিয়ানির অভিনয়-প্রতিভাকে ভিত্তি করে তোলা দুখণ্ডে সম্পূর্ণ ছবি 'আমোরে'-র প্রথম এবং দীর্ঘতর খণ্ডটিতে ('দি মিরাক্‌ল') রসেলিনীর প্রতিভার স্বাক্ষর কিছুটা মেলে। এই সু-অভিনীত এবং মর্মস্পর্শী চিত্রটিতে কাহিনীকার হিসেবে রসেলিনী অনেকখানি এগিয়েছেন। এ জন্য প্রচলিত শিল্পরীতিকে বহুলাংশে তিনি হয়তো উপেক্ষা করেছেন। সরল এক কৃষককন্যাকে নিয়ে এই

ছবির কাহিনী। কৃষককন্যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আনা মানিয়ানি। কুসংস্কারের ঘোরে এই সরল মেয়েটি সেণ্ট জোসেফ ভ্রমে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেহদান করেছে। গ্রামশুদ্দু লোকের টিট্‌কিরি সত্ত্বেও মেয়েটির ঘোর আর কাটতে চায় না। অধীর আগ্রহে সে তার ভগবৎদত্ত সন্তানের শুভজন্মের প্রতীক্ষা করছে। এই হল সংক্ষেপে ছবির কাঠামো। 'দি মিরাক্‌ল'-এ শক্তি, সৌন্দর্য ও করুণার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। এই ছবি এবং পরবর্তী 'স্ট্রম্বোলি'র মাঝে চিরাচরিত সম্বলহীন অবস্থায় রসেলিনী একটি রূপকথাঘেঁষা হালকা ছবি করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ছবির কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি। কারণ সম্পাদকেরা নাকি বহু চেষ্টা করেও ছবিটিকে দর্শনযোগ্য করে দাঁড় করাতে পারেননি।

অ্যালবার্তো লাতুয়াদার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। ছোট্টখাট্টো কৃষ্ণকায় মানুষটি। গোড়ায় ছিলেন স্থপতি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সিনেমার মোহে পড়ে যান। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে লাতুয়াদা যুদ্ধোত্তর ইতালির ঘটনাবলী নিয়ে 'ইল ব্যানডিটা' ('দি ব্যানডিট') ও 'সেন্‌জা পিয়েতা' ('উয়িদাউট পিটি') নামে দুখানি অতি দুর্ধর্ষ-গোছের ছবি তৈরি করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালির তিক্ততা এবং রুক্ষতাই এই ছবি দুটির প্রাণসম্পদ। এঁর অন্য সব ছবিতে হৃদয়ের উত্তাপ তত লাগতে পারেনি কারণ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের মনোরঞ্জনের জন্য এসব ছবিতে তিনি আঙ্গিক নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছেন।

লাতুয়াদার সাম্প্রতিক ছবি 'ইল মুলিনো দেল পো'তে ('দি মিল অন দি পো') কল্পনার সঙ্গে দৃশ্যসম্পদের অপূর্ব যোগাযোগ ঘটেছে। যে যুগের কাহিনী নিয়ে এই মনোজ্ঞ ছবিটি তৈরি হয়েছে সেটি চিত্রনির্মাণের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন যুগ, কারণ আমাদের স্মৃতিতে সেই যুগ এখনো জীবন্ত। যুগটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। পো উপত্যকার করুণ সুন্দর পরিবেশে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংঘাতের একটি কাহিনী নিয়ে এই ছবি। কাহিনীর পরিণতি শোকে এবং অনিবার্যভাবেই, কারণ লাতুয়াদার উদ্দেশ্যই ছিল দারিদ্র্য এবং শান্তির মরীচিকার প্রলোভনে দোলায়িত একটি সমাজের জ্বালাযন্ত্রণা এবং বাসনাকামনাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা। এর পর 'মিস ইতালি' নামে একটি ছবি তৈরি করবার জন্য লাতুয়াদা প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে যাদের সৌন্দর্যের রাণী (বিউটি কুঈন) বলা হয় তাদের উত্থান ও পতন নিয়ে ব্যঙ্গ করাই ছিল এই ছবিটির উদ্দেশ্য। কাহিনীর শেষাংশটুকু লাতুয়াদা বিদ্রূপাত্মক না করে আনন্দময়ই করেছিলেন—মোহ ভাঙলে বিউটি কুঈন বা সৌন্দর্যের রাণী আবার তার স্বপরিবেশে ফিরে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'লাক্স ফিল্‌মস' নামক চিত্রপ্রতিষ্ঠান এই ছবি তুলতে রাজী হননি। লাতুয়াদা এজন্য 'লাক্স ফিল্‌মস'কে ক্ষমা করেননি, ডি সিকা এবং রসেলিনীর মতো তিনিও নিজের ছবি নিজেই তুলতে শুরু করেছেন—আমাদের দেশের পরিচালকেরা যেটা কল্পনাও করতে পারেন না।

ভিত্তোরিয়ো ডি সিকা

হালের যে তিনজন ইতালীয় পরিচালক চলচ্চিত্রজগতে নাম করেছেন তাদের মধ্যে 'শু শাইন' এবং 'বাইসিক্‌ল থিভ্‌স্‌' ছবি দুটির নামজাদা পরিচালক ভিত্তোরিয়ো ডি সিকাই বোধহয় সবচেয়ে প্রতিভাশালী। চলচ্চিত্রজগতের নেতৃস্থানীয় অনেকেই ডি সিকাকে চ্যাপলিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাহিনী এবং কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করে সাজাবার কৌশল চ্যাপলিনের মতোই তাঁর করায়ত্ত, আর চ্যাপলিনের মতোই এমন সহজ ছন্দে তিনি তাঁর কাহিনীকে বিবৃত করেন যে ইতালীয় ভাষা যারা বোঝে না তাদেরও কাহিনী অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না বা টিপ্পনির সাহায্য নিতে হয় না। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি হাজারো ঘটনা থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তাতে দরকার মতো রঙ চড়িয়ে আশ্চর্য মুনশীয়ানার সঙ্গে ডি সিকা তাঁর ছবিতে শ্লেষ, বিদ্রূপ, তামাশা বা গভীর বেদনাবোধ ফুটিয়ে তোলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বাস্তববোধ সার্থক। যে-রকম স্বচ্ছন্দে তিনি দর্শকের মনকে তাঁর কল্পনালোকে টেনে নিতে পারেন এবং অভিভূত করে ফেলেন তাতে তাঁকে চ্যাপলিনের সমপর্যায়ে অনায়াসেই ফেলা যায়।

রবার্তো রসেলিনী

'ওপেন সিটি', 'জার্মানি ইয়ার জিরো' এবং 'দি মিরাক্‌ল' চিত্রত্রয়ের খ্যাতনামা পরিচালক সবেমাত্র তাঁর চতুর্থ ছবি 'স্ট্রম্বোলি' শেষ করেছেন। ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ এবং চিত্রনাট্য রচনা করা রসেলিনীর স্বভাব। স্বভাবটি অবশ্য মোটেই ভালো নয় এবং চিত্রনির্মাণের আদিযুগের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছবি তোলার আগের মুহূর্তে কোনোরকমে দৃশ্যপট সাজিয়ে নিয়ে রসেলিনী কাজ সারেন। ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিশৃঙ্খলাই তাঁকে প্রেরণা যোগায়—তাঁর কবিমনকে স্বচ্ছন্দবিহারের সুযোগ করে দেয়, যার জন্যেই শত দোষ ত্রুটি এবং জায়গায় জায়গায় সস্তা প্যাঁচ সত্ত্বেও তাঁর ছবি আশ্চর্য রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। তবে এইভাবে ছবি তৈরি করা রচয়িতার সহজ কল্পনাশক্তিতে যতক্ষণ পর্যন্ত ভাটা না পড়ে ততক্ষণই সার্থক।

অ্যালবার্তো লাতুয়াদা

যুদ্ধোত্তর ইতালির পটভূমিকায় তোলা 'দি ব্যানডিট' এবং 'উয়িদাউট পিটি' নামে দুটি অতি দুর্ধর্ষ, নির্মম এবং হৃদয়স্পর্শী ছবি এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রাম কাহিনীর চিত্ররূপ 'দি মিল অন দি পো' ছবিটির পরিচালক হিসেবেই অ্যালবার্তো লাতুয়াদার খ্যাতি। বাস্তবতার দিক থেকে শেষোক্ত ছবিটি যে কোনো রুশদেশীয় কস্ট্যুম ফিল্মের সমতুল্য। লাতুয়াদার ছবিগুলিতে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে ক্রোধ আব হতাশা। তাঁর শ্লেষ যেমন মর্মান্তিক, তাঁর মনে করুণার খাতটিও তেমনি অতলস্পর্শী। রসেলিনী বা ডি সিকার মার্জিত সারল্যের থেকে ভিন্ন এর রসমাধুর্য। আশ্চর্য পরিণত লাতুয়াদার কল্পনাশক্তি আর আশ্চর্য তাঁর দৃশ্যসংস্থান জ্ঞান।

গত দু বছরে যখন বহু কারবারেই ভাঁটা পড়ে আসছে তখন অন্তত গজ ফুট ও টাকা আনার দিক থেকেও যে চলচ্চিত্র-ব্যবসা এগিয়ে গেছে এটা কম আশ্চর্যের নয়। সংখ্যার কথাটা প্রথমে ধরা যাক। ১৯৪৮ সালে তেতাল্লিশখানি বাংলা ছবি নিয়ে মোট একশো চুরাশিটি নতুন ছবি কলকাতায় দেখানো হয়। গত বছর সেই জায়গায় দেখানো হয়েছিল একশো তিরানব্বইটি, তার মধ্যে বাংলা ছবি ছিল ছাপান্নখানি। আর ১৯৪৮ সালে যেখানে মাত্র ছয়খানি নতুন ছবি স্থানাভাবে দেখানো সম্ভব হয়নি গত বছর তার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে সাতচল্লিশে। দর্শক সংখ্যা কিম্বা ছবি দেখাও যে বেড়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গত দুবছরের আমোদকরের হিসাব থেকে। এ কথা সত্যি যে ১৩৫৬ সালে বিভিন্ন প্রদেশে আমোদকরের হার বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই উঁচু হার দিয়েই এই খাতে প্রায় দেড়গুণ রাজস্ব বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

উপরের এই হিসাবগুলি নিয়ে কোনো তর্কের সুযোগ নেই, গত বছরে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের দৈহিক স্ফীতি নিঃসন্দেহ। কিন্তু গুণাগুণের দিক থেকে দেখলে ভারতীয় ছবি কি অবস্থায় আছে তার উত্তর এত সহজে দেওয়া যায় না। অনেকে বলেন যে দেশী ছবি আগের চেয়ে খারাপ না হলেও উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই। আবার অনেকের ধারণা আজকালকার ছবি আগেকার চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে। ছবির উৎকর্ষতা নিয়ে এই মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। দর্শকদের মাথাগুনতি করে ছবির গুণাগুণ নিরূপণ করা যায় না। আমাদের দেশে তো নিশ্চয়ই, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও, সাধারণ দর্শক ছবি দেখতে গিয়ে ভালোমন্দ বিচার করেন না, কারণ তাঁর সে মনই তৈরি হয়নি। দর্শকের দিক থেকে ভালো ছবির কড়া তাগিদ না থাকার ফলে অধিকাংশ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীই সাধারণত সোজা পথটা ধরেন। আগে যে ছবিগুলি অর্থকরী হয়েছে, লোকে যা দেখতে ভিড় করেছে, সেই ধরনের ছবিকে দৃষ্টান্ত ধরেই তাঁরা নতুন ছবি তোলেন। কাঠামোটি মোটামুটি একই থাকে, গল্পের

বিস্তারে একটু অদল-বদল, একটু রঙের ফেরফার। পুরানোর এই পুনরাবৃত্তি অনেক সমালোচকের মতে হলিউডের ছবির একটা বড় সমস্যা। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা খাঁতিয়ে ছবি দেখেন ভারতীয় ছবি সম্বন্ধেও ঐ একই অভিযোগ আনেন। কথাটা সত্যি। তাই ১৯৪৯ সালের বহু ছবি দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে এ যেন আগে দেখেছি এবং ভয় হয় পরেও দেখব। বাঙলার চেয়ে বোম্বাইয়ের ছবিগুলি সম্বন্ধে এই কথাটা হয়তো আরো বেশি খাটে ।

অন্যান্য মামুলী ছবির কথা ছেড়ে গত বছরের একটি সেরা হিন্দী ছবি 'আন্দাজ'-এর কথাই ধরা যাক। গত কয়েক বছরের আরো অনেক ছবির মতো দর্শকরা এই ছবিটিতে পর্দার উপর যে ধরনের কাহিনী দেখেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। গল্পের মূল ভিত্তি হল প্রেম। নায়কের জীবিকা রোজগারের তাগিদ নেই। তবে যে অফিসে তাকে দু'একবার বসে থাকতে দেখা গেছে সে অফিসের প্রতিরূপ পাবেন আপনি মার্কিনী কাগজের পাতায়। নায়িকার একমাত্র কাজ থেকে থেকে সাজ-বদলানো, প্রেম আর গান। প্রাসাদোপম সাত-মহলা বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের চকচকে গাড়ি, ল্যাপেল-হীন কোট আর সিফনের শাড়ি, মামুলী সবই আছে।

'আন্দাজ'-এ কাহিনীর এই ছক বহুদিনের পুরনো। যুবক-যুবতীর প্রেম, কতকগুলি গান, প্রেমে বিপত্তি, অবশেষে হাজার হাজার ফুট বাদে সেই পরম মুহূর্ত—প্রেমের জয়। এই নিয়ে বোম্বাইয়ের সামাজিক ছবি। এ ছাড়াও আর এক জাতের ছবি সব স্টুডিওতেই প্রতি বছরে অনেকগুলি করে তৈরি হয়। আর সেগুলিকে খবরের কাগজের পাতায় পাতায়, শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচার করা হয় নৃত্য-গীতমুখর বাণীচিত্র বলে। খৃষ্টান পাদরী না হয়েও এগুলিকে 'পবিত্র আমোদ' বলা শোভন হবে না, কারণ অর্ধ-নগ্ন যুবতীর ভিড়ই হচ্ছে এগুলির প্রধান আকর্ষণ।

যেসব সমালোচক ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোরতর নিরাশা পোষণ করেন তাঁদের দৃষ্টি হয়তো এই জাতীয় ছবিগুলিতেই নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু এসব ছবি ছাড়াও গত বছর এমন আরো কতকগুলি ছবি তৈরি হয়েছে যা দেখে মনে আনন্দ হয়, আশা হয়। এই ছবিগুলির অধিকাংশই বাঙলা দেশে তৈরি। এর কারণ কি?

বেশ কিছুদিন আগে 'লাইফ অ্যান্ড লেটার্স অভ টুডে' পত্রিকায় কোনো সমালোচক ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে একটা দামী কথা বলেছিলেন। মার্জিত রুচিবোধই, তাঁর মতে, ভারতীয় অন্যান্য ছবির থেকে বাংলা ছবিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়, সেইটাই তার বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'দেবদাস'-এর উল্লেখ করেছিলেন। বয়স্ক যুবক-যুবতীর বিবাহ-ব্যাপারে পিতামাতার অযথা হস্তক্ষেপে অনেকসময় কি ভয়ানক পরিণতি হতে পারে তা দেখানো হল দুটো জীবনের ট্র্যাজেডি দিয়ে। এই ট্র্যাজেডি দর্শকমনকে আলোড়িত করে, ভাবায়, কাঁদায়। সেই বছরই বোম্বাইয়ের একটি হিন্দী ছবিতেও এই সমস্যার অবতারণা করা হয়েছিল এবং চিত্র পরিচালক

তাঁর সমাধান দিয়েছিলেন বিবাহ বাসর থেকে কন্যাকে পালিয়ে যেতে দিয়ে। এত স্থূল, সোজা স্পষ্ট সমাধান কিন্তু দর্শকমনে 'দেবদাস'-এর অনতিব্যক্ত বেদনার মতো রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি। আর্ট-এর দিক থেকে এই দুই ছবিতে তো কোনো তুলনাই চলে না।

আমাদেরও মনে হয় বাংলা ছবির আনুপাতিক উৎকর্ষতার মূলে রয়েছে বাঙালী মন। শিল্প-সাহিত্যে, কাব্যে, গানে, দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে যে বাঙালী মনের পরিচয় মেলে তা হচ্ছে একাধারে গম্ভীর অথচ সরস, অনুসন্ধিৎসু, ভাবপ্রবণ, আর সূক্ষ্মরুচিজ্ঞানসম্পন্ন। বাংলা চলচ্চিত্রেও তা অন্তত কিছু কিছু ফুটে উঠেছে। ভালো বাংলা ছবিগুলিতে তাই শুধু নিছক গল্প নেই, আছে প্রশ্ন, সমস্যা, আছে তার বিশ্লেষণের প্রয়াস, সমাধানের চেষ্টা। ছবিগুলিতে হয়তো চমকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, যেমন নেই অহেতুক বাহাদুরির প্রচেষ্টা, রুচির অশোভন বিকার। বাংলা ভালো ছবিতে এই সহজ, সুন্দর, সরল ভাবই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

১৯৪৯ সালের ভালো বাংলা ছবির মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'পরিবর্তন'। ছেলে-মেয়েদের গড়েপিটে মানুষ করে তুলতে হলে মলটেড্ দুধ আর বেতই যে সব নয় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে এই ছবিতে। প্রত্যেক সভ্য দেশেরই জ্ঞানী-গুণী, লেখক-শিল্পী, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র-নির্মাতারা তাঁদের দৃষ্টি দিয়েছেন দেশের ছেলেমেয়েদের দিকে, বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাদের সমস্যা, তাদের মন, যাতে তাদের সুস্থ সবল মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। চলচ্চিত্রে আমাদের দেশে এই সমস্যাটাকে তুলে ধরবার প্রথম চেষ্টা হল 'পরিবর্তন'এ। এদিক থেকে ছবিটির গুরুত্ব কম নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল ছবিটি উপভোগ্য হয়েছে। গল্পের পরিণতিতে একটা বড় দোষ চোখে পড়ে। দুষ্টু ছেলে অজয়ের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে মাস্টারমশাই শিশিরবাবুর স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের চেয়ে তার বন্ধু শক্তির অপমৃত্যুকে দায়ী করা হয়েছে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হওয়াই উচিত ছিল, শক্তির মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল না। 'পরিবর্তন'এ সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস হল ছোট ছোট ছেলের দলের অপূর্ব অভিনয়। এমন সুন্দর, সাবলীল, অকৃত্রিম অভিনয় বিদেশী ভালো ছবিতেও কদাচিৎ দেখা যায়। পরিচালক নবাগত। তবুও তাঁর প্রথম ছবিতে যে সংযম, সুরুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারা যায় না।

'পরিবর্তন'-এর পরই যে ছবিটির নাম করতে হয়, তা হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের 'ছোটা ভাই'। 'ছোটা ভাই' শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র হিন্দী রূপ। একদা নিউ থিয়েটার্স এদেশে চলচ্চিত্র জগতের অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে সর্বত্র সুনাম অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতেই দর্শকেরা উদগ্রীব হয়ে বসে থাকত নিউ থিয়েটার্সের ছবির প্রতীক্ষায়। মাঝে নিউ থিয়েটার্স এ সুনাম প্রায় হারাতে বসেছিল। 'ছোটা ভাই' নিউ থিয়েটার্সের সেই মর্যাদা আবার ফিরিয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য

করেছে। যেখানেই 'ছোটা ভাই' দেখানো হয়েছে দর্শকেরা দিয়েছে সাদর অভ্যর্থনা, সমালোচকেরা দিয়েছে বরমাল্য।

'ছোটা ভাই'-এর সাফল্যের প্রধান কারণ এর কাহিনী। শরৎচন্দ্র 'রামের সুমতি'তে যে অন্তর্দৃষ্টি ও যাদুকরী ক্ষমতা দিয়ে দুরন্ত রামের চরিত্র ও স্নেহময়ী বৌদির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ছবিতে এই দুটি প্রধান চরিত্র ও রামের পরিবর্তন এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে দর্শকের মন গভীর-ভাবে অভিভূত না হয়ে পারে না। এই সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেত্রীর। পরিচালক কার্তিকচন্দ্র দাসের এই প্রথম ছবি। তাঁর সুবুদ্ধির সবচেয়ে বড় পরিচয় হল যে তিনি চিত্রনাট্যে মূল গল্প থেকে নিজেকে বিচ্যুত হতে দেননি—এ গল্পে ঠিক এই জিনিসটিরই দরকার ছিল। ফলে ছবিতে কাহিনী সহজ ও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গেছে। অভিনয়ে প্রথমেই নবাগত বালক শকুর আর বৌদির ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনার নাম মনে আসে। রামের দুরন্তপনা আর বৌদির প্রতি স্নেহ শকুরের অভিনয়ে এমন অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে যে বিস্ময়াপ্লুত নয়নে তাকিয়ে দেখতে হয়। ভারতীয় ছবির ইতিহাসে এমন অভিনয় বিরল।

'ছোটা ভাই'-এর মতো আর একটি বাঙলাদেশের ছবি যা গত বছর সারা ভারত-ব্যাপী সমাদর পেয়েছে তা হল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট পিকচার্সের হিন্দী 'স্বয়ংসিদ্ধা'। সাহিত্যিক মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনীটি ভিত্তি করে তিন বছর আগে এর যে বাংলা সংস্করণ তৈরি হয়েছিল তা সব দিক দিয়েই হতাশজনক। উন্নত পরিচালনা, সুষ্ঠু অভিনয় আর চিত্তাকর্ষক কাহিনী সমন্বয়ে হিন্দী 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকৃতই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অভিনয়ে শান্তা আপ্তে আর বিপিন গুপ্ত যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, দর্শক তা সহজে ভুলতে পারবে না। 'ছোটা ভাই' ও হিন্দী 'স্বয়ংসিদ্ধা'র সাফল্য দেখে সেই সময়ের কথাই মনে পড়ে যখন বাঙলায় তৈরি হিন্দী ছবি ভারতের সমস্ত জায়গাতেই লক্ষ লক্ষ দর্শককে আকর্ষণ করেছে। বাংলা ছবির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির হিন্দী সংস্করণ এখন আর তৈরি হয় না কেন—ভেবে অবাক লাগে। ছবি তোলার খরচ এতে অর্ধেক কমে যায় এবং সে ছবি সব জায়গাতেই দেখানো চলে। আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দুদিক থেকেই বাঙলার চিত্র ব্যবসায়ীদের এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

শরৎচন্দ্রের গল্পের উপর ভিত্তি করে গত বছর আর একটি ভালো ছবি হয়েছিল 'অনুরাধা'। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল টকিজের তরফ থেকে প্রণব রায় এই ছবি পরিচালনা করেছেন। পরিচালনায় প্রণব রায়ের মৌলিকত্ব প্রকাশ না পেলেও মোটামুটি ভালোই হয়েছে এবং এর জন্যও দায়ী প্রধানত শরৎচন্দ্রের কাহিনী। 'অনুরাধা'র আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে এই প্রথম অভিনয় করলেন।

গত বছরই শ্রীমতী কানন দেবীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি 'অনন্যা' মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি সমস্যামূলক। অপাত্রে অর্পিত হলে নারীর জীবন যে কি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় পর্দায় তার প্রতিফলনের চেষ্টা আগেও হয়েছে। 'অনন্যা'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এতেই প্রথম দেখানো হল কেমন করে একটি মেয়ে শ্বশুরবাড়ির অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করল।

এ ছবিতে 'সব্যসাচী'র পরিচালনা চলনসই। ছবিটির প্রধান আকর্ষণ এর অভিনয় কুশলতা। বিদ্রোহী বধূ ও মায়ের ভূমিকায় কানন দেবীর অভিনয় চিত্তাকর্ষক। সবচেয়ে অনবদ্য অভিনয় করেছেন পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জড়বুদ্ধি স্বামীর চরিত্রে। এই নবাগত অভিনেতার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ভাশুরের ভূমিকায় কমল মিত্রও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনুভা গুপ্তা বা বিকাশ রায় যে দুটি চরিত্র অভিনয় করেছেন তাতে তেমন সুযোগ না থাকায় অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

একদিক দিয়ে গত বছরের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে অন্যতম প্রধান চিত্র-পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসুর 'কবি'। তারাশঙ্করের 'কবি' আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'কবি' নিছক প্রেম কাহিনী নয়, লেখকের প্রচেষ্টা ছিল বাঙলার এক লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটানো। বাঙলার হাটে, মাঠে, ঘাটে, গ্রামে গ্রামে আজও যে বাউল, বৈরাগী ও কবিয়ালদের দেখতে পাওয়া যায় বাঙলার নরনারীর মনে এদের স্থান ছিল প্রেমের সিংহাসনে। 'কবি' এই কবিয়াল জীবনের আলেখ্য। একটু এদিক ওদিক হলেই এটা একটা স্থূল প্রেম কাহিনীতে পরিণত হতে পারত কিন্তু লিপিকৌশল ও সূক্ষ্ম মননশীলতায় সেই বিপদ ঘটতে পারেনি এটাই উপন্যাসলেখকের কৃতিত্ব।

দুঃখের বিষয় উপন্যাসের চিত্ররূপে এই বিপদটিই ঘটেছে। তাই এতে আমরা পাইনি বাঙলার গৌরবময় কবিসংস্কৃতির বিচিত্র কবিয়াল জীবনের পরিচয়। গল্পের মূল সুরটি হারিয়ে গেছে, দাঁড়িয়েছে নিছক প্রেম কাহিনীতে। 'কবি' চিত্রটিতে অনুভা গুপ্তার অভিনয়ই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এর আগেও তিনি দু'একটি ছবিতে নেবেছিলেন কিন্তু এই ছবিতেই তাঁর প্রথম অভিনয় প্রতিভার প্রকাশ হল। ঠাকুরঝির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্মরণীয় কীর্তি।

এগুলি ছাড়াও গত বছর যে ছবিগুলি উতরে গেছে তার মধ্যে তারাশঙ্করের 'সন্দীপন পাঠশালা', তা ছাড়া 'সঙ্কল্প' ও 'অভিমান' উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত এই ছবিগুলির টেকনিক বা আঙ্গিকের দিক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলিনি। বলা প্রয়োজন এই ছবিগুলিতে চিত্রগ্রহণ সময় সময় অত্যন্ত খারাপ, মোটামুটি চলনসই বলা যেতে পারে। রেকর্ডিং ও সম্পাদনাও তাই। পরিচালনার খুঁটিনাটিতে অজস্র গলদ আছে; বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে, দৃশ্য পরিবেশে নানা রকমের বৈষম্য চোখে পড়ে। এ সব সত্ত্বেও ছবিগুলি যে চিত্তাকর্ষক হয়েছে তার কারণ পরিচালক একটা নিম্নতম মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

অপটু পরিচালনা, অক্ষম চিত্রগ্রহণ ও অভিনয়ের দোষে গত বছর যে ছবিগুলি একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। এমন শক্তিশালী প্রতিভাদীপ্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। ছবিটির দুর্ভাগ্য আশা করি বাংলা লেখক ও বাংলা চিত্র-জগতে সকলেই স্মরণ রাখবেন। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' ও 'স্বামী', বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' কাহিনী, আর 'স্বামীজী'—এ ছবি কয়টি অত্যন্ত হতাশজনক হয়েছে। হাসির ছবি 'উল্টো রথে'র ব্যর্থতাও উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের গোড়ার কথা হচ্ছে কাহিনীকে এমনভাবে ফলানো যাতে লোকের মনে তা সত্যিকারের বলে ভ্রম হয়। এজন্য এমন কতকগুলি জিনিসের দরকার যা না হলে ভালো ছবি তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিল্পেরই একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তা সত্য। পরিচালকের পক্ষে সেই ভাষা আয়ত্তে থাকা দরকার, তার ওপর পুরো দখল থাকা চাই, তবে তিনি ছবি তৈরির নিজস্ব বাধা-বিপত্তিগুলো কাটিয়ে ঝরঝরে ভাবে গল্প বলতে পারবেন। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় জীবনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলিকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে হলে ছবি তৈরির একটা দিশি ঢঙ বা স্টাইলের প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এমন বহু পরিচালক রয়েছেন চলচ্চিত্র বিষয়ে যাঁদের অক্ষর-জ্ঞান নেই। আমাদের দেশের বেশির ভাগ ছবিতে ব্যর্থতার সেটাই সব চেয়ে বড় কারণ। এদিকে দেশের যাঁরা ভালো পরিচালক বলে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গল্পবিন্যাসের দিক থেকে বড্ড বেশি বিদেশী ঢঙের পক্ষপাতী। এদিক থেকে বাঙলার চেয়ে অধিকতর দোষী বোম্বাই।

দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র হচ্ছে চোখে দেখার জিনিস—সুতরাং চিত্রনির্মাতার কর্তব্য ছবিকে দর্শনযোগ্য করা। আমাদের দেশের, বিশেষত বাংলা ছবিগুলির অধিকাংশেরই চিত্রগ্রহণ এত খারাপ যে তাতে পরিচালনার কৃতিত্ব ও শিল্পীদের অভিনয় কুশলতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ছবি তোলার যান্ত্রিক দিকটা আমাদের দেশে আজও কি করে এত কাঁচা রয়ে গেছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ভালো ক্যামেরা আর আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব—এই অজুহাত দিয়ে অনেকে এই দোষ ঢাকার চেষ্টা করেন। ভালো ছবি তুলতে ভালো যন্ত্রপাতির যে বিশেষ প্রয়োজন তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-পরিচালক নিজে চোখে দেখে সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সবই আমাদের দেশের স্টুডিওগুলিতে রয়েছে। আসল কথা হচ্ছে যন্ত্রপাতিই সব নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল ক্যামেরার পিছনে মানুষটির চোখ আর মন। যন্ত্রটাকে তিনিই ব্যবহার করবেন, যেমন করে চিত্রী তাঁর তুলি বুরুশ রঙ ব্যবহার করেন। সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়েও যে কত উৎকৃষ্ট ছবি তোলা

যায় তার প্রমাণ দিয়েছেন যুদ্ধোত্তর ইতালীয় ও ইউরোপীয় চলচ্চিত্রশিল্পীরা। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের প্রথম প্রয়োজন আরো অনুশীলন, তার পর চাই সৃজনী দৃষ্টি, সৃজনী মন।

চিত্রগ্রহণ সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই আজ দেখা যাচ্ছে চিত্র-নির্মাতারা তাঁদের ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য স্টুডিওর বাইরে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। হলিউড কিংবা ইংলণ্ডে স্টুডিওর মধ্যেই সাধারণত ছবি তোলার রেওয়াজ সত্ত্বেও ক্যামেরা আজ বহির্মুখী। ইতালির বরেণ্য পরিচালকেরা তাঁদের জগদ্বিখ্যাত ছবিগুলি তুলেছেন রোম আর ইতালির এখানে সেখানে পথে ঘাটে। আমাদের দেশে কিন্তু এ পরিবর্তনের কোনো চিহ্ন নেই। ক্যামেরাকে এদেশে এখনো বেনেবাড়ির কনে বৌয়ের মত অসূর্যম্পশ্যা করে রাখা হয়েছে।

গত বছরের কত ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে কি নিষ্প্রাণ, কি অবাস্তব। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারের দৃশ্য সমস্ত কিছুই তোলা হয় স্টুডিওর মধ্যে। অতি কুশলী চলচ্চিত্রশিল্পীর পক্ষেও এগুলিকে জীবন্ত করে তোলা সহজে সম্ভব নয়। তাই আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের কর্তব্য যেখানে দরকার সেখানে স্টুডিওর বাইরে বাস্তব পরিবেশের মধ্যে ছবি তোলা। এর ফলে ছবিতে আজ যা বিবর্ণ, মেকী বলে মনে হয়, তা সুন্দর হয়ে, জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সবশেষে বলা দরকার যে আমাদের দেশী ছবির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার। গত বছরের ছবিগুলি গড়ে দশ থেকে বারো হাজার ফুট দীর্ঘ হয়েছিল। পৃথিবীর সব দেশেই দু'একটা বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত ছবির দৈর্ঘ্য আট হাজার ফুটের সীমায় থাকে। এই প্রসঙ্গে গত বছরে 'দি পার্ল্' এবং 'দি পোর্ট্রেট অব মরিয়া' নামে যে দুটি মেক্সিকান ছবি কলকাতায় দেখানো হয়েছিল তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুই ছবির কাহিনীতে বর্ণিত জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের অনেক মিল আছে। অথচ এদের দৈর্ঘ্য ছিল সাত হাজার ফিটের নিচে। পরিচালনা ও সম্পাদনার কৃতিত্বেই এটা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের এই ছবির দীর্ঘতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক। আর একটু গুছিয়ে বলতে পারলেই এই দীর্ঘতা কমিয়ে আনা যায়। এ কথাটা বোঝা দরকার যে একটা জিনিস দেখাতে হলে হিজিবিজি না কেটে একটি সুনিপুণ তুলির টানেও দেখানো যেতে পারে, বোঝানো যেতে পারে ধীরে সুস্থে, না চেঁচিয়ে, হাত-পা না ছুঁড়ে ইশারায়, ঠাট্টায়। শিল্প হতে হলে এই সংযম চাই। আমাদের ছবির দৈর্ঘ্যের আর একটা কারণ বোধ হয় প্রত্যেক ছবিতেই অতিরিক্ত গান-সংযোজনা। পরিচালকেরা বলেন গান না থাকলে ছবি চলবে না। নজির হিসেবে 'দেবদাস' 'ভাগ্যচক্র' 'অচ্ছুত কন্যা' 'বন্ধন' 'প্রেসিডেণ্ট' 'কিসমত' ইত্যাদি ছবির উল্লেখ করেন। গত বছরের 'ছোটা ভাই', 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'পরিবর্তন' ইত্যাদি ছবি প্রমাণ করেছে যে গান না থাকলেও ছবি

জনপ্রিয় হতে পারে। এই দৃষ্টান্ত থেকে দেশী ফিল্মে একটা বড় পরিবর্তন আসা উচিত।

যন্ত্রপাতি যা আছে তাই নিয়েই ছবি তোলার টেকনিকের দিকে মনোনিবেশ করলে বাংলা ছবিগুলি অন্তত বোম্বাইয়ের 'আন্দাজ'-এর মতো নয়ন-মনোরম হতে পারে। অন্যপক্ষে বোম্বাই ও অন্যান্য হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের উচিত বাংলা ছবির মতো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আর একটু যত্নবান হওয়া। বিদেশী ছবির থেকে অন্তত এটুকু আমরা শিখতে পারি যে আরো অনেক কম কথা বলে কি করে পর্দায় সরস গল্প বলা যায়। তার উপরেই নির্ভর করছে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ।

আধুনিক-শ্রীরাম ভক্তি

বোম্বাই প্রকাশ পিকচার্স-এর প্রযোজনায় প্রায় প্রতি বছর পরিচালক বিজয় ভাট শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে একটি করে ছবি তৈরি করেন। তাঁর পরিচালনায় তোলা 'ভারত মিলাপ', 'রামরাজ্য', 'রামবাণ' প্রভৃতি ছবি ভারতীয় দর্শকের কাছে আশ্চর্য সমাদর পেয়েছে। প্রত্যেকটি ছবিতেই প্রেম আদিব সাজেন শ্রীরামচন্দ্র, আর শোভনা সমর্থ—সীতা। আধুনিক ভাষায় এ'রা দুজন হচ্ছেন রামসীতায় 'স্পেশালিস্ট'।

রামায়ণের, তথা সীতারাম ভক্তের দেশ ভারতবর্ষ। কাজেই চলচ্চিত্রের আধুনিক সীতারামকে ধড়াচূড়া পরে শুধু অভিনয় করলেই চলে না, পুণ্য-লোভাতুর ভক্তবৃন্দকে সামাজিকভাবে দর্শন দিতে হয়। একবার দক্ষিণ ভারতের এক ভদ্রলোক রীতিমতো সেট্-এর মধ্যে ঢুকে শ্রীরামচন্দ্র ওরফে প্রেম আদিবকে দন্ডবৎ করে ভক্তি নিবেদন করে গিয়েছিলেন। আর একবার একটি ছবি শেষ করে প্রেম আদিব ছুটিতে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় কাকুতি মিনতি করে এক মারাঠী ভদ্রলোক এসে ধরে বসলেন—শ্রীরামচন্দ্রকে একটি-বার তাঁর গৃহে গমন করতেই হবে। কিছুতেই এড়াতে না পেরে শ্রীরামচন্দ্র আবার স্টুডিওর সাজঘরে ঢুকলেন। পরিপাটি রামচন্দ্র সেজে গেলেন সেই ভদ্রলোকের বাড়ি। সেখানে গৃহকর্ত্রী ধূপদীপ জেবলে তাঁর আরতি সমাপন করে পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হওয়ার পর প্রেম আদিব ছাড়া পেলেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে হলিউড প্রীতি

সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত

সিনেমা যন্ত্রযুগের শিল্প। তার জন্ম স্বভাবতই পশ্চিমের ঘরে। যন্ত্রের মধ্য দিয়েই আধুনিক সভ্যতার বিকাশ, আর সেই যন্ত্র হচ্ছে পশ্চিমের সৃষ্টি। আবার পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে আমাদের দেশে আধুনিক মানসের উদ্ভব। কাজেই আমাদের ঔপনিবেশিক, কৃষিপ্রধান দেশে সিনেমার আমদানিও হয়েছে আধুনিকতার অন্য নানা সরঞ্জামের সঙ্গে, রেলগাড়ি বা রেডিও ও টেলিফোনের মতো পশ্চিম থেকে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রকলায় আমাদের একটা বিরাট দেশীয় ঐতিহ্য আছে, কম বেশি তার জের টেনেই আমাদের আজকের শিল্পকলা। কিন্তু আমাদের সিনেমার মধ্যে সে ঐতিহ্য নেই। নির্ভরের অভাবে তার অস্তিত্ব কেবলই টল-টলায়মান। সমাজ ও শিল্পকলার সঙ্গে যে সংযোগের মধ্য দিয়ে শিল্পে ক্রমে ক্রমে ঐতিহ্যের বনিয়াদ গড়ে ওঠে তার পরিচয় আমাদের সিনেমায় এখনো মেলেনি।

সময়ের মাপকাঠিতে ভারতীয় সিনেমা ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে তেমন কিছু খাটো নয়। ১৯৫০ সালে এদেশী সিনেমার ছত্রিশ বছর পূর্ণ হল, আমেরিকায় তার ইতিহাস মোটামুটি পঞ্চাশের বেশি নয়।

তবু পশ্চিমের চলচ্চিত্র-শিল্পে ইতিমধ্যেই একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আমাদের চলচ্চিত্রে যার একান্ত অভাব। কারণ খুঁজতে গেলে বলতে হয় যে যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে সিনেমার যোগ গভীর হওয়ায় যেদেশে এই যন্ত্রসভ্যতা এখনো প্রসারিত হয়নি সেদেশে সিনেমার বিকাশও অপরিণত। মাত্র অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস সত্ত্বেও পশ্চিমী সিনেমার ঐতিহ্য পশ্চিমী শিল্পকলা ও জীবনের মধ্য থেকে উৎপত্তি লাভ করে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। পশ্চিমী চিত্রকলার রচনা, টোন; সঙ্গীতের গতি, হার্মনির নাটকীয়তা; স্থাপত্যের গড়ন; নৃত্যের তাল; কাব্যের ছন্দ ও প্রবাহ; উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গী; ইউরোপীয় শিল্পদৃষ্টির থ্রি-ডাইমেন-শানাল চরিত্র—এ সকলের রসায়নেই আধুনিক যুগের নতুন আর্টের সৃষ্টি।

কিন্তু ভারতীয় সিনেমার সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার কোনো যোগ নেই। সঙ্গীত ও নৃত্যের যেটুকু সম্পর্ক সেটুকু অকারণ অপপ্রয়োগের। আর সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে গেলে বলতে হয় যে বহু শক্তিমান সাহিত্যিক সিনেমায় বাজীমাৎ করতে গিয়ে সাহিত্য আর সিনেমা দুইয়েরই সমূহ সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। রূপ ও রীতির দিক থেকে অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে এদেশীয় সিনেমার কোনো যোগ দেখি না। এখানে সেখানে দু'চারটি গান বা ছবিতে আবহঝঙ্কারের প্রয়োগের মধ্যেই সিনেমা ও সঙ্গীতের সম্পর্ক শেষ হয় না, সিনেমা হচ্ছে সঙ্গীতের মতো তালবন্ধ গতি। ক্যামেরার প্রয়োগের মধ্যেই কাব্যধর্মী সৃষ্টির অবকাশ আছে। বিখ্যাত 'রোড টু লাইফ' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন শীতের শেষে বরফ গলে ভেসে আসার অপূর্ব পরিচ্ছেদটি তাঁদের মনে পড়বে। চিত্রধর্মী সৃষ্টি তো আছেই, মেক্সিকান ছবি 'মারিয়া কান্ডেলারিয়া'-তে বৃষ্টির মধ্যে টোকা মাথায় দেওয়া লোরেন্‌সো রাফায়াল-এর অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যাওয়া মূর্তি শ্রেষ্ঠ চীনে ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আইসেন্‌স্টাইন-এর 'ব্যাটল্‌শিপ পোটেমকিন'-এ সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য — তিনেরই যোগ অতি প্রকট হয়েছে। বিরাট সেতুর ওপর, নিচ আর সামনে দিয়ে যেখানে অগণিত লোক সমুদ্রতীরের দিকে চলেছে সেখানে তিন বিভিন্ন গতির রচনা-নৈপুণ্যে মহৎ চিত্রকলার ব্যাপ্তি, বিশাল সিম্‌ফনির মতো গম্ভীর, সম্পূর্ণ। ইউরোপীয় সিম্‌ফনি-সঙ্গীতের আদর্শে এই ছবির তাল ও লয় নির্ধারিত বলে মনে হয়। আলেগ্রো অর্থাৎ দ্রুততালে আরম্ভ : আন্দান্তে বা মন্থর মধ্যভাগ : ঈষৎ ঢিমে আলেগ্রোয় শেষ। শোনা যায় এই ছবির নানা পরিচ্ছেদের উপযোগী সঙ্গীত রচিত হবার পর, সেই সঙ্গীতের ভিত্তিতে দৃশ্যবিভাগ করা হয়েছিল। অথচ এ ছবি নির্বাক, সে যুগে সঙ্গীত বাজানো হত প্রেক্ষাগৃহের আলাদা অর্কেস্ট্রায়। সম্পাদনার কাজকে এখানে আইসেন্‌স্টাইন তাল ও লয়ের দিক থেকে দেখেছেন ও প্রয়োগ করেছেন।

চ্যাপলিনের সৃষ্টি আইসেন্‌স্টাইন-এর চেয়েও মহৎ; তাতে অন্যান্য সমস্ত আর্ট আরো সরলীকৃত হয়ে সিনেমার জমিকে তৈরি করেছে। ফরাসী ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি দেখিনি, তবু ককতো-র 'লা বেল্‌ এ লা বেইত্‌' দেখে বোঝা যায় কতদূর গীতিধর্মী, চিত্রধর্মী, এমন কি নৃত্যধর্মী হতে পারে সিনেমা। 'মঁসিয়ে ভ্যাঁস'-তে ক্লদ রেনোয়া-র ক্যামেরার কাজে (ইনিই বাঙলাদেশে এসে পিতৃব্য জাঁ রেনোয়া-র সঙ্গে এবার 'দি রিভার' ছবি তুলেছেন) দেখা যায় যে ক্যামেরা শুধু যন্ত্রদৃষ্টি নয়, ক্যামেরার পশ্চাতে যদি শিল্পীর মন থাকে তবে ক্যামেরা হয়ে উঠতে পারে দিব্যদৃষ্টি। আধুনিক ইতালীয় সিনেমার যেসব বিক্ষিপ্ত 'স্থির-চিত্র' দেখতে পাই তার মধ্যেও এক কাব্যময় বাস্তববোধের আশ্চর্য পরিচয় মেলে।

সমাজের সঙ্গে দেশীয় সিনেমার যোগ যথেষ্ট নিবিড় না হওয়ার জন্য অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে সম্পর্কও ভারতীয় সিনেমায় অনুপস্থিত। সিনেমা যেন

স্বাভাবিক সর্ব-সংযুক্ত শিল্পবিকাশের অঙ্গ নয়, যেন কাঁচি দিয়ে কেটে এনে জুড়ে দেওয়া। দেশের আর্টের খাপি জমিতে একটা অকারণ তালির মতো।

কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা এইখানেই শেষ হবার নয়। যেহেতু যন্ত্রসভ্যতা এদেশে যথেষ্ট ব্যাপ্ত হয়নি, সেহেতু সিনেমা এদেশে অপরিণত থাকতে বাধ্য এমন সরল ব্যাখ্যায় পূর্ণচ্ছেদ টানা চলে না। না হলে মেক্সিকো-দেশে 'মারিয়া কাণ্ডেলারিয়া'-র মতো ছবির ব্যাখ্যা কোথায়? সিনেমায় দেশের সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রয়াস নেই, অন্ধভাবে বিদেশের অনুকরণের মধ্যেই তার অস্তিত্ব, এই হল সব চেয়ে জরুরী ও সব চেয়ে মারাত্মক কথা। কেবল হালের বোম্বাই-মার্কা কমেডি নয়, গোটা ভারতীয় সিনেমাটাই অনেকখানি অভারতীয়।

যেহেতু চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকে এদেশে মার্কিন ছবিই বিশেষভাবে প্রচলিত তাই আমাদের সিনেমাকারদের ধ্যান-ধারণায় ফিল্ম বলতেই বোঝায় হলিউড। ইংলণ্ডে তোলা মুষ্টিমেয় আধুনিক ছবি এই অন্ধবিশ্বাসকে মোটেই ঘোচায়নি। ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, রুশ ইত্যাদি নানা সিনেমাশিল্পের পরিচয় তো প্রায় অজ্ঞাত বললেই হয় এদেশে। এর ফলে সিনেমায় বিভিন্ন দেশের নিজস্ব যে একটি রূপ ও রীতি অভিব্যক্ত হয়েছে তার সম্বন্ধেও কোনো ধারণা এদেশে জন্মায়নি। শ্রেষ্ঠ ফরাসী ছবি যে একান্তভাবে ফরাসী, কিছুতেই তাকে মার্কিন বলে ভুল করা সম্ভব নয়; আবার প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মান সিনেমার যে একটি অদ্বিতীয় রূপ আছে যা কেবলই জার্মান, আর কিছু নয়— এই জ্ঞান আমাদের সিনেমা মহলে এখনো পৌঁছায়নি। তাই ভারতীয় সিনেমায় ভারতীয়তা নেই, বাংলা সিনেমায় বাঙালীয়ানা নেই। অথচ মেক্সিকো ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার মতো ক্ষুদ্র দেশেও চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব দেশীয় চেহারা আছে। শুধু আচারে-বিচারে নয়, স্টাইলে, রীতিতে; বলা যেতে পারে মনের ভঙ্গীতে।

বিভিন্ন দেশের মন আলাদা, মানুষ আলাদা, জীবন আলাদা; সিনেমায় যদি সেই জীবনের সুষ্ঠু প্রকাশ হয় তবেই তার আলাদা চেহারাটি ফুটে ওঠে। আমাদের সিনেমায় আমাদের দেশীয় জীবনের প্রকাশ নেই, তাই হলিউডের ছাঁচে আমাদের সিনেমার ছবি সরাসরি ঢালাই। আমাদের ছবির বর্ণনাভঙ্গী হলিউডের, কথার, সঙ্গীতের প্রয়োগ হলিউডী, হাস্যরস হলিউডের গ্যাগ-এর ধাঁচে বাঁধা। দর্শকের প্রতি আবেদনের ঢঙ পর্যন্ত অনেকখানি মার্কিনী। মনে রাখতে হবে যে শ্রেষ্ঠ মার্কিন ছবি বলতে বোঝায় গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালক, ও ওয়েস্টার্ন-এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। কিন্তু এর বাইরে যে হলিউড সেটাই আজকাল বাজার চলতি এবং তারই গৎ-এ আমাদের সিনেমাকারদের চিন্তা বাঁধা। মার্কিন মুলুক হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম সিনেমাকেন্দ্র, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম নয়। বৃহত্তম বলেই সেখানে ফ্যাক্টরীর বাঁধা নিয়মে ছকে-ফেলা, ছাঁচে-ঢালা অসংখ্য ছবি প্রতি বৎসর উদ্গীরণ

করতে হয়। আনন্দ পরিবেশনের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধতে গিয়ে সেখানে আনন্দই বাঁধা পড়ে গেছে। ফলে হলিউডের শতকরা নিরানব্বইখানি ছবিতে প্রাণের কোনো সাড়া নেই, কেবল আঙ্গিকের নানা মারপ্যাঁচ, সাবজেক্টিভ ক্যামেরা আর ডীপ ফোকাসের কায়দাতেই সিনেমার পরিসমাপ্তি।

তারকা-প্রথার প্রকোপে হলিউডে কোনো চরিত্রের আর কোনো নিজস্বতা নেই, তারকার চরিত্রের ফ্রেমেই গল্পের চরিত্রের মজবুত বাঁধাই। ক্লার্ক গেব্ল্ ছবিতে জেমস বা চার্লস বা জন যাই হবার চেষ্টা করুন, পর্দায় দেখলেই আপনার মনে হবে এই ক্লার্ক গেব্ল্ এল, জেমস বা চার্লস বা জন এল মনে হবে না। তারকার ঠাটঠমকের আড়ালে চাপা পড়েছে সত্যিকার জীবনের শক্তিশালী, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য। বিজ্ঞাপনের মোহে ফেলে তারকার মুদ্রাদোষগুলি পর্যন্ত লোকের কাছে প্রিয় করে তোলার এক বিচিত্র বিদ্যা হলিউড আয়ত্ত করেছে। বাঙলাদেশেও তাই। আজ পর্যন্ত কোন বাংলা ছবিতে জহর গাঙ্গুলীকে অভিনয় করতে দেখিনি মনে করতে পারি না, অথচ তাঁকে নতুন ভূমিকায় দেখলেও মনে হয়—কি ক্লান্তিকর। অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে অভিনয়ের সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে। তারকার জন্য চরিত্র; তারকামণ্ডলীর জন্য গল্প। অর্থাৎ অমুকের এবং অমুকের বিশেষ বিশেষ মুদ্রাদোষ প্রয়োগের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা। অমুক অভিনেতা বড়লোক না হলে তাঁর পাইপ খাবার কায়দাটা মানায় না, কমল মিত্রকে রাগীবাবু, রাধামোহনকে দেশোদ্ধারী এবং জহর গাঙ্গুলীকে ভাঁড় না বানালে বাংলা ছবির রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হয়ে যায়। তার পর গেরস্তের বৌ হলে মলিনা, বদমেজাজী ঝি বা শাশুড়ী হলে প্রভা, মাসি পিসি হলে সুপ্রভা আর বৌ হলে রেবা তো আছেনই। এই তো গেল ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যাপার। সুমিত্রা বা মীরা মিশ্র আর সরকার ইত্যাদিদের বলা যেতে পারে ফেমাস এনিমিটিজ।

এর পরেও আমাদের পরিচালকেরা আত্মপ্রশংসার সুযোগ পেলেই বলেন: 'আমার ঐ সিকোয়েন্সটা কিন্তু হলিউডের ছবির চেয়ে কিছু কম নয়।' বলতে গেলে আজকের মাদ্রাজ-বোম্বাইয়ের ছবি মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ারের নাচগানের চেয়ে কম কিসে? নিখুঁত ফর্মুলায় হলিউডের কার্বন কপি করতে পেরেছে আমাদের দেশ এটা হয়তো অনেকের কাছে গৌরবের বিষয়। কিন্তু শিক্ষিত লোকের মনে হতে পারে যে জেমিনীর 'নিশান' ও আমাদের 'অভিমান'-এ হলিউড অনেকখানি আছে, আমাদের দেশ নেই।

বাঙলাদেশের মাঠঘাট বাংলা ছবি থেকে নির্বাসিত। আমাদের চলচ্চিত্রে স্টুডিওর কাঁচা রঙের গন্ধের গুমোট। দেশজোড়া খোলা হাওয়া আর নীল আকাশ সেখান থেকে অনুপস্থিত। হলিউডের মতোই আমাদের ছবিতে চওড়া সিঁড়ি, মোটা থাম আর ঢালাও সোফাসেটির একটা মায়াজগৎ সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলছে যার মধ্যে লোক সত্যকার জীবন থেকে দু'দণ্ড পালিয়ে বাঁচতে পারে। অবশ্য সব আর্টেই

জীবন থেকে খানিকটা সরে-আসা আছে, কেননা আর্ট জীবন নয়; কিন্তু সেই বাইরের সরে-আসার মধ্য দিয়ে অন্তরে একটা কাছে-আসাই সংঘটিত হয়। জীবনের অবান্তরতা-বহুল বাহ্য চেহারাটা সরে গিয়ে তার একটা মৌলিক, প্রচ্ছন্ন রূপ বেরিয়ে আসে। বাঙলার নদী, খাল-বিল, চর, ক্ষেত, রেললাইন, মানুষ আর মানুষের জীবনযাত্রাকে নিয়ে যদি সিনেমা হয় তবে তাতে কি লোকের মন মুক্তি পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। সিনেমা লোকায়ত শিল্প, লোকের জীবনকে আশ্রয় করলে লোকের মনে সে আরো বেশি আনন্দ সঞ্চার করতে পারবে। প্রাত্যাহিক, সত্যকার জীবনের যে অনুভূতির মধ্য দিয়ে বাংলার কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছে, গুণী সাহিত্যিকের সাহচর্য সত্ত্বেও তার স্পর্শ বাংলা ছবিতে লাগছে না। 'চণ্ডীদাস'-এ বাঙলীয়ানার যে সুরটুকু ছিল তাও আজ চাপা পড়ে গেছে বক্স-অফিসের নকলি-য়ানার তলায়। এখনকার গল্পে চাই শুধু এক দেশোদ্ধারী পুত্র, একটি অকারণ তরুণী, একটি জড়ভরত পিসতুতো ভাই, একটি জমিদার বাবা, একটি বিশাল সিঁড়ি, দু'টি বিলিতি বৈঠকখানা, পর্দায়-আঁকা মেঘের মধ্যে বসানো একটি কুঁড়ে-ঘর, আর খ্যাংরাকাঠিতে বাঁধা কিছু লতাপাতা। হাস্যরসে হলিউডের প্রকোপের একটি বিচিত্র নমুনা দিই। 'চন্দ্রশেখর' ছবিতে প্রতাপের অনুপস্থিতিতে তার চেয়ারে বসে চাকর যখন তার উদ্দেশে গালি পাড়তে শুরু করে তখন দেখা যায় প্রতাপ চুপি চুপি পিছন থেকে এসে উপস্থিত হয়ে তার কথার উত্তর দিচ্ছে। চাকর প্রথমে খেয়াল করে না, উত্তর প্রত্যুত্তর চালাতে থাকে যেন আপন মনেই, তারপর হঠাৎ তার খেয়াল হয়, চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে। এটা হলিউডের একটা আদ্যিকালের পুরোনো কায়দা, যাকে ওরা বলে 'গ্যাগ্'। সমালোচকদের মতে এই গ্যাগ্গুলিতেই হলিউডকে নিতান্ত খেলো করে দিয়েছে, আর আমাদের প্ররিচালকেরা যখন খেয়ালমাফিক বাছাই করে যে কোনো মার্কিন ছবি দেখতে যান তখন মনে হয় অন্ধকারে বসেই তাঁরা যেন খাতা পেনসিলে নোট করে নেন প্রত্যেকটি গ্যাগ্-এর কায়দা। অমুক কায়দাটা কোথায় লাগানো যায়, অমুক শটটা চুরি করে চালানো যায় কিনা, অমুক 'মিউজিক'টা মেরে দিলেই ঝড়ের সিনটা মিটে যায়—এমন সব চিন্তায় তাঁদের মস্তিষ্ক সচল থাকে। হলিউডের বাইরের ছবি দেখতে তাঁদের আগ্রহ নেই কেননা সেখানে এজাতীয় নোটবই প্রায় অচল। হলিউডের যে ছাঁচে-ঢালাই করার দিক, যেটা তার সব চেয়ে নিকৃষ্ট দিক, সেদিকেই আমাদের পরিচালকদের নেকনজর। দেশী ছবিতে আবহ-সঙ্গীতের মধ্যে তার পরিচয় সবচেয়ে স্পষ্ট। চরম অস্বাভাবিকতার মধ্যে আবহ-সঙ্গীতকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখা হয়। আর সে সঙ্গীত বাজানো হয় বিদেশী যন্ত্রে, হার্মনি-র সাহায্যে, দেশী সুরের বিদেশী অর্কেস্ট্রায়। ভারতীয় সঙ্গীতকে হলিউডী ফিল্ম-সঙ্গীতে পরিণত করার এই যে হাস্যকর ও একান্ত করুণ প্রয়াস এর মূলেও ভারতীয়তার অভাব, অনুকরণের প্রবৃত্তি।

অথচ অনুকরণ না হলেও বিদেশীরীতির অনুসরণ, বিশেষত অনেকখানি অনুধাবনের কাজ আমাদের দেশে সিনেমা-সৃষ্টির অঙ্গ হতে বাধ্য। কিন্তু হলিউডের অনুসরণ আমাদের পক্ষে একাধিক কারণে মারাত্মক। প্রথম হচ্ছে এই যে হলিউডের ফিল্ম-শিল্প মার্কিন মোটর-শিল্পের মতোই বৃহৎ ও যন্ত্রগত, নানা আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ। সারা পৃথিবীই তার ক্ষেত্র। আমাদের চলচ্চিত্রের বাজার, যন্ত্রগত সুবিধাদি, ছবি তোলার পুঁজি হলিউডের সিকির সিকিও নয়। বিরাট দশমহলা প্রাসাদে স্থাপত্যের যে ঢঙ গ্রাহ্য, চার কাঠা জমির একতলা বাড়িতে সেই ঢঙ মানায় না। অথচ চার কাঠা জমির উপর একতলা বাড়িও সুন্দর হতে কোনো বাধা নেই। হলিউডের নকল করতে গিয়ে বাংলা ছবি নিজের খেই হারিয়ে ফেলেছে। হলিউডের মতোই এদেশেও 'আউটডোর' বলতে বোঝায় শাদা মেঘ আর যাকে বলে 'সিনারী'। ইতালীয় ছবির মতো জুতো-পালিশওয়ালা ছেলের বা সাধারণ চাষীর দৈনিক ইতিহাস যেন আমাদের জন্য নয়, বিরাট শ্রমশিল্পের দেশ আমেরিকার রীতিনীতিই আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে যথাযথ।

বিদেশের থেকে শিখতে গেলে এদেশের সিনেমাকারদের তাকানো উচিত ফরাসী দেশের দিকে, এমন কি মেক্সিকো বা চেকোস্লোভাকিয়ার দিকে, হলিউডের দিকে নয়। এদেশের বহু পরিচালক টাকা-পয়সার ও যন্ত্রপাতির কমতির নজীর দেখিয়ে নানান সাফাই গান। কিন্তু 'ওপেন সিটি', 'পাইসান' ইত্যাদির স্রষ্টা রসেলিনী অনেক সময় শীতকালে নিজের কোট বাঁধা দিয়ে এক রোল ফিল্ম কিনেছেন (চোরাবাজারে), হোটেলের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন পাওনাদারের তাড়ায়, রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বহুদিনের অকথ্য কষ্ট সহ্য করে তাঁর এক একটি ছবি তুলেছেন। ডি সিকা বা লাতুয়াদা বা লুকিনো ভিস্‌কোন্তি-র ইতিহাসও বোধ করি এই রকমই। অথচ শোনা যায় তাঁদের ছবিতে যুদ্ধোত্তর ইতালীর জীবন মূর্ত হয়ে আমাদের সাধের হলিউডকে স্তম্ভিত করেছে, ডলার অর্জন করেছে প্রচুর পরিমাণে। অর্থাৎ ভালো হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ছবি বক্স-অফিসের অভিনন্দন লাভ করেছে। রাশিয়ার দারুণ দুর্দিনে, যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে সাবেকী সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আইসেন্‌স্টাইন তাঁর প্রথম ছবি তুলেছিলেন। ১৯২৫-এ নির্মিত সেই ছবি 'ব্যাটল্‌শিপ পোটেমকিন' এখনো পৃথিবীর সর্বত্র সিনেমা-শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়। রাশিয়ার জনসাধারণই এই ছবির নায়ক, তাদেরই জীবনের এক বিশাল রূপ এই ছবিতে প্রতিভাত হয়েছে।

ভারতীয় সিনেমাকারেরা যদি হলিউড-এর নকল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টিত না হন তবে বিদেশী বিতাড়ন করে, আইন বানিয়ে, এদেশেই কাঁচা ফিল্ম উৎপাদন করেও তাঁরা ভারতীয় ছবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে পারবেন না। হিন্দীতে অনূদিত বিদেশী ছবির হাত থেকে তাহলে দেশী দর্শককে কিছুতেই ফেরানো যাবে না, বোম্বাই-এর

গণিকাবৃত্তি থেকে মুক্ত করা যাবে না বাংলা ছবিকে। সচেতনভাবে হলিউড-এর নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে যেদিন এদেশের ছবি নিজস্ব ভারতীয় বক্তব্য ও স্টাইলকে খুঁজে পাবে সেদিনই সত্যকার সিনেমার সূত্রপাত হবে ভারতবর্ষে।

*

সেন্সরের কাঁচি

ছবি : জিপসি মেয়ে। ভাষা : বাংলা। প্রযোজক : নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স।

সেন্সরের নির্দেশ : ১নং রিল : প্রথম দৃশ্যে নায়ক যেখানে মাতাল অবস্থায় একটি ল্যাম্পপোস্টকে আলিঙ্গন করে সিগারেট খেতে অনুরোধ করছে, সেই অংশটুকু বাদ দিন।

২ ও ৩নং রিল : ছবির গোড়ার দিকে অত্যধিক মাতলামোর দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত করুন।

৬নং রিল : প্রেমের দৃশ্যটিকে সংক্ষিপ্ত করুন এবং যেখানে নায়ক ও নায়িকা মাটিতে শায়িত এবং নায়িকা নায়কের দেহের উপরে এলায়িত অবস্থায় রয়েছে সেই অংশটুকু সম্পূর্ণ বাদ দিন।

৮নং রিল : ইঙ্গিতপূর্ণ জিপ্সি-নাচগুলিকে যথাসম্ভব ছাঁটাই করুন।

৯নং রিল : জিপ্সিদের আড্ডায় জিপ্সি মেয়েটির ব্যভিচারের ইঙ্গিতপূর্ণ দৃশ্যটি বাদ দিন।

১১ ও ১৪নং রিল : ছবিতে যেখানেই কলকাতার পুলিশ অফিসার ও পুলিশ দেখানো হয়েছে সেখানে আসল পুলিশের বদলে নকল পুলিশ দিয়ে অভিনয় করান এবং পুলিশের কণ্ঠস্বরও 'ডাব্' করুন।

ছবি : সাউথ সি সিনার। ভাষা : ইংরিজি। প্রযোজক : ইউনিভার্সাল।

সেন্সরের নির্দেশ : (ক) যেখানে নায়িকা খেলাচ্ছলে জল ছিটোতে ছিটোতে তার স্কার্টটাকে একটু বেশি তুলে ফেলেছে, সেই অংশটুকু বাদ দিন।

(খ) যে দৃশ্যে একজন 'কাফে'র মালিক একটি জাভানী চাকরাণীকে চড় মারছে বলে দেখানো হয়েছে সেটিকে বাদ দিন।

ছবি : তারা। ভাষা : হিন্দী। প্রযোজক : আর. ডি. পরীঞ্জা।

সেন্সরের নির্দেশ : ভিখিরী মেয়ের গাওয়া প্রথম গানের প্রথম চরণটি, যাতে বলা হয়েছে 'কলকাতা থেকে ধুতি-পরা বাঙালীবাবুরা এসেছে পান চিবোতে চিবোতে, পকেট তাদের খালি', বাদ দিন।

ছবি : রেড সুজ। ভাষা : ইংরিজি। প্রযোজক : ঈগল্-লায়ন।

সেন্সরের নির্দেশ : ১২নং রিল : ঘোড়াগাড়ির দৃশ্যটি, যেখানে জুলিয়ান ক্রাস্টার ও ভিকি পেজ এক সঙ্গে শুয়ে আছে, সংক্ষিপ্ত করুন। আর যেখানে তাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখা যায় সেটুকু বাদ দিন।

১৬নং রিল : জুলিয়ান যে দৃশ্যে পেজের বুকের উপর হাত রেখেছে সেই দৃশ্যটি বাদ দিন।

ছবি : খিড়কী। ভাষা : হিন্দী। প্রযোজক : অরবিন্দ-আনন্দ্।

সেন্সরের নির্দেশ : গান্ধীনৃত্য এবং 'জয় বোলো মহাত্মা গান্ধী কো' গানটি বাদ দিন।
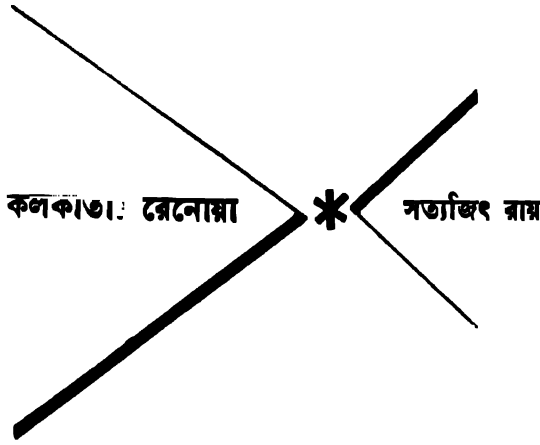
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে জানা গেল যে মিস্টার ও মিসেস রেনোয়া রয়াল সুইটে রয়েছেন।

হোটেলে গিয়ে রেনোয়ার সঙ্গে দেখা করব এটা আমার পক্ষে একরকম দুঃসাহস। তাঁর কলকাতায় আসা নিয়ে কোনোই হৈচৈ হয়নি বটে, কিন্তু সিনেমাশিল্পে স্থানীয় উৎসাহীদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, কলকাতায় তিনি দৈবক্রমে আসেননি, জরুরী কাজে আর কোথাও যাওয়ার পথে যে তিনি কলকাতা ছুঁয়ে যাচ্ছেন তাও নয়। তিনি কলকাতাতেই বিশেষ করে এসেছেন। উদ্দেশ্য : খাশ বাঙলাদেশের যথার্থ পরিবেশে রুমার গডেনের 'দি রিভার' উপন্যাসখানির ফিল্ম তোলা। সুতরাং তাঁর কলকাতায় অবস্থান সম্ভবত দীর্ঘই হবে।

কিন্তু মানুষের খ্যাতি তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়ার পক্ষে অনুকূল নয়; রেনোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আশাও তাই একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ক্লাইড ডি-ভিনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কাঠখোট্টা চেহারার এই মানুষটি উনিশশো-ত্রিশ সালের দিকে 'ট্রেডার হর্ন' ফিল্মের ফোটোগ্রাফি করে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং কিছু যশও লাভ করেছিলেন। আউটডোর ছবি তোলার কাজে আজকাল তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ধরা হয়। 'দি রিভার' ফিল্মটির প্রাথমিক চিত্রগ্রহণের কাজে তাঁর উপর তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছে। ছবিটি হবে টেকনিকালার। ডি-ভিনা খোশমেজাজে বাৎলে দিলেন, 'আরে মশাই, জন চমৎকার লোক, খুব মিশুক, তার সঙ্গে দেখা করা অত্যন্ত সহজ। যে কোনোদিন সন্ধ্যায় তার হোটেলে গেলেই দেখা হবে।' শুনে আমার আশঙ্কা কাটল।

গিয়ে দেখা গেল, রেনোয়ার সঙ্গে দেখা করাই যে শুধু সহজ তা নয়, তিনি এত বেশি সজ্জন আর বিনয়ী যে খুব সতর্ক না হলে, আর একটু হলেই হয়তো আমি নিজেই রেনোয়ার অবগতির জন্য সিনেমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ

ফটো : সুনীল জানা

জাঁ রেনোয়া ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
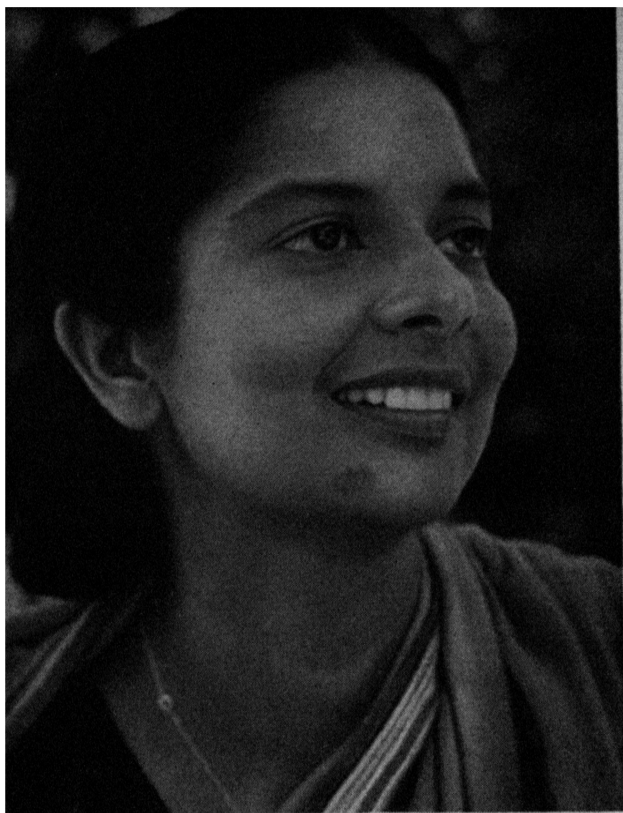
'দি রিভার' চিত্রের
গৌণ নায়িকা : রাধা শ্রীরাম
ফটো : সুনীল জানা

'দি রিভার' চিত্রে
বাঙলার আল্পনা
ফটো : সুব্রত মিত্র

ফটো : সুব্রত মিত্র

পরিচালনারত রেনোয়া

ফটো : সুব্রত মিত্র

ফটো : সুনীল জানা
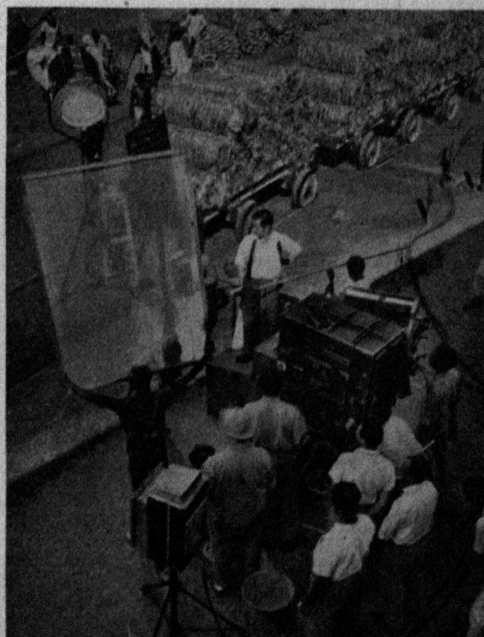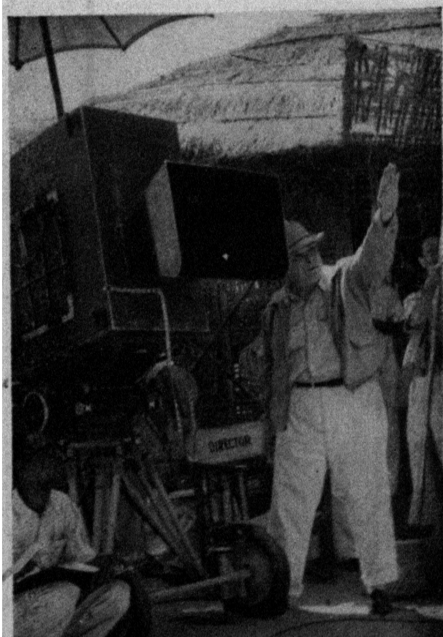
রেনোয়া-র ছবিতে বাঙলাদেশ
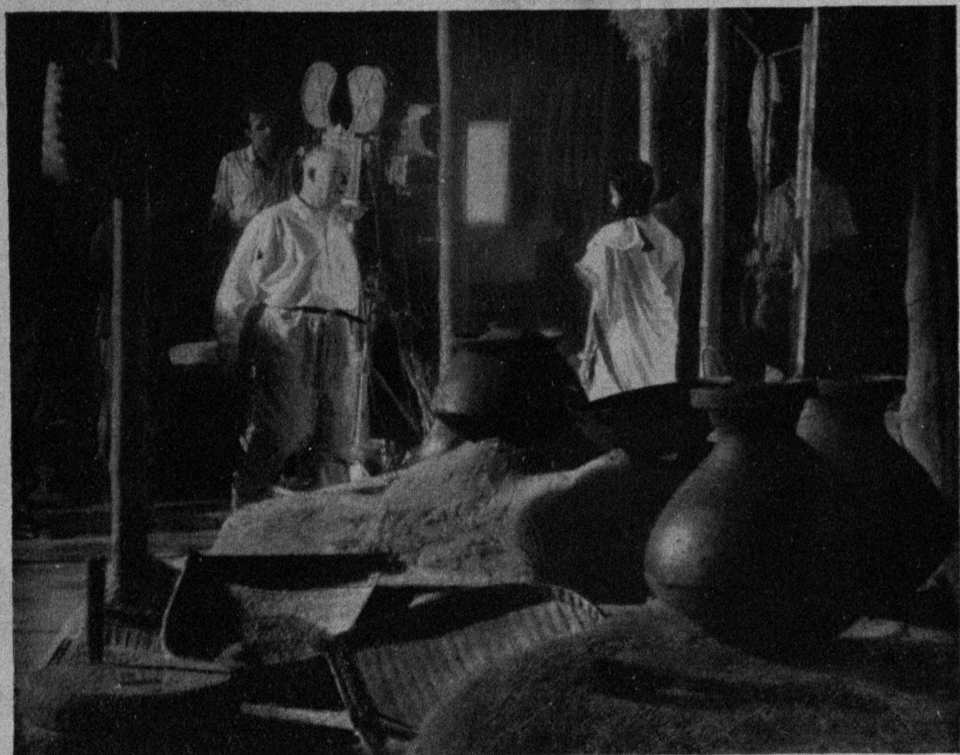
কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সম্বর্ধনা সভায়

ফটো : শম্ভু সাহা

করে দিতাম। অজস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ছিল। যেমন, কেন তিনি 'দি রিভার' ছবি তুলতে চান? হলিউডে ফিল্ম তুলতে তাঁর ভালো লাগত কিনা? আবার কি তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসার কথা ভাবছেন? কিন্তু সময়মতো দেখা গেল আমার বেবাক প্রশ্নের খেই গেছে হারিয়ে। শেষ পর্যন্ত নির্বোধ একটি প্রশ্ন করে বসলাম—'ভারতবর্ষ কেমন লাগছে আপনার?'

গম্ভীর হয়ে রেনোয়া উত্তর দিলেন : 'আর একটু ভালো করে চিনে নিয়ে আপনার কথার উত্তর দেব। আপাতত কলকাতা শহরের সঙ্গে চেনাজানার পালা চলছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে এই শহর।'

সেই সন্ধ্যায় আর বিশেষ কিছু প্রশ্ন করার সময়ই হল না। শহরে আর গঙ্গায় দুতিনবার বেড়িয়ে এসেছেন তিনি এর মধ্যেই। সবিস্তারে তিনি সেই সব কথা শোনালেন। সেকেলে নৌকায় ভরা গঙ্গা নদী তাঁকে মুগ্ধ করেছে; অভিনব যা কিছু তাঁর চোখে পড়েছে তাই তাঁর ভালো লেগেছে। 'এসে কি মনে হচ্ছে জানেন?' রেনোয়া বললেন, 'ভারতবর্ষ এখনো যেন আদিম মানবজীবনের কিছু মাধুর্য, কিছু সরলতা বজায় রাখতে পেরেছে। এখানে মাঝিদের দাঁড় টানা, চাষীর লাঙল দেওয়া, কুয়ো থেকে মেয়েদের জল তোলা দেখতে দেখতে সেকালের মিশরীয় ম্যুরালচিত্র আর বাস্‌রিলিফ মূর্তির কথা মনে পড়ে যায়।'

সারাপথ নৌকোয় পাকিস্থান থেকে আসা এক আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের সঙ্গে রেনোয়ার আলাপ হয়েছিল। বললেন, 'রাস্তায় কত রকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা যে হয়েছে এদের! আমার বিশ্বাস এদের কাহিনী নিয়ে খুব ভালো ফিল্ম তোলা যায়।' আমি বললাম ভারতবর্ষে এমন গল্পের ছড়াছড়ি, কেউ তাকিয়ে দেখে না। 'দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে,' দৃঢ় প্রতীতির সঙ্গে বললেন রেনোয়া। আমি বললাম, 'নাঃ, দেখবে না। ভারতীয় ডিরেক্টাররা দিশী বাস্তবতার চেয়ে হলিউড-ছবির হৃদ্দ কৃত্রিমতায় বেশি প্রেরণা পান।' 'আঃ, এই আমেরিকান ফিল্ম—' রেনোয়া বিষণ্ণ-ভাবে মাথা নাড়লেন, 'এর প্রভাব আমি জানি!'

কয়েকদিন পরে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি রেনোয়ার সম্মানে এক অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন করেন। এই সভায় রেনোয়াকে সূক্ষ্ম এবং স্থূল হাজার রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর মনোমুগ্ধকর ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে রেনোয়া সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 'দি রিভার' সম্পর্কে বললেন যে 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায় প্রথমে তিনি একটি সমালোচনা পড়েছিলেন। তাতে কাহিনীর যেটুকু বর্ণনা দেওয়া ছিল তা পড়েই তাঁর ধারণা হয় যে এ নিয়ে চমৎকার একটি ফিল্ম হয়তো তোলা যায়। মূল উপন্যাস পড়ে সে ধারণা আরো দৃঢ় হয় এবং তখুনি ফিল্মের উপযোগী করে গল্পটাকে তিনি সাজাতে বসেন। শিল্পী গ্যয়ার জীবনী

নিয়ে ইতালিতে গিয়ে তাঁর একটি ছবি তোলার কথা ছিল। সেটা কাজেই মুলতবী রাখতে হল।

আমি উপন্যাসটি পড়িনি, গল্পটা কি তাও জানা ছিল না। এইটুকু শুধু জানতাম যে বাঙলাদেশের একটি নদী, সম্ভবত গঙ্গার সঙ্গে কাহিনীর কোনো যোগ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিয়ে হলিউডের ছবিতে আজগুবী, বিকৃত সব অপকীর্তি দেখার পর, প্রকৃত মহৎ একজন ডিরেক্টার সেই দেশকে নিয়ে ফিল্মে কি করেন দেখার জন্য আমার ভারি আগ্রহ ছিল। সুতরাং রেনোয়া যখন বললেন যে ছবিটি বিশেষ করে মার্কিন দর্শকদের জন্যই তোলা হচ্ছে, ছবিতে ভারতীয় চরিত্র আছে মাত্র একটি—তাও ইউরোপীয় পরিবারের ভৃত্য হিসাবে এবং প্রকৃত ভারতবর্ষের ছায়া এ ফিল্মে আশা না করাই ভালো—তখন অত্যন্ত হতাশ হলাম। ছবির দৃশ্যাবলী অবশ্য বাস্তবিক করেই তোলা হবে, কেননা প্রায় আগাগোড়া সব ছবিটারই শুটিং হবে কলকাতায়। এটা আমার মনে হল রীতিমতো বাড়াবাড়ি! ক্যালিফর্নিয়া থেকে এতটা পথ আসা শুধু পরিবেশের যাথার্থ্য বজায় রাখার জন্য?

'হলিউডে গেলেই বিখ্যাত সব ইউরোপীয় ডিরেক্টারদেরও এমন মতিভ্রম হয় কেন, বলতে পারেন?' প্রশ্নটা আমাদের অনেকেরই মনে ছিল, মুখে আনার সাহস ছিল না। কিন্তু শেষকালে প্রশ্নটা যখন কারো মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল, তখন উত্তর দিতে রেনোয়ার আগ্রহ দেখে আমরা সকলেই যুগপৎ বিস্মিত হলাম এবং স্বস্তি বোধ করলাম। 'বলছি, তাঁদের কি হয় বলছি আপনাদের,' রেনোয়া আরম্ভ করলেন, 'অতিরিক্ত শৃঙ্খলার প্রতি মার্কিন দেশের মোহই তাঁদের সর্বনাশ ঘটায়। এই মত্ততার কথা আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বচক্ষে না দেখলে ধারণাই করতে পারবেন না ব্যাপারটা কার্যত কি দাঁড়ায়। ধরুন আপনি আমেরিকায় গেছেন, কোথাও একটু ঘুরতে বেরোবেন। ট্রেন ধরতে স্টেসনে গেলেন। কি দেখবেন? দেখবেন, ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ট্রেনটি এল। এক মিনিট এদিক ওদিক হবার যো নেই। ভাবুন তো কি আশ্চর্য ব্যাপার। ফ্রান্সে কখনো এ রকম ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রেন চলে না। যেহেতু এতটা সময়জ্ঞান আপনার নেই, কাজেই অস্বস্তি বোধ করতে আপনি বাধ্য। তারপর স্টুডিয়োতে কাজ করতে ঢুকলেন। আপনি তৈরি হয়ে গেছেন, এখন আরম্ভ হলেই হয়। কি দেখবেন? না, পদে পদে আপনাকে ওদের কাজের নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। সেও বড় একটা দুটো নিয়ম নয়। অর্থাৎ আপনাকেও চলতে হবে ঘড়ি মাফিক। তা ছাড়া আছে ওদের খুঁটে খুঁটে এটা সেটা পরীক্ষা করে দেখার বাতিক। শব্দ কি রকম উঠছে তার পরীক্ষা হবে, একবার নয় দুবার। ফলে নিখুঁত শব্দটি পাবেন। ভালো! তারপর পরীক্ষা হবে আলো কেমন আছে, সেও দুবার করে। ফলে নিখুঁত আলো পাবেন। সেও ভালো। কিন্তু ডিরেক্টারের সৃষ্টিপ্রেরণার উপরেও যখন এইরকম পরীক্ষা চালাতে আসে—তখন ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধার দাঁড়ায় না।'

প্রকৃত সদিচ্ছাও যে হলিউডে এসে ব্যর্থ হয়ে যায়, রেনোয়া মনে করেন তার জন্য দায়ী হলিউডের কতিপয় অচল পদ্ধতি। যেমন ওদের 'স্টার সিস্টেম', ফিল্ম সেন্সার করার অন্তহীন আইনকানুন, যেমন ফিল্মকে যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত করা একটা পণ্যদ্রব্য হিসাবে দেখার অভ্যাস। দৈবে কদাচিৎ কোনো ভাগ্যবান ডিরেক্টার মনের মতো কাহিনী, মনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী ('স্টার' নয়), আর মনের মতো ফিল্মিক স্বাধীনতা পেয়ে যান : ফলে যথার্থ ভালো একটি ফিল্ম হয়ে যায়। রেনোয়া নিজে হলিউডে একবার মাত্র এ ধরনের আদর্শ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে পেরেছিলেন, 'দি সাদার্নার' ছবিটি তোলার সময়।

তা ছাড়া রেনোয়া বিশ্বাস করেন যে দেশের সর্বাধিক দুর্গতির দিনেই সেদেশের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি প্রস্তুত করা সম্ভব। নিশ্চিত আরামের পরিবেশ সিনেমাশিল্পের পক্ষে শুভ নয়। বললেন, "যুদ্ধের ফলে ইতালীয় ছবির কি পরিণতি হয়েছে দেখুন। 'ব্রিফ এনকাউণ্টার'-এর কথা একবার ভাবুন। লণ্ডনে যদি তখন অমন-ভাবে বোমা না পড়ত তাহলে ওরকম মহৎ একটি ছবি তোলা সম্ভবপর হত বলেই আমি মনে করি না। আমার মনে হয় হলিউডেও ভালোমতো একবার বোমাবর্ষণ প্রয়োজন..."

ফুলে আলো করা পলাশের একটা গাছ দেখিয়ে রেনোয়া বললেন, 'দেখুন ঐ ফুল-গুলো।' ছবির জন্য উপযুক্ত 'লোকেশান' সন্ধানে সেই প্রথম আমি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলাম। 'কি সুন্দর, না? ফুল কিন্তু আমেরিকাতেও আছে! যেমন পয়েন-সেটিয়া—ক্যালিফর্নিয়ায় অজস্র ফোটে। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন ঐ কলাগাছের ঝাড়, তার নিচে ছোট্ট সবুজ ডোবাটি। এ জিনিস ক্যালিফর্নিয়ায় নেই। এই হচ্ছে বাঙলাদেশ!' রেনোয়া যে উপযুক্ত লোকেশান সন্ধানেই ছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে তিনি খুঁজছিলেন খাঁটি এদেশী সুরটি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সেই বিশেষ রূপটি—ফিল্মে যা ছবি হিসেবে ছবি, আবার বাঙলাদেশের রূপ হিসেবে রূপ। তাঁর কথায় : 'ছবিতে বেশি জিনিস ধরাতে নেই। ঠিক যা প্রয়োজন তা যত্ন নিয়ে দেখাতে পারলেই হল।'

ঐ বয়েস আর ঐ বপুর লোকের পক্ষে রেনোয়ার উৎসাহ আর কর্মক্ষমতা বিস্ময়কর। কোনো দৃশ্যের ঠিক ঠিক পরিবেশটি খুঁজে পেতে তিনি সম্ভব অসম্ভব জায়গায় মাইলের পর মাইল হাঁটবেন। সময় সময় কাজের মধ্যে তিনি এমন গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে যান যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে মৃদু তিরস্কার না করে পারেন না : 'কতক্ষণ তুমি রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরছ বলতো?' কিংবা 'ছ'টার সময় তোমার না কোথায় বেরোবার কথা? ভুলে বসে আছ?'

এইরকম ঘুরতে ঘুরতে নিজের জীবনের কথা রেনোয়া প্রাণ খুলে বলতেন। তাঁর

যৌবনের কথা : তাঁর বাবার কথা : ইমপ্রেশানিস্ট আন্দোলনের সব বড় বড় খ্যাতনামা শিল্পীদের কথা। কখনো মৃৎশিল্পের কথা উঠত—সিনেমার পরেই যেটা হ'ল তাঁর সব চেয়ে বড় নেশা! আর সিনেমার কথা তো বটেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পায়ের আঘাত নিয়ে যখন হাসপাতালে পড়ে ছিলেন তখনই সর্বপ্রথম তিনি ফিল্ম তোলার কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করেন। আসল হাতেখড়ি হয় অবশ্য অনেক পরে। ইতিমধ্যে এক দফা সাংবাদিকের কাজ করা হয়ে গেছে। উত্তেজিতভাবে ফিল্মে আধুনিক আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে রেনোয়া বললেন যে সবাক যুগের আগে ফরাসী ফিল্মের অ-বাক যুগ বৃথায় গেছে। কিন্তু ফিল্মে যেই শব্দের আবির্ভাব হল, অমনি যেন জাদু ঘটে গেল। রেনোয়ার ভাষায় : 'ফিল্ম যারা তোলে আর ফিল্ম যারা দেখে তাদের মধ্যে সহজ যোগাযোগের একটা গুপ্তদ্বার কে যেন হঠাৎ খুলে দিল। সে এক দারুণ উত্তেজনা। যা কিছু করতে চাই আমরা, দর্শকরা তাই বুঝতে পারে! দর্শকমনের সেই আশ্চর্য সংবেদন না পেলে ফরাসী ফিল্ম পরিণতির পথে এতখানি অগ্রসর কিছুতেই হতে পারত না। সর্ব বিষয়ে তাদের সহায়তা পেয়েছি আমরা; ব্যক্তিগতভাবে নিজে আমি কৃতজ্ঞ তাদের কাছে।'

জার্মান অধিকারের সময় পর্যন্ত এই সমৃদ্ধির যুগ গেছে। জার্মানদের হাতে পড়ে ফরাসী ফিল্মের যন্ত্রগত নৈপুণ্য অবশ্য এতটুকু হ্রাস পায়নি, কেননা, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাদের বদান্যতার দুর্নাম হবে—জার্মানরা তা চাইত না। কিন্তু গুণের বিচারে এ সময়কার ফরাসী ছবি নিকৃষ্ট।

তাঁর তোলা পুরোনো ছবিগুলির মধ্যে 'লা শিয়েন্' ছবিটি রেনোয়ার বিশেষ প্রিয় বলে মনে হল। দুঃখ করে বললেন, 'হলিউডে ওরা ওটাকে আবার নতুন করে তুলিয়েছে, বিশ্রী হয়েছে।' ছবিটির দ্বিতীয় ভাষ্য তুলেছেন ডিরেক্টার ফ্রিৎস লাং। নতুন নাম হয়েছে 'স্কার্লেট স্ট্রিট'। তিরিশের যুগের শেষ দিকে তোলা শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে 'লা রেইল দ্যু জ্য' ছবিটির উপরে বেনোয়ার বিশেষ পক্ষপাত। এটি হল আগাগোড়া তাঁর নিজের সৃষ্টি। এমনকি, তিনি স্বয়ং এর একটা চরিত্রের অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। 'ল্য পার্তি দ্যু ক'পান্' ছবির ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র। মনে হয় ছোট গল্পের চিত্ররূপ দিলে কেমন হয়, বেনোয়া সেটাই পরীক্ষা করছিলেন। আর্থিক দিক বিবেচনা করলে এ ধরনের ছোট ছবি গোটা দুয়েক এক সঙ্গে দেখানো প্রয়োজন। মোপাসাঁর গল্প নিযে পূর্বোক্ত ছবিটি তোলার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল আর একটায় হাত দেবেন। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই ছবি তোলার কাজে ইস্তফা দিতে হয়। জার্মান অধিকারের সময় নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচিযে তাঁর এক বন্ধু নেগেটিভগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন। রাহুমুক্তির পর ছবিটি ছাপা হয় এবং পরিচিতি লিখে কাহিনীর ফাঁক ভরিয়ে সেটি দেখানো হয়। রেনোয়া নিজে তখনো ছবিটি দেখেননি। জার্মানরা যেদিন প্যারিসে পদার্পণ করে, সেইদিনই তিনি স্ত্রী আর সুটকেসে ধরার মতো জিনিসপত্র নিযে প্যারিস ত্যাগ করেছিলেন।

প্যারিস থেকে হলিউড। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার অসুবিধাটুকু ছাড়া রেনোয়ার ক্যালিফর্নিয়া বেশ ভালো লেগেছিল। চমৎকার জল হাওয়া, চমৎকার সব বন্ধুরা। চ্যাপলিন স্বয়ং—যাঁর নাম শুনেই তিনি আত্মহারা—এই বন্ধুদের অন্যতম। চ্যাপলিনের কথা ভেবে রেনোয়া দুঃখ করেন। বললেন, 'মনমরা হয়ে আছেন চ্যাপলিন। আমেরিকায় কেউ বোঝে না তাঁকে।' চ্যাপলিন আর কিছু করছেন কিনা এখন, জিগগেস করলাম। রেনোয়া বললেন, 'শেষ যখন দেখা হয় তখন তিনি সঙ্গীতময় একটি প্রহসনের ছবি তোলার কথা ভাবছিলেন। ভেবেছিলেন সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে তার চরিত্র বানাবেন। কিন্তু মনে হয় সেটা আর তোলা হবে না। চ্যাপলিনও দেখলাম কাউকে চটাতে চান না আজকাল। এ ধরনের ছবি তুললে কেউ চটবেন না, তা কি হয়?'

হলিউডে তোলা তাঁর পাঁচটি ছবির মধ্যে রেনোয়া একবারও 'দি ডায়ারি অভ এ চেম্বার মেইড' বা 'সোয়্যাম্প ওয়াটার'-এর নাম করলেন না। আমেরিকায় তখন লোকের ধারণা ছিল যে ইউরোপের নাৎসী-প্রতিরোধ আন্দোলনের কথাটা ভুয়া, নাৎসী-কবলিত দেশের সবাই ষড়যন্ত্রী। প্রত্যুত্তরে তিনি 'দিস ল্যান্ড ইজ মাইন' ছবিটি তোলেন। তা ছাড়া 'দি সাদার্নার' ছবিটি তুলতেও তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল। আমেরিকা বলতে কি বোঝায় তার কিছু নমুনা এই ছবিটিতে আছে। চরিত্রগুলিও বাস্তবিক। তাঁর মতে আমেরিকায় তোলা তাঁর ছবিগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ।

'দি উওম্যান অন দি বীচ্' ছবিটিকে কতকটা বলা যায় দুর্ঘটনা স্বরূপ। একটি মেয়ের জীবনে প্রেমই সর্বস্ব—কাহিনীর এই অংশটা রেনোয়াকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে দেখেন চরিত্রটির বিকাশের জন্য যা যা করা দরকার, মার্কিন ছবির আইনকানুন মেনে তা করা অসম্ভব। ফলত যেখানে যেখানে সুস্পষ্ট আবেগের আশ্রয় নেওয়ার কথা, সেখানে তাঁকে নানারকম ছল চাতুরী দেখিয়ে টেকনিকাল কৌশলের আশ্রয় নিতে হল।

রেনোয়া বলেন ছবিতে চরিত্রগুলির আবেগের সম্পর্ক অবিকল না দেখাতে পারলে কিছুই হল না। টেকনিক শুধু তার সহায়তা করে মাত্র। সেইখানেই টেকনিকের মূল্য। তার বাড়াবাড়ি হলে ফিল্মের টেকনিক অযথা দৃষ্টিকটু, বরং বাধা। 'আমেরিকায় ওদের যত চিন্তা ছবির টেকনিক নিয়ে, হৃদয়ের দিকটায় অবহেলা।'

আমি বললাম, 'আমেরিকায় বাস্তব জীবনের ডকুমেন্টারি ছবির আজকাল যে রেওয়াজ উঠেছে, সে বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?' রেনোয়া বললেন, "ও কিছু নতুন নয়। 'লা বেইত্ ইউম্যেইন' ছবির প্রায় সমস্ত দৃশ্য আমি লা হাভ্‌র্-এ খোলা হাওয়ায় তুলেছি। 'দি সাদার্নার' ছবির জন্য সামান্য কয়েকটি সেট শুধু তৈরি করিয়ে-ছিলাম। কিন্তু এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আমার ভালো লাগে না। আমার মনে হয় ফিল্ম তুলতে সময় সময় সেটের খুব প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া চরিত্রগুলি যদি স্বাভাবিকভাবে আচার-ব্যবহার না করে তাহলে বাস্তব দৃশ্যের মধ্যে নিয়ে তাদের

দিয়ে অভিনয় করিয়ে লাভ কি? কেউ কেউ মনে করেন অ-পেশাদার লোক দিয়ে অভিনয় করালেই ফল ভালো হয়। কথাটা আমি বুঝতেই পারি না। অভিনেতা না হয়ে কেউ রেম্যু কি গাব্যাঁর মতো অভিনয় করছে—ভাবতে পারেন? আমি পারি না। ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞ অভিনেতার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।” অগাধ অভিজ্ঞতার ফলে রেনোয়া রসতত্ত্বের নানাবিধ গোঁড়ামি থেকে বিস্ময়করভাবে মুক্ত। আমার মনে হয় তাঁর মনোভাব নিম্নোক্ত কথাটিতে চমৎকার প্রকাশ হয়েছে। বললেন, ‘যখনই কোনো নতুন ছবি তুলতে যাই, নিজেকে মনে করি শিশুর মতো, সিনেমার বিষয়ে যেন প্রথম শিখছি।’

তাঁর ইউরোপ যাত্রার আগের দিন হোটেলে গিয়ে দেখা করলাম। বাক্স ভরে টুকিটাকি স্মরণচিহ্ন নিয়ে চলেছেন, কিছু তাঁর ভক্তদের উপহার, কিছু নিজে কিনেছেন—বাজারে আর দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে। যে চার সপ্তাহ কলকাতায় ছিলেন—এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, এটা-সেটা দেখেছেন, ভেবেছেন। বাঙলাদেশ পেয়ে বসেছিল তাঁকে। একদিকে অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধুরী; অপরদিকে নোংরামি, দারিদ্র্য, দুঃখ। সামান্য কুঁড়েঘর দেখে তাঁকে মোহিত হতে দেখেছি, আবার একটি ভিখিরী দেখে বিমর্ষ হতেও দেখেছি। কয়লার খনি দেখে এসে এত বেশি তিনি বিচলিত হয়েছিলেন যে দিনের পর দিন ঐ কথাই শুধু বলতেন। এক সময় বললেন, ‘দেখুন, হলিউডের প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের দিশী রুচি কখনো যদি গড়ে তুলতে পারেন, আপনারা তাহলে একদিন মহৎ ফিল্মের জন্ম দিতে পারবেন।’

নভেম্বর মাসে সদলবলে আবার তিনি কলকাতায় ফিরছেন। এদেশে খোলা হাওয়ায় ছবি তোলার সেটাই শ্রেষ্ঠ সময়। ছবির জন্য কাহিনীটি অবশ্য নতুন করে লিখতে হবে। ‘লন্ডনে গিয়ে রুমার গডেনের সঙ্গে গল্পটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কিছু অদলবদল করার দরকার হতে পারে। হয়তো আরও কিছু নতুন চরিত্র যোগ করতে হবে। ইউরোপীয় পরিবারের পাশে তুলনা হিসেবে হয়তো কোনো ভারতীয় পরিবার আনা যায়।’ তা যদি হয় চমৎকার হবে।

সেই সন্ধ্যায় হোটেল থেকে ফেরার সময় নিশ্চিত হয়ে এলাম যে এখনো রেনোয়ার মনে অসীম সৃজনীশক্তি আছে। হলিউডে বারংবার আশাভঙ্গের পর ‘দি রিভার’ ছবিটি হয়তো তাঁর জীবনে অভিনব এবং গুরুত্বপূর্ণ এক পরিচ্ছেদের সূচনা করবে। তিনি এখন খাশ মার্কিন নাগরিক, কাজেই প্যারিসে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সুদূর। কিন্তু আসল কথা হল হলিউডের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসা। আসার স্থান হিসাবে ভারতবর্ষ মন্দ কিসে? নিঃসন্দেহে বলা যায়, রেনোয়ার স্বাধীন ইচ্ছায় এখানে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। নিয়মকানুনের বেড়াজাল তাঁকে বিরক্ত করবে না, তাঁর সৃষ্টির প্রেরণাকে দু ফিরতি করে বাজিয়ে দেখবে না কেউ। আর তা ছাড়া ট্রেন নিশ্চয়ই এদেশে কোনোদিন ঘড়ি ধরে চলবে না।

রেনোয়া-র চোখে বাঙলাদেশ

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

পিতার শিল্পী-খ্যাতির জের টেনে চলচ্চিত্রের জাঁ রেনোয়াকে বলা হয়েছে 'সিনেমার চিত্রশিল্পী'। ক্যামেরার তুলি দিয়ে তিনি পর্দায় ছবি আঁকেন। ছবি আঁকার স্টুডিওতে যেমন শিল্পী তেমনি চলচ্চিত্রের সেট-এ জাঁ রেনোয়া; আর্টের ভিন্নপথে গিয়েও তিনি পিতৃঋণ ভোলেননি। তিনি যে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শুধু আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের বিশ্ববিশ্রুত নেতার সমকক্ষ খ্যাতি লাভ করেছেন তাই নয়, ফিল্মে ছবি তোলার মধ্যে তুলি দিয়ে ছবি আঁকার ভাব এসেই তাঁর কাজকে মর্যাদা দিয়েছে।

পিতা-পুত্রের শিল্পগত সম্বন্ধ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করেও বলা চলে: পিতা অগস্ত রেনোয়া-র ছবি একদিন ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে যে গভীরতা দিয়েছিল তাকে সিনেমার নবীন শিল্পে টেনে এনেছেন তাঁর বিখ্যাত পুত্র। সিনেমা ফরাসী-দেশে শিল্পের উচ্চমার্গে আরোহণ করেছে, আসন নিয়েছে সাহিত্যের, সঙ্গীতের ও চিত্রকলার সঙ্গে একত্রে। বরঞ্চ ইউরোপের চিত্রশিল্পই আজ স্তিমিত, সিনেমার আর্ট উজ্জ্বল। ফরাসী ইম্প্রেশেনিজম্-এর যুগে চিত্রকলায় যে প্রাণ ছিল তার উত্তরাধিকারী হয়েছে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী ফরাসী সিনেমা। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় শিল্পচেতনাকে যাঁরা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উজ্জীবিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে জাঁ রেনোয়া-র স্থান সর্বাগ্রে। তিনি অগস্ত রেনোয়া-র পুত্র শুধু নন, তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী।

সারা পৃথিবীতে সিনেমা মহলে চলচ্চিত্রে রেনোয়া-র নেতৃত্বের যে বিশ্লেষণ হয়েছে তা নিয়ে ইতিহাস লেখার উপকরণ আছে প্রচুর। 'রেনোয়া—নেই অথচ সর্বদাই আছেন' এই নামের এক নিবন্ধে ফরাসী সিনেমা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে নিকল ভেদ্রে বলেছেন:

"জাঁ রেনোয়া-র 'লা রেইল দ্যু জ্য'র সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সিনেমার বাস্তবতার

অধ্যায় শেষ হয়ে গেল...কিন্তু এই ছবিতে এক অধ্যায়ের যেমন শেষ, তেমনি আর এক অধ্যায়ের শুরু।

"...দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী এই জীবনের মর্মকে রেনোয়া আট হাজার ফিটের মধ্যে যেভাবে ঘনীভূত রূপ দিয়েছেন সেভাবে তাকে বুঝতে গেলে এই যুগের সম্বন্ধে দশখানা উপন্যাস পড়তে হয়।

"...দিগন্ত বিস্তৃত রেললাইন নিয়ে 'লা বেইত্ ইউম্যেইন'-এর যে আরম্ভ তার মধ্যে ফরাসী সিনেমাশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আঁকা হয়ে গেছে।...কি অবলীলাক্রমে ফিল্মের এই সামান্য খণ্ডটুকু বিশুদ্ধ সিনেমার প্রকাশে পরিণত হয়েছে... সিনেমার জটিল যন্ত্রকে রেনোয়া কলমের মতোই সহজভাবে ব্যবহার করেছেন; শব্দের স্বাধীন নির্বাচন দিয়ে যেমন সাহিত্যের বিন্যাস, তেমনি এখানে দৃশ্যরূপের নির্বাচন ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ সিনেমা সৃষ্টি।

"রেনোয়া ফরাসী সিনেমার সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে আদৃত, পরিণত ও সর্বতোমুখী প্রতিভাবান শিল্পী..."

শিল্পী হিসাবে রেনোয়া-র মহত্ত্ব সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত। চ্যাপলিন বা গ্রিফিথ, আইসেন্স্টাইন বা পাব্স্ট্-এর মতো তিনিও সিনেমার অন্যতম গুরু। ১৯৪১ সালে হিটলারের আধিপত্যের সময় থেকে রেনোয়া ফ্রান্স ছেড়ে এসেছেন, তবু এখনো ফরাসী সিনেমার মজ্জায় মজ্জায় তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সিনেমাশিল্পের এত বড় স্রষ্টা ভারতবর্ষে আসাতে তেমন কোনো ব্যাপক উৎসাহ জাগেনি, বরং সিনেমামহলের দিক থেকে অনেকখানি বিরূপতার ভাব দেখা গেছে। নিঃসন্দেহে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে উন্নত চিন্তার অভাব। গত ছত্রিশ বছর ধরে কেবলই হলিউডের ছবি দেখার ফলে এদেশী পরিচালকদের মন সেই ছাঁচে ঢালা। সিনেমার উৎকর্ষ বিচারে হলিউড বহুদিন হল বাতিল হয়েছে। একে একে ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও অবশেষে ইতালীয় সিনেমার জয়জয়কার হল, তবু আমাদের দেশে হলিউডের মোহ কাটল না। উন্নত ধরনের ইউরোপীয় সিনেমার সঙ্গে এদেশের যোগ অতি ক্ষীণ, তার অস্তিত্বই যেন আমাদের চেতনার বাইরে। কাজেই এদেশে রেনোয়া-র পরিচয় হলিউডের একজন মামুলী পরিচালক হিসেবে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ভয়ে আমাদের সিনেমাকারেরা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, জাঁ রেনোয়া-র ভারতবর্ষে আসাকে বিদেশী ছবির নানাবিধ অভিযানের অঙ্গ হিসেবেই দেখা হয়েছে। সিনেমা ব্যবসায়ের বাইরে যেসব উৎসাহীরা রেনোয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি কটূক্তিও বর্ষণ করা হয়েছে অনেক। বিখ্যাত বাঙালী পরিচালক মধু বোস একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন : "হলিউড থেকে এত দূরে তো আর 'ফার্স্ট'-রেট' ডিরেক্টারকে পাঠাতে পারে না। কত খরচ! নইলে ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপরাই আসতে পারত!"

হলিউডের বাইরে অন্য বিদেশী সিনেমার সঙ্গে যোগ এদেশে কত ক্ষীণ তা এই কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সিনেমার সম্বন্ধে যাঁদের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ আছে, এবিষয়ে যাঁরা ছাত্রের মতো চর্চা করেছেন, দিনরাত্রি চিন্তা করেছেন, তাঁদের পক্ষে রেনোয়া-র মতো মহৎ শিল্পীর সংস্পর্শে আসাটা রোমাঞ্চকর। নানা বইপত্র থেকে চলচ্চিত্রশিল্পী রেনোয়া-র যে রূপ তাঁদের মনে ছিল তাকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ তাঁদের আশ্চর্য বলে বোধ হয়। তাঁর যেসব ফরাসী ছবির সবচেয়ে খ্যাতি, সেগুলি ভারতবর্ষে দেখানোই হয়নি। তবু কোনো বিদ্যার যাঁরা বিদ্যার্থী তাঁদের কাছে উঁচুদরের সমালোচনা মারফৎ জ্ঞানলাভের মূল্যও কম নয়। অনেক দুরূহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বচক্ষে না দেখলেও পণ্ডিতমহলের স্বীকৃতির ফলে তাকে মেনে নিতে আমাদের বাধে না। অপর পক্ষে রেনোয়া-র যে ক'টি মার্কিন ছবি এদেশে অল্পবিস্তর পরিচিত তার মধ্যেও তাঁর ক্ষমতার কিছু পরিচয় আছে। বস্তুত এদেশে অনেকের কাছে তাঁর পরিচয় 'দিস্ ল্যাণ্ড ইজ মাইন' ছবির নির্মাতা হিসেবেই। 'সাদার্নার' ছবিটি এখানে দেখানো হলেও সকলের নজরে পড়েনি। বেনোয়া-র মতে এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ মার্কিন ছবি। 'বেস্ট ফিল্ম প্লেজ' সিরিজের সম্পাদক গ্যাসনার ও নিকল্‌স্ বলেছেন : "সাদার্নার হচ্ছে 'মাস্টারপীস ইন মিনিয়েচার'।"

আঙ্গিকের বাধাকে রেনোয়া কখনো গ্রাহ্য করেননি। তাঁর বিখ্যাত ফরাসী ছবিগুলি চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে তৈরি। আমেরিকায় গিয়েও তাঁকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন 'দিস ল্যাণ্ড ইজ মাইন' ছবি যেদিন আরম্ভ হয় প্রযোজকের উপস্থিতিতে সেট-এ সেদিন ক্রেন সহযোগে শট নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। প্রযোজক বললেন : 'এ শটে ক্রেন ব্যবহার করার কোনো দরকার আছে?' রেনোয়া এই অনধিকার চর্চায় অতিশয় বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন : 'বেশ, ক্রেন নাবানো হোক। এ ছবিতে আমি ক্রেন ব্যবহারই করব না, একবারও না।' প্রযোজকের অনেক মিনতিতেও তিনি এই কথা আর প্রত্যাহার করলেন না। ছবিতে গতি আনার জন্য অন্য নানা পন্থা ব্যবহার হল, ক্রেনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। রেলস্টেশনের অনেক-গুলি দৃশ্য তিনি সত্যিকার রেলস্টেশনে তোলার সুযোগ পাননি। অনন্যোপায় হয়ে তিনি স্থির করলেন কেবল শব্দ দিয়েই স্টেশনের ভাব তিনি সৃষ্টি করবেন। মাত্র কয়েকটি শট-এ রেলস্টেশনের যে রূপ রেনোয়া এই ছবিতে ফুটিয়েছেন তাতে চল-চ্চিত্রে শব্দ ব্যবহারে তাঁর আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখা যায়। এখানে পরিচালক কল্পনার সাহায্যে আঙ্গিকের দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধে দেখা যাবে যে এদেশে এসেই রেনোয়া দেখতে চেয়েছেন বাঙলার ঘনিষ্ঠতম রূপটিকে। নদী, জল, মাটি, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদির কাব্যময় বাস্তবতা প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বাঙলাদেশকে তিনি টুরিস্টের চোখ দিয়ে দেখেননি, শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখেছেন। বাঙলাদেশে এসে তোলা তাঁর 'দি

রিভার' চিত্রে রুমার গডেন (ভারতবাসিনী ইংরেজ) লিখিত মূল কাহিনীতে বাঙলার ভাগ ছিল সামান্যই; যা ছিল সে কেবল পটভূমিটুকু। এই কাহিনী নিয়ে ছবি তুলতে তুলতে যত দিন যেতে লাগল, তত দেখলাম কাহিনীর রূপ কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে। একটি দুটি করে ক্রমে অসংখ্য দেশীয় চরিত্র ও ঘটনা যোগ করলেন রেনোয়া, বাঙলাদেশ ও গঙ্গা নদীই প্রধান হয়ে উঠল, ছবিতে ইংরেজের ভাগ গেল কমে। তার অর্থ এ নয় যে রেনোয়া সাহেব বাঙালী বনে গেলেন; বাঙলাকে তিনি দেখলেন বিদেশীর চোখ দিয়েই, কিন্তু গভীরভাবে দেখলেন। গঙ্গা নদীই যেন তাঁর কাহিনীর কেন্দ্র হয়ে উঠল। চারদিকে জন্ম মৃত্যু নিয়ে সংসারের বিচিত্র লীলা, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বিরাট নদী, যার শেষ নেই। এরই মধ্যে বিকশিত হচ্ছে একটি ছোট মেয়ের মন। এই তাঁর কাহিনী। এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রেরা ভারত-প্রবাসী ইংরেজ, কিন্তু শাসক ইংরেজ নয়, মানুষ ইংরেজ। ভারতের জলমাটির পরিবেশে থেকে এ ইংরেজ খাস ইংরেজীয়ানা থেকে অনেকখানি বিচ্যুত। খুঁটি-নাটিতে হয়তো সেখানে সর্বত্র সমান নির্ভুলতা নেই, ভারতবর্ষের ব্যাপারে নানা ত্রুটি হয়তো আমাদের চোখে পড়বে, তবু তার মধ্যে মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় আছে, হোক না সে বিদেশী। একটি এদেশী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মেয়েকে রেনোয়া তাঁর বিশেষ প্রিয় চরিত্রে অবতীর্ণ করিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এই চরিত্রের পরিণতির মধ্যে উজ্জ্বল।

রেনোয়া-র দৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ও প্রকৃতির যে সম্পর্ক সেটাই অসল, আর কিছুই কিছু নয়। ঘটনার ঘোড়দৌড়ে তাঁর আগ্রহ নেই, নাটকীয় সংঘাত, টেকনিকের কারসাজিতে তাঁর মন সাড়া দেয় না। গল্পের আদি অন্ত নিয়ে তিনি ব্যতি-ব্যস্ত নন। মানুষের মন তাঁর একমাত্র ধ্যানের বস্তু। ছবি তুলতে গিয়ে আর যা কিছুকে তিনি টানেন সবই মানুষের উপর আলোকপাতের জন্যই। এদিক থেকে 'দি রিভার' অনবদ্য গল্পকারিতার নিদর্শন না হয়ে উঠলেও রেনোয়া-র কাব্যময় দৃষ্টির কিছু পরিচয় নিশ্চয়ই দেবে। সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতির পথে তার বাধা হয়তো এইখানে যে 'দি রিভার' এদেশে তাঁর প্রথম ছবি। যখন এ ছবির কাজ শেষ হল তখন তিনি বললেন : 'এখন আমি যতদূর এদেশকে জেনেছি তাতে এবার সত্যিই ছবি করা যায়।'

রেনোয়া-র পরিচালনাকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার জন্য অনেকে গঙ্গার তীরে তাঁর কাজ দেখতে যেতেন। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ত সেটা হচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে সামান্য কর্মী পর্যন্ত সকলকে তাঁর আপন করে নেবার ক্ষমতা। সকলের মনে তিনি অতি সহজে এই বোধ জন্মিয়ে দিলেন যে তাঁরা সকলে মিলে একত্রে একটা কিছু সৃষ্টি করছেন। এই বোধের ফলে সকলের কাজে এমন আনন্দের ভাব এসেছিল যাতে প্রত্যেক কর্মীই নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশের দিকে মনোযোগ দিতেন। সারাদিন দারুণ গ্রীষ্মের রোদে মাঝগঙ্গায় টলোমলো নৌকায় দাঁড়িয়ে তাঁকে কাজ

করতে দেখেছি। প্রৌঢ় বয়সে তাঁর আশ্চর্য কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে অন্যেরাও প্রেরণা পেতেন। ছবির কোনো দৃশ্য বিষয়ে তাঁর মনের যা কল্পনা ছিল তাকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর পরিশ্রমের অবধি ছিল না। তাঁর সব চেয়ে আশ্চর্য গুণ ছিল অভিনেতার মনে নিজের কল্পনাকে সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অভিনেতার মনকে প্রচুর ভাবভঙ্গী ও ভাঙা ইংরিজীর সাহায্যে তিনি নিপুণ-ভাবে তার ভূমিকার জন্য তৈরি করতেন। সেট-এ অভিনেতার সঙ্গে অন্য কারুর কথা বলার বিরুদ্ধে তাঁর কড়া নিষেধ ছিল। এই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখলে তিনি রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠতেন। একমাত্র সেট-এই তাঁকে বিচলিত হতে দেখেছি। একদিনের কথা বলি। 'হ্যারিয়েট' বলে একটি ছোট মেয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য কয়েকজনের পরীক্ষা চলছিল এক বাগানে। যে মেয়েটির উপর তাঁর ঝোঁক ছিল, ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে তিনি বহুক্ষণ ধরে গল্প করে, ভুলিয়ে অবশেষে ক্যামেরাকে ইঙ্গিত করলেন। মেয়েটির প্রায় অজ্ঞাতেই তার মুখের নানা দিক ও নানা ভাব স্বাভাবিকভাবে ক্যামেরায় তোলা হল। রেনোয়া তাকে হাসালেন, আশ্চর্য করলেন, অবশেষে রাগিয়ে দিলেন পর্যন্ত। পার্ট বলানোর কোনো চেষ্টা না করে তিনি কেবল লক্ষ্য করতে লাগলেন মেয়েটির স্বাভাবিক প্রবণতা, স্বাভাবিক শ্রী। মেয়েটি রোদে চোখ চাইতে পারছিল না। ক্যামেরাম্যান বিরক্ত হয়ে তাকে এক সময় ধমক দিলেন : 'ফেবরুয়ারীর রোদে চোখ চাইতে না পারলে টেকনিকালারে তুমি কি কাজ করবে!' রেনোয়া তীব্রভাবে ক্যামেরাম্যানকে বলে উঠলেন : 'সমস্ত নষ্ট করলে তুমি; এতক্ষণ ধরে যা কিছু তৈরি করলাম — সমস্ত নষ্ট করলে!' শুটিং ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা থেকে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে তাঁর এমন মনোমালিন্যের উৎপত্তি হল যে আসল ছবি তোলার সময় তিনি তাকে জবাব দিয়ে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্লদ রেনোয়াকে (যিনি 'মঁসিয়ে ভ্যাঁস' ছবিতে কাজের জন্য অস্কার পেয়েছিলেন) নিয়ে আসেন। অথচ ইতিপূর্বে ক্লদ কখনো টেকনিকালারের কাজ করেননি।

একদিন একদল ইংরেজ রেনোয়া-র সেট-এ এসে ভিড় করল। কাজ ফেলে এগিয়ে এলেন রেনোয়া। বললেন : 'এটা একটা ল্যাবরেটরী। এখানে আমরা কাজ করি। এই আর্টিস্টরা সকলেই মানুষ। এটা চিড়িয়াখানা নয়। আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব। আমার সঙ্গে আলাপ করতে হলে হোটেলে আসবেন, সেখানে যথাসাধ্য আপনাদের আদর-যত্ন করব। এখানে আসবেন না।'

এই ঘটনাগুলির মধ্যে নিজের কাজের প্রতি রেনোয়া-র আশ্চর্য নিষ্ঠার পরিচয় আছে। সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের সঙ্গে সাহিত্যের প্রতি বড় সাহিত্যিকের, চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের সম্বন্ধে বড় শিল্পীর বা সঙ্গীতকারের মনোভাবের কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। সিনেমার যেহেতু একটা ব্যবসায়িক সত্ত্বা আছে তাই তার সৃষ্টির নিয়ম সবই আলাদা একথা তিনি মানেন না। বরঞ্চ তিনি বলেন যে দর্শককে

সত্যিকার আনন্দ দিতে গেলে নিজেকে সত্যিকার শিল্পী হতে হবে। ফাঁকি দিয়ে আনন্দ দেওয়া যায় না।

সিনেমা সম্বন্ধে রেনোয়া-র সঙ্গে বহুবার দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়েছে। তাঁর মতে গল্প বা আঙ্গিকের চেয়ে মানুষের চরিত্র অনেক বড়।

'আর্টের বক্তব্যের চেয়ে রূপ এবং স্টাইলই বেশি জরুরী। আমার মতে একজন ডিক্টেটারকে দিয়ে যদি আইন করানো যেত যে সব পরিচালককেই কিছুদিন ধরে কেবলই এক বিষয়ে ছবি করতে হবে তাহলে ভালো কাজ অনেক বেশি দেখা যেত। আমরা তো ছবি করি না, কেবলই দেখি লোককে কি করে চমক লাগানো যায়। এ যেন দরজার আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে চমকে দেওয়ার মতো। এরই নাম আমরা বলি নাটক। এর পর কি, ওর পর কি এই চিন্তাতেই আমরা কেবল লোককে উত্তেজিত করে রাখি। এটা কেমন, ওটা কেমন বোধ করার সুযোগ দিই না। ভালো আর্ট তখনই সৃষ্টি করা যায় যখন বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শক আগে থেকেই পরিচিত। যেমন শেক্সপীয়ারের বা গ্রীক নাটকের গল্প সে যুগে সকলেরই জানা ছিল, এদেশে রামায়ণ মহাভারতের গল্প সবাই জানে, অথচ তা থেকেই যুগে যুগে অসংখ্য সার্থক সৃষ্টির জন্ম। গল্পের যখন নূতনত্ব থাকে না তখনই শিল্প সৃষ্টিতে সত্যিকার জিনিস আসে—আসে চরিত্র, আবেগ, দৃশ্যরূপ। সকলেই এক গল্প নিয়ে ছবি তুললে তাতে কারুর ছবি ভালো হত, কারুর বা মন্দ; জানা যেত কে সত্যিকার শিল্পী, কে নয়। আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টের ছবির বিষয়বস্তু প্রায় পৌরাণিক হয়ে গেছে, তার কি কি ঘটনা থাকবে তা সকলেরই জানা। কাজেই পরিচালককে সেখানে নির্ভর করতে হয় চরিত্র, ছবির গতি ও দৃশ্যরূপের উপর, জানা ঘটনাকেই নতুন করে সাজানোর ক্ষমতার উপর। তাই সেদেশে অন্য নানা জাতের ছবির জন-প্রিয়তা কমে যাচ্ছে, ওয়েস্টার্নের কমছে না। শেক্সপীয়ার বা মোলিয়েরর কখনো গল্প উদ্ভাবন করেননি, সেটাই তাঁদের মহৎ গুণ। আলেকজাণ্ডার ডুমা কেবল গল্পই উদ্ভাবন করেছেন, আর কিছু করেননি, তার ফল কি হয়েছে আমরা জানি। তোমাদের দেশের সাহিত্যে এই গুণ যথেষ্ট রয়েছে। তোমরা যদি কেবলই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে নানা ভাবের ছবি করে যাও তাহলে হয়তো বা তার থেকে একটা দেশীয় স্টাইলের উদ্ভব হতে পারে।'

গোড়ার দিকে ভারতীয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে রেনোয়া-র মনে হয়েছিল—এরা অভিনয় করাকে নকল করা মনে করে কেন? অভিনয় হচ্ছে ভাবকে প্রকাশ করা। 'ক্রমেই বুঝতে পারছি তোমাদের ছবি কেন তেমন ভালো হচ্ছে না। যন্ত্রপাতির টেকনিক তো এদেশে ইতালীয়ান বা ফরাসী ছবির চেয়ে কিছু খারাপ নয়। মুশকিল হচ্ছে অভিনয় আর চিত্রনাট্য নিয়ে। তোমাদের অভিনয় বড় বেশি ধরাবাঁধা; রাগ দেখাতে হলে এরকম, কান্না দেখাতে হলে ওরকম। চিত্রনাট্য অবশ্য এখনকার চেয়ে অনেক ভালো করে লিখতেই হবে, নইলে কিছুই হবে না।

ফটো : গোপাল সান্যাল

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়

শোভা সেন

ফটো : সুনীল জানা

অনুভা গুপ্তা
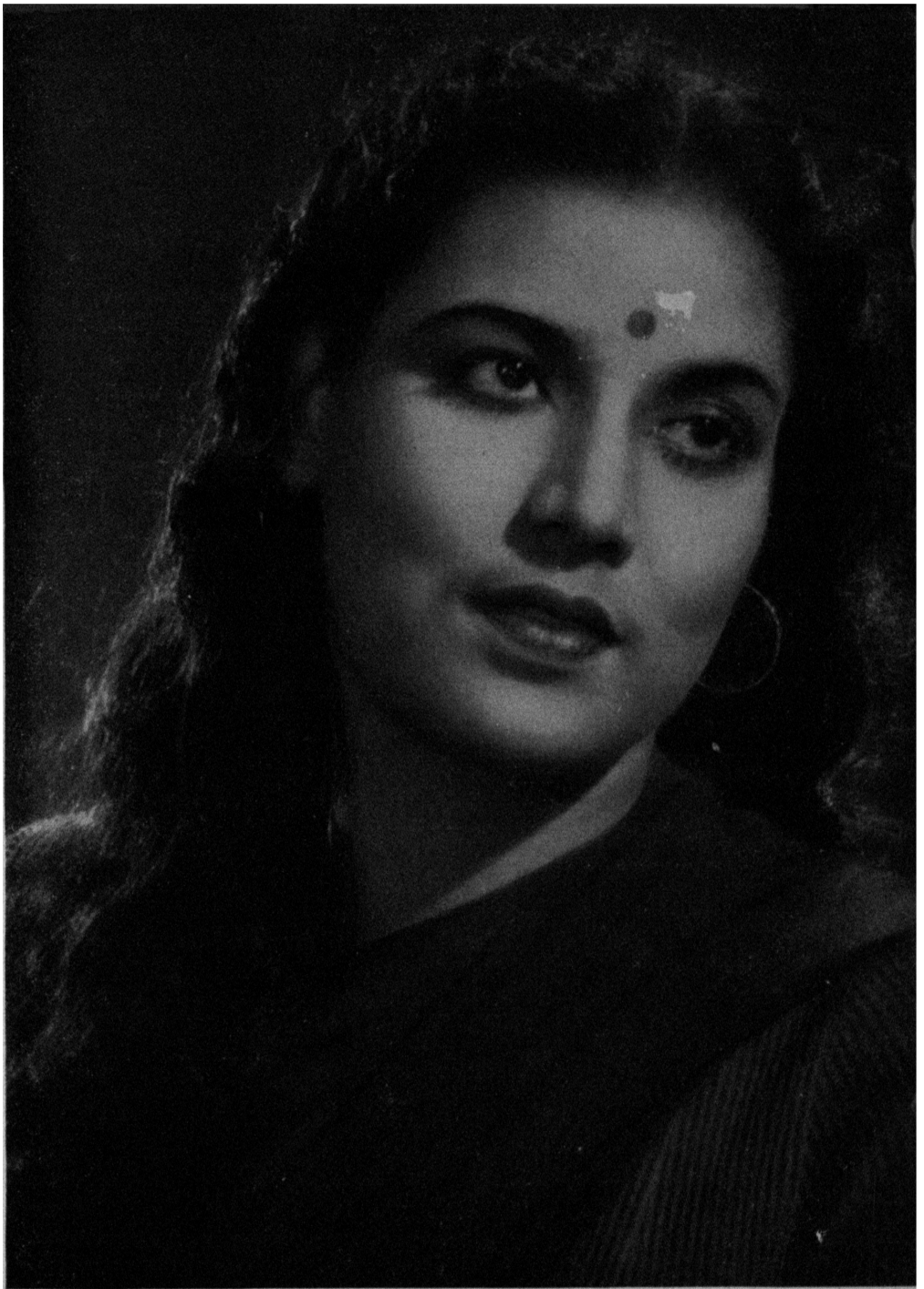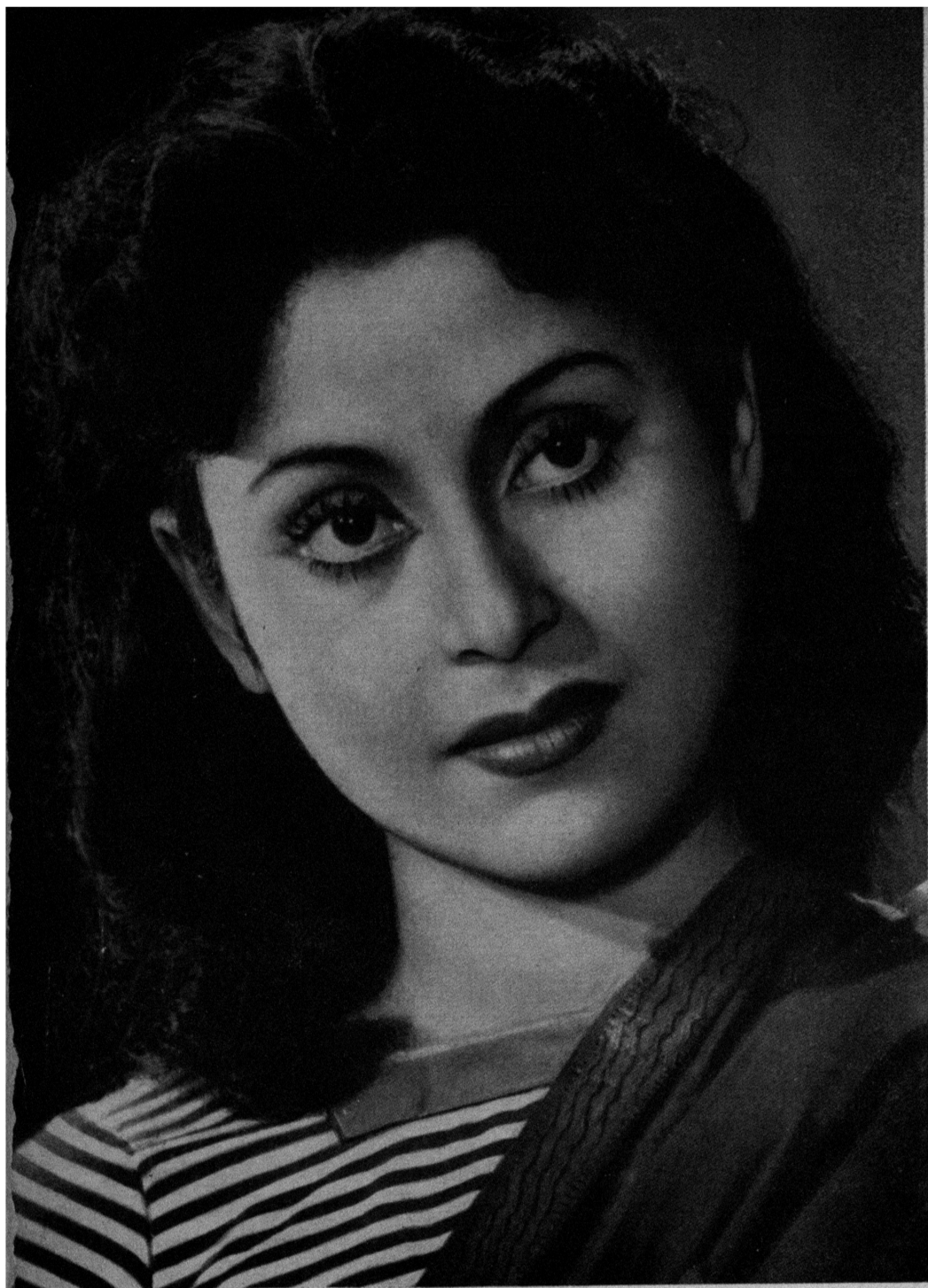
স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

তবে অভিনয়ের ব্যাপারে ঠিক কি যে হওয়া উচিত সেটা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। ইউরোপের বাস্তব-ঘেঁষা অভিনয় হয়তো তোমাদের জিনিস নয়। তোমাদের অন্যান্য আর্ট যেমন পরিস্কার রীতি পদ্ধতিতে বাঁধা, তেমনি হয়তো তোমাদের অভিনয়ও রীতিবদ্ধভাবে প্রকাশ পাবে। তবে বিপদ হচ্ছে এই যে তোমাদের দেশী চলচ্চিত্র কখনো খুব বাস্তব, কখনো অত্যন্ত রীতিবদ্ধ। হয় সবটাই বাস্তব করতে হবে—ইউরোপের মতো—নয় সবটাই সরল ঢঙে বাঁধতে হবে, এদেশের ঐতিহ্যের রীতিতে। দুইয়ের সংমিশ্রণ বড় চোখে লাগে।

'সিনেমা এসেছে ইউরোপ থেকে, কাজেই তার ইউরোপীয় বাস্তব-ভাবটা এদেশে অনেক জায়গায় চেপে বসেছে। ইউরোপের মধ্যবিত্ত লোক শিল্পে বাস্তবের হুবহু নকল চায়। কোনো ছবিতে যদি এমন কিছু আঁকা থাকে যা সে কখনো দেখেনি বা জানে না, তাহলে সে বিমুখ। তোমাদের দেশের আঁকা ছবিতে—রাজপুত ছবি থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত—সবটাই কাল্পনিক রূপ, বাস্তবকে তাতে অনেক বাঁকিয়ে চুরিয়ে শিল্পের রূপ দেওয়া হয়েছে। চোখে যা দেখি তার হুবহু নকল নেই। কেবল তার অন্তর্নিহিত সুরটা আছে। তবু এদেশের লোক বহু শতাব্দী ধরে তাকেই মেনে নিয়েছে। এটা কত বড় গুণ তা বলা যায় না। মনে হয় তোমাদের সিনেমাতেও বোধহয় আঁকা ছবির ঐ কাল্পনিক রূপটা এলেই ভালো হবে। ইউরোপের মরীচিকার পিছনে ছুটে কোনো লাভ হবে না। আমি এ সমস্যার কিছুই এখনো বুঝিনি, তবু মনে হয় তোমাদের অন্যান্য শিল্পের যেটা চরিত্র সেটাই সিনেমায় আসা দরকার।'

আমাদের দেশের সিনেমা সম্বন্ধে রেনোয়া-র গভীর চিন্তার মধ্যে ভবিষ্যতে যথার্থ ভারতীয় চলচ্চিত্রের কি রূপ হবে তার ইঙ্গিত মেলে। ই. বি. হ্যাভেল্ বিদেশীর নকল থেকে ভারতীয়তার দিকে এদেশী চিত্রকলার মোড় ফেরাতে একদিন সাহায্য করেছিলেন। দেশীয় ঐতিহ্য ও চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেনোয়া হয়তো বা সিনেমার ক্ষেত্রে যথার্থ ভারতীয়তার বীজ বপন করে গেলেন। চলচ্চিত্রে সেই ভারতীয় জীবনকে আমরা কবে যথার্থভাবে দেখব?

সমালোচক হিসেবে মনে করি 'দি রিভার' ছবির মূল্য রেনোয়া-র শ্রেষ্ঠ স্তরে নাও উঠতে পারে—তার কারণ আগেই বলেছি—কিন্তু তবু হয়তো বিদেশীর হাতে বাঙলাদেশের এমন একটা চেহারা পর্দায় ধরা দেবে যেটা বাংলা সিনেমা আজ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি। এটা যেমন আমাদের অপমান, তেমনি সৌভাগ্য হতে পারে। অন্তত আরো কিছু লোক দেখতে পাবে যে বাংলা সিনেমা ইচ্ছা করলে কি হতে পারে এবং সত্যি সত্যি কি হচ্ছে। একজন পরিচালকও যদি বুঝতে পারেন যে রেনোয়া যা করেছেন সেটা কেবল যন্ত্রপাতির টেকনিক দিয়ে সৃষ্টি নয়, গভীর অনুভূতি ও উচ্চ সংস্কৃতির সৃষ্টি; আমাদের ছবিতে আমাদের দেশীয় জীবনকেই জানতে আর জানাতে হবে, তাহলেই তাঁর এদেশে আসা সার্থক।

ভারতবর্ষে, চলচ্চিত্র শিল্প যেখানে অজ্ঞানতার অতল গহ্বরে পড়ে রয়েছে, সেখানেই একজন মহৎ শিল্পীর আসা প্রয়োজন ছিল। 'দি রিভার'-এর বিদেশী প্রযোজক কোম্পানীর যতই ঔদ্ধত্য থাকুক না কেন, বিদেশীর এদেশে অভিযান সম্বন্ধে আমরা যে রায়ই দিই না কেন, ফিল্ম তুলতে রেনোয়া-র এদেশে আসা একটা স্মরণীয় ঘটনা। এই সংস্পর্শের পূর্ণ সুযোগ আমরা গ্রহণ করলাম না, তবু তার কিছু ফল একদিন আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

বিবিধ প্রসঙ্গে রেনোয়া

উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' সম্পর্কে : এ ছবিতে উদয়শঙ্করের অসামান্য প্রতিভা সর্বত্র জ্বলজ্বল করছে...কিন্তু তিনি নিজেকে দেখাতে বড় বেশি ব্যস্ত... শিল্পীর আরো বিনয় থাকা উচিত।

বাংলা স্টুডিও সম্পর্কে : ফ্রান্সে এক কালে আমরাও এ রকম ছোট স্টুডিও, সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেছি। সেটাই ছিল ফরাসী চলচ্চিত্রে স্বর্ণ-যুগ। ফিল্মে শাদা কালো কাজের পক্ষে এ ধরনের স্টুডিও মোটেই মন্দ নয়। চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্র যত জটিল হয়েছে শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র তত অগ্রসর হয়নি, বরঞ্চ উল্টো ফল হয়েছে। দুর্গতির মধ্যেই বোধ করি পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালো চলচ্চিত্রের সৃষ্টি, আরামের মধ্যে নয়।

অলিভিয়ার-এর 'হ্যামলেট' সম্পর্কে : খুব উঁচু জায়গায় উঠে নিচের দিকে তাকালে মাথা তো ঘুরবেই—তার সঙ্গে শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট'-এর কি সম্পর্ক?

চ্যাপলিন সম্পর্কে : চ্যাপলিনের বিষয়ে আর কি বলব? তিনি সিনেমার গুরু। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।

ব্যবসায়িক সিদ্ধির নামে বাংলা চলচ্চিত্রে নানাবিধ অনাচার চলে আসছে। উৎসাহী কোনো ব্যক্তি যখন তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন তখন সিনেমাকার বলেন ব্যবসার খাতিরেই তাঁকে রুচির বিকার সইতে হয়। বলা বাহুল্য সিনেমা একাধারে ব্যবসা এবং শিল্পকলা, শূন্য পকেট নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাধা নেই, কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্য ছাড়া সিনেমা টেকে না। এমন কি সরকার স্বয়ং যদি সিনেমাশিল্পের পরিচালনা করেন তবুও তার প্রতিদানে অর্থের আমদানি চাই, কেননা অর্থ এমন বস্তু যার শেষ আছে। কিন্তু শুধু ব্যবসায়ের প্রশ্ন তুলে বাংলা সিনেমার বিরুদ্ধে আর সমস্ত অভিযোগের মুখ যখন বন্ধ করা হয়, তখন দেখা দরকার নিছক ব্যবসায়িক বিচারে তাহলে বাংলা সিনেমার অবস্থা কি রকম, কি ভাবে ছবি তৈরির টাকা আসে, আর তার পরে ছবি তোলা হলে সে ছবির পরিবেশন ও প্রদর্শন এবং অবশেষে অর্থের পুনরুদ্ধার ও লাভের হিসাব পর্যন্ত বাংলা ছবির চাকা কেমন করে ঘোরে।

প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক ও দর্শক এই নিয়ে সিনেমার ব্যবসায়। এর মধ্যে প্রথম স্থান হচ্ছে প্রযোজকের, কেননা তাঁরই টাকায় বিক্রয়যোগ্য যে জিনিস তৈরি হয় তার বিক্রয়লব্ধ অর্থের মধ্য থেকে লাভের ভাগ পান পরিবেশক ও প্রদর্শক। প্রযোজকের পরই দর্শকের স্থান, দর্শকের সহযোগিতার উপরেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের বনিয়াদ। মধ্যস্থ যাঁরা, তাঁরা কেবল যোগাযোগ স্থাপন করেই লাভের অংশীদার। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রযোজকের অবস্থার উপরই সমগ্র সিনেমা-ব্যবসায়ের একান্ত নির্ভর। সিনেমা-ব্যবসায়ের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই তাই প্রযোজকের অবস্থা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যে বাঙলা দেশে প্রতি বছরে গড়পড়তা যথেষ্ট ছবি তৈরি হলেও স্থায়ী প্রযোজক কোম্পানির সংখ্যা অত্যন্ত কম। বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের মতে ১৯৪৯ সালে সাতচল্লিশটি ছবি রিলিজ হয়েছিল।

তার মধ্যে চল্লিশটির ক্ষেত্রে তাঁরা প্রযোজক কোম্পানির নাম প্রকাশ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে এই চল্লিশটি ছবি প্রযোজনা করেছেন পঁয়ত্রিশটি কোম্পানি। তার মধ্যে একটির বেশি ছবি তৈরি করেছেন মাত্র চারটি কোম্পানি। ১৯৪৮ সালে একাধিক ছবি তৈরি-করা প্রযোজক কোম্পানির সংখ্যা ছিল দুই। '৪৯ সালে হিন্দী-বাংলা মিলিয়ে কলকাতায় চৌত্রিশটি সম্পূর্ণ নতুন প্রযোজক কোম্পানি সিনেমা ব্যবসায়ে নেমেছেন। বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের ইংরিজি মুখপত্র বি. এম. পি. এ. জানুয়ারী ১৯৫০-এর সংখ্যাতে প্রকাশিত এই হিসাব থেকে দেখা যাবে যে বাংলা ছবির অধিকাংশ প্রযোজকেরাই স্থায়ী সিনেমা ব্যবসায়ী নন। পাঁচ ছয়টি কোম্পানি বাদে আর সকলেই ইংরিজিতে যাকে বলে 'এ্যাডভেঞ্চারার'। যুদ্ধের বাজারে টাকা করে যুদ্ধের শেষে তাঁরা সিনেমা-ব্যবসায়ে হাত দিয়েছেন এবং অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ হয়তো আগে ছিলেন তেলের ব্যবসায়ী, সিনেমায় ধাক্কা খেয়ে এখন লেগেছেন বাড়ির ব্যবসায়ে। ফলে প্রযোজক মহলের মতামতের জোর নেই, কেননা নানা ধরনের লোকের এই রকম আকস্মিক ভিড়ে কোনো বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নয়। প্রযোজকের স্বার্থের দিকে কেউ নজর দেন না, যে যার সাময়িক স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। দর্শকের রুচিকে বোঝবার ক্ষমতাও নেই, কেননা সে অবকাশ তাঁদের জোটে না। ধর্মশালায় অতিথির মতো তাঁরা দুদিনের বাসিন্দা, বাড়ির ছাত যদি একমাস পরে ভেঙে পড়ার মতো হয় তাতেও দুশ্চিন্তা নেই : দুদিন বাদে অন্যত্র উঠে যাওয়ার চিন্তায় মোটামুটি তাঁরা নির্ভয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রযোজকের মধ্যে যোগাযোগ নেই, মতের মিল নেই, চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে সমবেত চিন্তা নেই। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের মধ্যে বাগানবাড়িতে পিকনিক করার সুযোগ সুবিধা খুঁজতে যাঁরা আসেন তাঁদের সংখ্যাও যথেষ্ট। সে বাড়ি যতই পোড়ো হোক, কোনো কিছুই তাঁদের ফুর্তিতে বাদ সাধে না, বরং সুবিধা আছে।

অন্যান্য দেশে প্রযোজনার ব্যাপারে স্থায়ী ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। তাই আমেরিকায় 'সেণ্ট্রাল কাস্টিং ব্যুরো', কর্মচারীদের জোরালো ইউনিয়ান, গবেষণার নানা ব্যবস্থা, ইংলণ্ডে 'ফিল্ম এ্যাকাডেমি', 'বৃটিশ ফিল্ম ইন্‌স্টিট্যুট'-এর প্রতি প্রযোজকের সহযোগিতা। বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে টাকা ঢালা হয় যথেষ্ট কিন্তু সুস্পষ্ট কোনো নীতির অভাবে কোনো দিকেই উন্নতি নেই। গত বছরের সাতচল্লিশটি ছবিতে যদি ধরা যায় গড়পড়তা এক লাখ পঁচিশ হাজার করে খরচ হয়েছে তাহলে মোটমাট টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় চুয়ান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। গরিব দেশের পক্ষে এই টাকার অঙ্কটা মোটেই নগণ্য নয়। আয়তনের দিক থেকে প্রযোজনার ব্যবসায় বিরাট। তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র ব্যবসায় সংকট থেকে সংকটের দিকেই শুধু এগিয়ে চলেছে। নিজেদের অনৈক্য ও দুর্বলতার ফলে প্রযোজকের অবস্থা আজ নিতান্ত কাহিল, সিনেমা ব্যবসার অবস্থা তথৈবচ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন আগামী বৎসরে প্রতিটি সিনেমা

হাউসে দেখাবার মতো যথেষ্ট বাংলা ছবিই পাওয়া যাবে না। যে সংকট আজ প্রযোজককে গ্রাস করছে, পরিবেশক ও প্রদর্শকের পরমুখাপেক্ষী পঙ্গপালকেও তখন তার কবলে পড়তে হবে।

বর্তমান অবস্থায় বাঙলাদেশে একটি ছবি প্রযোজনার ইতিবৃত্ত একবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক। নিবারণবাবুর হয়তো হাজার আশি টাকা ব্যবসায়ে নিয়োগ করবার ক্ষমতা আছে। পরিচালক বা প্রযোজক হারাধনবাবু হয়তো আত্মীয়তা বা বন্ধুতার সূত্রে তাঁকে সিনেমা ব্যবসায়ে নামতে রাজী করালেন। কিছুদিন কাজ করে আরো টাকার জন্য পরিবেশকের দ্বারস্থ হতে হল। টাকার সুদ, তদুপরি লাভের শতকরা পনেরো-কুড়ি ভাগ কবুল করে টাকাটা আদায় হল, ছ'মাসের জায়গায় মোটমাট দশ মাসে ছবিটিও তৈরি হল। সে ছবি সেন্সার হতে গেল আরো কয়েক মাস। তার পর পরিবেশকের হাতে ছবি তুলে দিয়ে রিলিজের অপেক্ষা। এদিকে রিলিজ-হাউস খালি নেই। বছরখানেক আরো হয়তো চুপচাপ বসে থাকা। ইতিমধ্যে আর একখানি ছবির জন্য হারাধনবাবু হয়তো শাঁসালো আর একটি নিবারণবাবুকে নামিয়েছেন। এক নম্বর নিবারণবাবুর টাকা এদিকে এক বছর আটকা পড়ে আছে, ইনকাম ট্যাক্স-এর মোটা অংক ধার্য হয়েছে, অন্য ব্যবসায়ের তাগিদ প্রচুর. উপার্জনের পথ অনেকখানি বন্ধ। বছরখানেক পরে তো ছবি রিলিজ হল। নিবারণবাবু, বলা বাহুল্য, সিনেমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কাজেই তাঁর ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। মনে করলেন এবার বুঝি লাভের হিসাব কষা চলতে পারে। কিন্তু তাঁর দুর্দশার এখনো অনেক বাকি।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, নিবারণবাবুর ছবি—যার নাম হয়তো 'যুগের সমস্যা' বা 'কালের গতি' কিম্বা 'আঁখিজল'—একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও দর্শকের মনোমতো হয়েছে, তাহলে দেনা-পাওনা চুকিয়ে তাঁর ঘরে কি আসবে সেটা দেখা যাক। তাঁর খরচ হয়েছে মোটামুটি এই :

কাহিনী কেনার থেকে শুরু করে ছবির নেগেটিভ পর্যন্ত ...	১,০০,০০০৲
রিলিজের পূর্বেকার বিজ্ঞাপন-খরচ	১০,০০০৲
ছবির দশটি কপি করাতে	১৫,০০০৲
মোট :	১,২৫,০০০৲

ধরুন কলকাতায় তিনটি সিনেমাগৃহে তাঁর সেই ছবি প্রকাশ হল, চার সপ্তাহ তাঁর ছবি চলল। মোটামুটি টিকিট বিক্রি হল এক লক্ষ টাকার। কিন্তু প্রতি সিনেমাগৃহে 'প্রোটেকশান্ মানি' বা 'আত্মরক্ষার টাকা' হিসাবে প্রদর্শককে দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। টিকিট যাই বিক্রি হোক না হোক, সপ্তাহে পাঁচ হাজার টাকা প্রদর্শকের বাঁধা। সাত হাজারের কম বিক্রি হলে সে ছবি আর চালানো হবে না। চালাতে হলে নিজে ঘর থেকে টাকা দিয়ে অথবা নিজের লোক দিয়ে টিকিট কিনিয়ে চালাতে হবে। এটা হল 'হোল্ড ওভার ফিগার'।

এখানেই শেষ নয়। ভারত সরকার প্রচারকল্পে প্রতি সিনেমাগৃহে যে অবিকল চিত্র বা ডকুমেণ্টারি আর সংবাদচিত্র বা নিউজরীল দেখানো আবশ্যিক করেছেন তার ভাড়া বাবদ টাকা ঐ সিনেমাগৃহে চালু কাহিনীচিত্রের প্রযোজককে গুণতে হয়। ছবি তোলেন সরকার, দেখান সিনেমা-মালিকরা, আর খরচের অর্ধেক দিতে হয় প্রযোজককে। লাগে টাকা দেবে নিবারণ। গড়পড়তা সপ্তাহে আশি থেকে একশো টাকা এই বাবদে প্রযোজকের খরচ যায়।

আরো আছে। রিলিজের পরবর্তী অর্থাৎ ছবি সিনেমাগৃহে চালু থাকাকালীন সেই ছবির বিজ্ঞাপন খরচ। ইংরিজি ছবির বেলা এ-খরচটা সিনেমাগৃহের মালিকের, বাংলার বেলায় সে খরচের অর্ধেকের বেশি নিরীহ প্রযোজকের। বিনা বিজ্ঞাপনে সিনেমাগৃহের ব্যবসা নিশ্চয়ই চলে না, তবু সেই আবশ্যিক বিজ্ঞাপন খরচের অর্ধেক আদায় হয় প্রযোজকের ঝুলি থেকেই। নিয়ন-সাইন্, প্রাচীরচিত্র আর সিনেমাগৃহে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের খরচও প্রযোজকের। তিনটি সিনেমাগৃহের জন্য পাঁচ হাজার টাকার পাওনা মিটিয়ে তাহলে আমাদের 'আঁখিজল' ছবির এক লাখ পাঁচশো টাকার টিকিট বিক্রি থেকে অবশিষ্ট রইল প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। বিজ্ঞাপনের ভাগ গড়-পড়তা সপ্তাহে হাউস পিছু একশো টাকা অর্থাৎ চার সপ্তাহে মোট ধরুন বারোশো টাকা। তারপর ভারত সরকারের সংবাদচিত্রের দক্ষিণা মোটামুটি এক হাজার টাকা। বাকি থাকে মোটমাট আটত্রিশ হাজার টাকা।

ছবি যদি মন্দ হয় অর্থাৎ উপার্জনক্ষম না হয় তবে অন্তত মফস্বলে চালাবার খাতিরেও কলকাতার হাউসে ঘর থেকে টাকা ঢেলে পরমায়ু বাড়াবার প্রয়োজন ঘটে। কেননা মফস্বলের সিনেমাগৃহের মালিকেরা ছবি নেন কলকাতায় কোন ছবি কিরকম চলে তাই দেখে। তবে আগেই ধরে নিয়েছি নিবারণবাবুর 'আঁখিজল' মোটামুটি 'ভালো' ছবি, সুতরাং এও ধরে নিতে হবে যে নিবারণবাবুর বেলায় সে সমস্যার উদয় হল না। ছবি মফস্বলে গেল। কলকাতার উপকণ্ঠ, পাকিস্থান, পশ্চিম বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ইত্যাদি মিলিয়ে দেখানো হল ৫১৩টা সিনেমায়, বিক্রি হল দু' লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। উপরোক্ত সিনেমাগৃহগুলির প্রাপ্য টাকা কেটে বাকি রইল এক লাখ পঁচিশ হাজার। অর্থাৎ কলকাতার বিক্রি ধরে মোটমাট পাওয়া গেল প্রায় এক লাখ আশি হাজার টাকা। পরিবেশকের অংশে শতকরা পনেরো ভাগ কমিশন ও তাঁর টাকার জন্য সুদ বাদ দিয়ে প্রযোজকের হাতে এল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ছবি তুলতে খরচ হয়েছে সোয়া লক্ষ টাকা। অতএব লাভের অঙ্ক দাঁড়াল পঁচিশ হাজার টাকায়, শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ লাভ।

কিন্তু নিবারণবাবুর ছবিটি যে ভালো তা নিতান্ত বিনা কারণে আমরা ধরে নিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভালো বিক্রি হলে ছবির কি রকম আয় হয় সেটাই খতিয়ে দেখা। আসলে নিবারণবাবুর পক্ষে ভালো এবং বিক্রির যোগ্য ছবি তৈরি করা কঠিন, কেননা সিনেমার জ্ঞান তাঁর বিন্দুমাত্র নেই, এ বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ, উপযুক্ত

৭

কর-কবলে চলচ্চিত্র-শিল্প

নতুন ছবির শুভ-আরম্ভের দিনে ছবিঘরগুলির সামনে লোকের ভিড় দেখে যাঁরা ভাবেন—কি পয়সাই পিটছে ছবিওয়ালারা, তাঁরা ধারণাই করতে পারবেন না কি পর্বতপ্রমাণ করভার চলচ্চিত্রনির্মাতাদের বহন করতে হয়। চলচ্চিত্রনির্মাতাদের দুর্দশা বাইরের জাঁকজমকে একেবারে ঢাকা পড়ে যায় বলে লোকের মনে তাঁদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা বরাবর থেকে গেছে। চলচ্চিত্রের উপরে কত রকমের কর আজ পর্যন্ত ধার্য হয়েছে তার একটা হিসাব কষলেই এই ভুল ভাঙতে দেরি হবে না।

অন্য সব ব্যবসায়ের মতো চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের উপরেও সাধারণভাবে যেসব সরকারি কর ধার্য করা হয় তার তুলনায় চলচ্চিত্রের উপর বিশেষভাবে ধার্য করের পরিমাণ বহুগুণ বেশি। এই বিশেষ করগুলির বহর এবার দেখুন :

১। কাঁচা ফিল্মের উপর ফুট-প্রতি এক পয়সা হিসাবে আমদানি কর।

২। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় বড় যন্ত্রপাতির উপরে দামের শতকরা ১০্, ছোট যন্ত্রপাতির উপরে দামের শতকরা ৩০্ আমদানি কর।

৩। যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত অংশের উপর আমদানি কর।

৪। কার্বন, মেক-আপ্-এর সরঞ্জাম, কেমিক্যাল প্রভৃতির আমদানি কর।

৫। এসব জিনিসপত্র বিক্রয়ের উপর বিক্রয়কর। করের হার এক এক প্রদেশে এক এক রকম।

৬। বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারের কর।

৭। চলচ্চিত্র মজুত রাখার গুদামের উপর লাইসেন্স ফি।

৮। চলচ্চিত্র নির্মাণে আনুসঙ্গিক ব্যবহারের জল সরবরাহের জন্য কর।

৯। মিউনিসিপ্যালিটির ট্রেড-লাইসেন্স ফি।

১০। সিনেমাঘর খোলা রাখার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে দেয় লাইসেন্স ফি (শুধু বাঙলাদেশে)।

১১। ফিল্ম সম্পর্কিত পুস্তিকা বিক্রয়ের উপর বিক্রয় কর।

১২। বিজ্ঞাপনের উপরে ধার্য কর (কোথাও কোথাও ধার্য করা হয়)।

১৩। প্রতিটি শো অনুষ্ঠানের জন্য কর (কোথাও কোথাও ধার্য করা হয়)।

১৪। সেন্সর করার জন্য ফি।

১৫। 'অক্ট্রয়' কর (কোথাও কোথাও ধার্য করা হয়)।

১৬। পুলিশ লাইসেন্স ফি (বাঙলা-দেশের জন্য)।

১৭। ট্রাফিক পুলিশের জন্য খরচ (বাঙলাদেশে)।

১৮। ফিল্মের প্রতিটি পার্শেল আনার জন্য (শুধু মধ্যভারতে) আমদানি কর।

১৯। সরকার অনুমোদিত ছবির জন্য ভাড়া (প্রতি সপ্তাহে বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা এক থেকে দেড় ভাগ)।

২০। আমোদ কর (বিক্রীত অর্থের শতকরা ১২½ থেকে ৭৫ ভাগ)।

২১। ইনকাম ট্যাক্স।

২২। সুপার ট্যাক্স।

এখন হিসেব করলে দেখা যাবে আয়কর বাদ দিলে টিকিট বিক্রির মোট আয়ের শতকরা ষাট টাকাই কর হিসেবে চলে যায়। বাকি চল্লিশ টাকা থেকে আয়কর, সুপারট্যাক্স ইত্যাদি দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে সেটুকু নিয়েই চলচ্চিত্র-শিল্পকে টিকে থাকতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিও করতে হবে। আর দশটা শিল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্র-শিল্পকেও যে সরকারের তহবিলে কর দান করতে হবে তাতে কার আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু তাই বলে চলচ্চিত্রের উপর ধার্য দশরকমের কর, তদুপরি আমোদ কর হিসেবে কোথাও কোথাও মোট টাকার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দেওয়ার জুলুমও কি সইতে হবে?

পরিচালক বাছাই করার ক্ষমতা তিনি রাখেন না। সাধারণত ব্যবসায়িক দিক থেকে ভালো ছবি করেন তাঁরাই যাঁরা অভিজ্ঞ, স্থায়ী প্রযোজক। নিবারণবাবুদের ছবি সেদিক থেকে লোকসানই ঘটায়। ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, কিন্তু ছবির পর ছবি এই কথাই অনবরত প্রমাণ করে চলেছে। লোকসান মেটাবার আশা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে এক নম্বর নিবারণবাবু সিনেমার মহলও ত্যাগ করেন। নতুন করে কোমর বেঁধে নামেন দু'নম্বর নিবারণবাবু। তাঁরও অবস্থা শেষ পর্যন্ত পূর্বগামীর মতোই দাঁড়ায়। ফলে এই মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করাতে অন্য ধনীরা মোটেই উৎসাহ দেখান না। ছবি তোলা বন্ধ হয়, লোক ছাঁটাই শুরু হয়, সিনেমায় সংকট নিয়ে বিবিধ প্রবন্ধে পত্রিকাগুলি সরগরম হয়ে ওঠে।

এক নম্বর নিবারণবাবুর ছবি ভালো হলে তাঁর যে পরিমাণ লাভ হতে পারে দেখানো হয়েছে তার যথার্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহের কারণ ঘটা সম্ভব। ইতিমধ্যেই ছবি তৈরির খরচের অঙ্ক গড়পড়তা সোয়া লাখ থেকে এক লাখে নেমেছে, চেষ্টা চলছে পৌনে লাখে নামাবার। সঙ্গে সঙ্গে লাভের অঙ্কও সেই অনুপাতে নামবে নিশ্চয়ই। স্থায়ী প্রযোজকদের পক্ষে এই লাভের ভিত্তিতে ব্যবসা বজায় রাখা দুর্ঘট। কেন না কর্ম-চারীদের বেতন ইত্যাদি বাঁধা খরচ বাদ দিয়ে এই লাভ থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকে সে অতি সামান্য।

আবার বলা যাক সিনেমাব্যবসায়ের কেন্দ্র প্রযোজক। তিনি আছেন, তাই অন্যরাও আছেন। অথচ তাঁর তলিয়ে যাবার দিন আসন্ন। ছবি তৈরি যেদিন প্রায় বন্ধ হবে সেদিন পরিবেশক ও প্রদর্শকের অবস্থা কি দাঁড়াবে? এখনো বাঙলাদেশের মন এমন নয় যাতে বাংলা ছবি সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে হিন্দী ছবির জোরেই ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠতে পারে। শোনা যায় যে আগামী বছরেই প্রতি সিনেমাগৃহে দেখাবার উপযুক্ত সংখ্যায় বাংলা ছবি পাওয়া যাবে না। বাঙালী প্রযোজককে যদি উদ্ধার না করা যায় তবে বাংলা সিনেমা ব্যবসায়ের দুর্দিন ক্রমেই ঘোরতর হতে থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রযোজকের পক্ষে টিকে থাকার প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে ভালো ছবি তৈরি করা। ভালো ছবি অর্থে বহু ব্যয়সাপেক্ষ জমকালো ছবি নয়, গুরু গম্ভীর ছবিও নয়। ভালো বিষয়বস্তু ভালোভাবে ব্যবহৃত হলেই ছবি আনন্দদায়ক হতে পারে। লোকে গান শোনে, নাচ দেখে, মাসিক পত্রিকা ও ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে, কিন্তু আজ-কাল সিনেমা দেখে তার চেয়ে বেশি, কারণ এ সবেরই উপাদান সিনেমায় উপস্থিত। বাংলা ছবিতে সংকট সৃষ্টি হবার প্রধান কারণ এই যে ছবি দেখার যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের মধ্যেও সামান্য অংশই বর্তমানে প্রচলিত ধরনের ছবির অনুরাগী। অর্থাৎ ব্যাপকভাবে বাঙালী সাধারণকে আনন্দ দেবার মতো ছবি বাংলায় হচ্ছে না। এমন কি 'দেবদাস', 'চণ্ডীদাস' প্রভৃতি ছবি কয়েক বছর আগেকার রুচিকে যেভাবে মেটাতে পেরেছিল আজকের ছবি আজকের রুচির দাবিকে সেভাবে মেটায়

না। কলকাতা শহরের জনসংখ্যা কম-বেশি ষাট লক্ষ। তার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ অন্তত বাঙালী। এই ত্রিশ লক্ষের মধ্যে পনেরো লক্ষ যদি শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও নিঃস্ব পথচারী বলে ধরা হয়, পাঁচ লক্ষ যদি সিনেমা-বিমুখ বলে মনে করি, তবুও অন্তত দশ লক্ষ লোক এই কলকাতা শহরে আছেন যাঁরা বাংলা ছবির দর্শক হতে পারেন। অথচ এর অতি সামান্য অংশই বর্তমানে বাংলা ছবির বিষয়ে উৎসাহী, তা না হলে প্রযোজকের এই দুর্গতির উদ্ভব হবে কেন!

সুতরাং এক অর্থে বলা চলে লোকের রুচি মেটাতে গিয়ে নয়, না মেটাবার ফলেই বাংলা ছবি মন্দ হচ্ছে। বাংলা চলচ্চিত্রে রুচির যে ব্যভিচার আমরা দেখতে পাই তার দায়িত্ব যদি জনসাধারণেরই হত, তবে বিক্রির পরিমাণ এত মর্মান্তিকভাবে কম হত না নিশ্চয়ই। অর্থনৈতিক দুর্গতিতে সাধারণের পক্ষে সিনেমাগমন বাড়ে কি কমে তা বলা কঠিন। অনেকের মতে বাড়ে। সুতরাং প্রযোজকের সমস্যা যত কঠিন, যত তীব্র, ভালো এবং সাধারণের রুচি-মাফিক ছবি তৈরি করার প্রয়োজন তত বেশি। হয়তো বা এই সংকটের মধ্যেই বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ জন্ম নিতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত চিন্তাধারার বিকাশ চাই।

কিন্তু সে উৎকর্ষের প্রশ্ন ছাড়াও ব্যবসায়িক বন্দোবস্তের দিক থেকেই এই সংকটের নিরসনের নানা উপায় রয়েছে। প্রযোজকের বিপদের বোঝা লাঘব করা যে অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রযোজকের পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ তাঁর কাছে যতই ফিরে যায় ততই মঙ্গল। ছবিতে টাকা খাটিয়ে প্রযোজক যতটা ঝুঁকি নিতে বাধ্য হন, তার কিছু অংশ প্রদর্শকের উপরও চাপানো উচিত। ছবি ভালো হোক, মন্দ হোক, লাভ করুক কি লোকসান দিক, প্রদর্শক তাঁর বাঁধা বরাদ্দের টাকা ভোগ করবেন এ অতি অন্যায় ব্যবস্থা। দুইয়েরই নির্ভর দর্শকের উপরে। প্রযোজকের যদি 'আত্মরক্ষার' কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে প্রদর্শকের 'প্রোটেকশান মানি'তে কি অধিকার, কি অধিকার 'হোল্ড-ওভার ফিগার'-এর দাবিতে? সরকারের সঙ্গে সর্ত অনুযায়ী সিনেমাগৃহের মালিককে সরকারী সংবাদচিত্র দেখাতে হয়। তার আর্থিক দায়িত্ব কোন যুক্তিতে প্রযোজকের ঘাড়ে চাপবে? বিজ্ঞাপন বাদ দিলে কি সিনেমাগৃহে ভিড় বেশি হয় যে প্রদর্শক সে খরচের অর্ধেকও আদায় করবেন প্রযোজকের পকেট থেকে?

এই সকল অন্যায় দাবি দূর করে প্রযোজককে বাঁচাতে পারেন এক পক্ষে সরকার আর এক পক্ষে বি. এম. পি. এ.। সরকার আইন জারি করতে পারেন। বি. এম. পি. এ. অন্যায়কারীকে একঘরে করতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকার কেবল ট্যাক্স আদায় করেই খালাস—আমদানি শুল্ক, প্রমোদকর বাবদ যে অজস্র টাকা আদায় হয় সে টাকা সিনেমার উন্নতিতে না খাটিয়ে সরকার অন্য খাতের ঘাটতি ভরাতে ব্যস্ত। ১৯৪৫-৪৬ সালে বর্তমান পশ্চিম বাঙলা এলাকা থেকেই চলচ্চিত্রে বিবিধ কর হিসাবে সরকার পেয়েছিলেন ৭৫,০৬,৬০০৲ টাকা। এই টাকার সামান্য

অংশও সিনেমার জন্য ব্যয় হয়নি। এদিকে কর্পোরেশনও ফায়ার ব্রিগেড ট্যাক্স, বিজনেস ট্যাক্স, লাইসেন্স ফী, ভোল্ট লাইসেন্স ফী আদায় করেন, এমন কি পুলিশের সাহায্যে শান্তিরক্ষার জন্যও সিনেমার বেলায় ট্যাক্স লাগে (ফুটবল খেলায় লাগে না)। ভারত সরকার অবশ্য ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি নিয়োগ করে এই সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু তার ফল কি দাঁড়াবে তা সরকারী অনুসন্ধানের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও জানেন না। সুতরাং আপাতত সরকারের কথা থাক।

বি. এম. পি. এ.-তে পরিবেশক ও প্রদর্শকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই সেখানেও প্রযোজকের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি কম। কোনো প্রদর্শক পাওনা মেটাতে গাফিলতি করলে বি. এম. পি. এ. তাকে তৎক্ষণাৎ একঘরে করে থাকেন, ফলে প্রদর্শকের স্বার্থ অটুট থাকে। কিন্তু প্রযোজকের প্রাপ্য টাকায় ভাগ বসানোর অন্যায় মনোবৃত্তি দূর করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রযোজকেরা যেহেতু একতাবদ্ধ নন, অস্থায়ী ধনিক বনিকদের সংখ্যাই তাঁদের শ্রেণীতে বেশি, তাই বি. এম. পি. এ.-তে তাঁদের শক্তিশালী হবার পক্ষে বাধা প্রচুর।

কিন্তু সরকারী হুকুম-নিয়মের অপেক্ষা না রেখে প্রদর্শকরা নিজেদের স্বার্থের জন্যই প্রযোজকের স্বার্থ বিষয়ে ব্যবসায়িকভাবে অবহিত হতে পারেন। কিন্তু যেহেতু ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি তাঁদের সামান্য, তাই ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ নিয়ে তাঁরা মোটেই বিব্রত নন। আসলে বাঙলার আগাগোড়া সিনেমামহল অনবরত ব্যবসায়ের দোহাই পাড়লেও সিনেমা ব্যবসায়ে বাঙলায় দক্ষ ব্যবসায়ী-মনোবৃত্তির দেখা পাওয়া যায় না। এখানে আছে শুধু হাত সাফাইয়ের চেষ্টা, যা পাওয়া যায় তা লুটে নেবার অব্যবসায়িক লোলুপতা। উৎকর্ষের বিচারে বাংলা ছবি মন্দ হচ্ছে। কিন্তু যাকে যথার্থ ব্যবসাবুদ্ধি বলে বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে সেটা আশ্চর্যরকম অনুপস্থিত।

বাঙলাদেশে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন

নবকেতনের 'অফসর' চিত্রের বিজ্ঞাপন : ২২শে আষাঢ় ১৩৫৭ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত :

"মিলনের মধুরতায়—চুম্বনের মাদকতায়—আলিঙ্গনের তীব্রতায়—যে প্রেম সার্থক হয়ে আছে বাস্তবের অনুভূতির মাঝে, আজ রূপালী পর্দার বুকে তাদেরই মিলন ও অভিসারের হুবহু প্রতিচ্ছবি—নবতর মাধুর্যে অভিব্যক্ত।

"বাঙলা-সেন্সারের কাঁচির স্পর্শমুক্ত প্রথম আদিরসাশ্রিত চিত্র-নাটক অফুরন্ত নৃত্যগীতাদি সম্ভারে পরিবেশিত অনন্যসাধারণ কৌতুক-চিত্র!"

ইঙ্গ-মার্কিন চলচ্চিত্র : ১৯৪৯

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

সত্যিকারের শিল্প হয়ে উঠতে গেলে চলচ্চিত্রে দুটো মূল জিনিস থাকা চাই। প্রথমত, শিল্পের নূতন মাধ্যম হিসাবে তার যে নিজস্ব ধর্ম আছে, আর্টের দিক থেকে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি ভালোভাবে ফোটা দরকার। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আমরা যে রুচিবোধ, মাত্রাজ্ঞান, সরলতা দেখতে পাই ছবিতেও তার সুষম সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যুগপৎ এ দুটি কষ্টি-পাথরে যাচাই হয়ে উতরেছে এমন ছবি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের কালেভদ্রে হয়। আজকাল আমেরিকান ছবির আঙ্গিক-উৎকর্ষের কথা সকলেই জানেন। ইংলণ্ডেও শোনা যায় চলচ্চিত্র-শিল্পে নবজাগরণ এসেছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট ছবির কথা ছেড়ে মোটামুটি ভালো ছবিও মাঝেসাঝে ছাড়া আমাদের চোখে পড়ে না।

এই কথাটা আরো পরিষ্কার হবে যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখানো কতকগুলি ছবি নিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করি। ১৯৪৯ সালের কথাই ধরা যাক। এ বছর কলকাতাতে নতুন ইংরিজি ছবি দেখানো হয়েছে প্রায় দুশোর বেশি। এগুলির মধ্যে বড় জোর খান কুড়ি গোটা ছবি আর ঐ রকম বিভিন্ন খণ্ড দৃশ্যের হয়তো নাম করা যেতে পারে যা দেখে যথার্থই খুশি হতে পারা গিয়েছিল, যা অন্তত কিছুদিনও মনে থাকবে। বাদ বাকি ছবিগুলি কেন যে তোলা হয়েছিল শিল্পের দিক থেকে দেখলে তার বিশেষ কোনোই কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। গত বছরের এই ভালো ছবিগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটা কথা আলোচনা করা যাক।

১৯৪৯ সালের গোড়ায় দেখা গেল ইংলণ্ডে তোলা ছবির জয়জয়কার। লরেন্স অলিভিয়ার-এর 'হ্যামলেট'-এর কথা তখনো লোকের মুখে মুখে ফিরছে। নানা ধরনের, নানা শ্রেণীর লোকের মনে চলচ্চিত্রে 'হ্যামলেট' গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। খুশি হননি কেবল শেক্সপীয়ারবিদ পণ্ডিতেরা। অলিভিয়ার-এর

'হ্যামলেট'-এর রস ও কলাগুণ তাঁরা অন্ধের মতো উপেক্ষা করেছেন। চলচ্চিত্রে অলিভিয়ার কোথায় নাটকের ব্যাখ্যায় মূল রচনার পাঠ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয়েছেন, তাই নিয়ে পণ্ডিতেরা রণং দেহি, রণং দেহি বলে সোরগোল তুলেছিলেন। সে যাই হোক 'হ্যামলেট' যে বিলিতি ছবির ইতিহাসে একটা বিরাট কীর্তি, সেকথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

'হ্যামলেট' দেখানোর কিছুদিনের মধ্যেই নাম করবার মতো আরো তিনটি ইংলণ্ডের ছবি এসেছিল। তিনটিই সেই জাতের ছবি যার উদ্দেশ্য টাকা রোজগার ছাড়াও দুনিয়ার বাজারে ইংলণ্ডে তোলা ছবির কদর বাড়ানো। এর মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় ডেভিড লীন-এর 'অলিভার টুইস্ট'। মাঝে মাঝে কতকগুলি জায়গায় ছবিটি এত উৎকৃষ্ট, এত রস-ঘন যে পরে হয়তো চলচ্চিত্র-শিল্পের পাঠ্য গ্রন্থে সেগুলির সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যাবে। তবে সমগ্রভাবে দেখলে ছবিটি তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। 'অলিভার টুইস্ট'-এর আগে 'গ্রেট এক্সপেক্টেশান্স'-এ ডিকেন্স-এর আসল রূপটি লীন ধরতে পেরেছিলেন। উপন্যাসে ডিকেন্স আর যাই হন না কেন নিষ্প্রাণ নন। কিন্তু চলচ্চিত্রে লীন-এর হাতে সেই গল্পটিই আগাগোড়া কি রকম যেন নিস্তেজ, ঠাণ্ডা বলে মনে হয়েছে।

এই মিয়ানো ভাবটা হয়তো চার্লস ফ্রেণ্ড-এর 'স্কট অফ দি অ্যাণ্টার্টিক'-এ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। এই ছবির গতিও মেরু অভিযানের মতো ঢিমে-তালে বাঁধা। কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জিনিসটা এতে 'অলিভার টুইস্ট'-এর চেয়ে ঢের নিবিড়ভাবে ফুটেছে। এ ছবির টেকনিকালার ফোটোগ্রাফি আরো মনোরম করেছিল ছবিটিকে।

'রেড সুজ'-এর আরম্ভ হয় অতি সুন্দর। শেষ পর্যন্ত ছবিতে স্টেজের পিছনের ঘটনাগুলির দৃশ্যে অকৃত্রিম ভাবটা বেশ বজায় ছিল। এদিক থেকে ছবিটা প্রায় ডকুমেণ্টারির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে দেখলে এই ছবিকেও মেলো-ড্রামার বেশি কিছু বলা যায় না। 'রেড সুজ'-এর অন্তর্গত ব্যালে নাচ দৃশ্যের খুব সুখ্যাতি হয়েছিল চারদিকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, একমাত্র হেকরথ-এর দৃশ্যপট ছাড়া নাচের কোনো বিশেষত্ব ছিল না। মোটামুটি বলা চলে 'রেড সুজ'-এ যেসব রুচির ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, এতাবৎ পাওয়েল আর প্রেসবার্গার-এর কোনো ছবিতেই তা চোখে পড়েনি।

হলিউডে আজকাল মারামারি আর খুনোখুনি নিয়ে তোলা ছবির মরশুম পড়েছে। গত বছরের ভালো মার্কিন ছবির মধ্যে অনেকগুলিই এই জাতীয়। পরিচালকেরা এই ছবিগুলিতে অনেক কিছু নতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করছেন। মনে করুন হিচ্‌কক্‌-এর 'রোপ'। ছবিতে গল্প-বলার যে মামুলী রীতিটা এতদিন ধরে চলে আসছে হিচ্‌কক্‌ এই ছবিতে তা বেমালুম বদলে দিয়েছেন। এই পরিচালকের টেন-মিনিট-টেক (অর্থাৎ যাতে একটা পুরো রিল কোনো কাট্‌, ফেড-আউট-ডিসল্‌ভ্‌

ইত্যাদির সাহায্য না নিয়ে একেবারে তোলা হয়) সম্বন্ধে আজকে আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। তবে 'রোপ' সম্বন্ধে দুটো কথা এখানে বলা দরকার। 'রোপ' ছবিটি উপভোগ্য হওয়ার একটা বড় কারণ—কোনো ছেদ না দিয়ে সরাসরি পুরো কাহিনীটি পর্দার-গায়ে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ চলচ্চিত্রের গতি জিনিসটাকেও হিচ্‌কক্‌ বাদ দেননি। তবে সে গতি অবাধ না হয়ে ছোট একটা ফ্ল্যাটের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা রয়েছে, এইমাত্র।

ছবিতে উত্তেজনা সৃষ্টি যে শুধু হিচ্‌কক্‌-এর একচেটে নয়, তা প্রমাণ করেছেন উইলিয়াম কীলি তাঁর 'দি স্ট্রীট উইথ নো নেম' ছবিতে। আধা ডকুমেন্টারি ধাঁচে তোলা আঁটসাঁট এই ছবিটি পরিচালনা-কৃতিত্বের এক অদ্ভুত নিদর্শন। অনেকে হয়তো বলবেন যে 'বুমেরাং' বা 'কল নর্থ সাইড ৭৭৭' ছবি দুটোর মতো এছবিতে অনুভূতির ছোঁয়াচ ছিল না। কিন্তু দর্শকের মনের উদ্বেগ কেমন করে শেষ অবধি জাগিয়ে রাখা যায় তার এমন নিপুণ দৃষ্টান্ত খুব কম ছবিতেই দেখা গেছে। এই জাতীয় এবং প্রায় এই ধরনের আর একটি ছবি হল রবার্ট সিয়োডমাক-এর 'ক্রাই অভ দি সিটি'। নিউইয়র্ক শহরে একজন পুলিশের লোক খুনীর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে কিভাবে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরল সেই কাহিনী দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, এমন ভাবে ধীরে ধীরে গল্পটি এগিয়েছে যে দর্শকেরা আগে থেকেই খুনী আসামী লোকটা কেমন, তার ঘর-সংসার, তার পরিবেশ কি ধরনের সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পান।

উইলিয়াম ডীটের্লে মনে হয় এবার জীবনীমূলক কাহিনী ছেড়ে রোমাঞ্চকর ছবি তোলার দিকে ভালোভাবে মন দিয়েছেন। গত বছরে তোলা তাঁর এই ধরনের ছবি 'অ্যাকিউজ্‌ড'। ছবির অভিনয় ভালো, পরিচালনাও সুন্দর কিন্তু আদালতের শেষ দৃশ্যটা ছবির উপভোগ্যতা অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছে।

অ্যানাটোল লিটভাক-এর 'সরি রঙ নাম্বার' ছবিটি গড়ে উঠেছে একটি বিপন্ন মেয়েকে কেন্দ্র করে। বেতার নাটক হিসাবে 'সরি রঙ নাম্বার' খুব নাম করেছিল। লিটভাক-এর এই নাটকটি ছবি করার একটা প্রধান কারণ বোধ হয় বিখ্যাত ফরাসী ছবি 'ল্য জুর স্য লেভ'-এর মার্কিন সংস্করণটির অসাধারণ জনপ্রিয়তা। লিটভাকই এই মার্কিন সংস্করণটি তৈরি করেন। সেই ছবির নায়কের মতো 'সরি রঙ নাম্বার'-এর নায়িকাও দেখা গেল একটা ঘরে বন্দী আছেন, পালাবার পথ নেই, আর আস্তে আস্তে মৃত্যু এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। অভিনব পরিচালনা আর শেষ দৃশ্যের বিদ্রূপ রসের গুণে মূল কাহিনীর অনেক দোষত্রুটি চাপা পড়ে গেছে।

খুন নিয়ে গত বছর আর একটি ভালো ছবি তৈরি হয়েছিল—'দি উইন্ডো'। পরিচালক টেট্‌স্‌লাফ কম খরচে, অচেনা অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে তুললেও ছবিটাকে অনেকখানি সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন।

ওয়েস্টার্ন ছবি বাদ দিলে হলিউডে-তোলা মারামারি আর খুনোখুনি ছবির

তালিকা পূর্ণ হতে পারে না। হাওয়ার্ড হক্স-এর 'রেড় রিভার' ঠিক সেই জাতের ছবি যা দেখলে ওয়েস্টার্ন ছবির উপর আবার আশা-ভরসা ফিরে আসে। হাজার হাজার গরু মোষ ক্ষেপে ছুটে চলেছে—ওয়েস্টার্ন ছবিতে এ ধরনের দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু 'রেড রিভার'-এ ঠিক এই দৃশ্যটি দেখলে মনে হয় এ সম্পূর্ণ নতুন, এ কখনো আগে দেখিনি। আজকের বিখ্যাত অভিনেতা মন্টগমারি ক্লিফট্ এই ছবিতেই প্রথম অভিনয় করেছিলেন। ক্লিফট্-এর মতোই নতুন অভিনেত্রী জোন ড্রু-র সঙ্গে এই ছবিতে দর্শকের পরিচয় হয়। ছবি অনেকখানি এগোনোর পর মেয়েটির আবির্ভাব, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ছবির সমস্ত আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে পরিচালক জন হাস্টন-এর বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ বোধহয় এ যুগের মার্কিন ছবির ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। হাস্টন যুদ্ধের মধ্যেই উঁচুদরের পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার বলে নাম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার, তাঁর প্রতিভার আসল পরিচয় পাওয়া গেল 'কি লারগো' আর 'ট্রেজার অব সিয়েরা মাদ্রে' ছবি দুটিতে।

হাস্টন-এর পরিচালনার স্টাইলটি একেবারে নিজস্ব। 'গ্যাংস্টার' জাতীয় ছবির কড়া ভাব আর ইউরোপীয় ছবির চরিত্র বিশ্লেষণের ধারা—এই দুটি জিনিসই তাঁর করায়ত্ত, এই দুই গুণ মিলেই তাঁর স্টাইলকে বিশেষত্ব দিয়েছে। তাই দেখা যায় যে 'কি লারগো' আর 'সিয়েরা মাদ্রে' মূলত মারামারি খুনোখুনির ছবি হলেও হাস্টন-এর লেখা আর পরিচালনার গুণে মেলোড্রামার বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কিউবার বিদ্রোহ নিয়ে হাস্টন-এর গত বছরে তোলা 'উই ওয়ের স্ট্রেন্জারস' কিন্তু তাঁর আগের পর্যায়ে উঠতে পারেনি। দোষ বলতে হাস্টন-এর ভাবপ্রবণতার কথা মনে আসে। আমেরিকান বলেই বোধহয় হাস্টন এই দোষটা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু যেদিন তা পারবেন সেদিন হাস্টন আমাদের যুগের কয়েকজন প্রকৃত বিরাট ফিল্ম স্রষ্টাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হবেন।

'কি লারগো'-র প্রধান অভিনেতা এডওয়ার্ড জি রবিনসনকে নিয়ে জোসেফ ম্যানকে-উইজ 'হাউস অভ স্ট্রেন্জারস্' তোলেন। ছবিটি মোটামুটি ভালোই কিন্তু আরো ভালো হতে পারত যদি কমিক আর সিরিয়াসনেসের মধ্যে ভারসাম্যতা বজায় থাকত।

সমস্যামূলক ছবি তোলার রেওয়াজ যে হলিউডে একেবারে নেই তা বলা ভুল হবে। গত বছর ভালো ছবিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই শ্রেণীতে পড়ে। এর মধ্যে যে ছবিটিকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি হৈচৈ হয়েছিল তা হল 'স্নেক পিট'। বিকৃত মস্তিষ্ক চরিত্র আর পাগলা গারদ নিয়ে তোলা লিটভাক-এর এই ছবিতে বিষয়-বস্তুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু ছবি হিসাবে এর অসামান্যতা কেউই অস্বীকার করেননি। গত বছরের ভেনিস ইণ্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভাল-এ এই ছবির নায়িকা অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যাণ্ড সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে গণ্য হয়েছিলেন।

মার্সি কিলিং বা দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধির কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে মেরে ফেলা উচিত কিনা এই নিয়ে এখন চারদিকে তর্ক-বিতর্ক চলেছে। মাইকেল গর্ডন 'লিভ টুডে ফর টুমরো' ছবিতে সোজাসুজি কোনো পক্ষ না নিয়ে দুদিকের বক্তব্যই পেশ করবার চেষ্টা করেছেন। আদালতের শেষ দৃশ্যে পোঁছানো অবধি ছবিটি এমনভাবে দর্শক-মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে যা ইদানীং হলিউড থেকে আমদানি খুব কম ছবিই পেরেছে।

শেষ পর্যন্ত এই আদালতের দৃশ্য টেনে আনার ফলেই আরো একটি ভালো ছবি 'জনি বেলিন্ডা'-র আকর্ষণও অনেকখানি কমে গেছে। পরিচালক জাঁ মিলেনস্কো-র সব চেয়ে বড় বাহাদুরী হল যে মূক বধির বালিকার এই কাহিনীতে একমাত্র মেলোড্রামার অংশটা ছাড়া কোনো জায়গাতেই তিনি বাঁধা গৎ-এর ফাঁদে পা দেননি। সুপরিচালনা, অপূর্ব অভিনয়, মনোরম পরিবেশ মিলে 'জনি বেলিন্ডা' আশ্চর্য উপভোগ্য হয়েছিল।

কিছুদিন আগে বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'টাইম' ও 'লাইফ' বলেন যে আমেরিকায় খেলাধুলো নিয়ে যে জুয়ো চলে তার মধ্যে সব চেয়ে বিরাট জুয়োর ব্যবসা বক্সিংকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শুলবার্গ-ও তাঁর বই 'দি হার্ডার দে ফল্'-এ দেখিয়েছেন যে এই জুয়াড়ীরা কেমন করে টাকা রোজগারের জন্য মুষ্টিযোদ্ধাদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করে। জোসেফ মনকিওর মার্চ-এর কবিতা অবলম্বনে রবার্ট ওয়াইজ পরিচালিত 'দি সেট-আপ' ছবিটি এক হেভী-ওয়েট বক্সারের জীবনের আশী মিনিটের মর্মন্তুদ কাহিনী। শুধু মুষ্টিযুদ্ধ আর বক্সিং রিঙ-এর চারপাশের দর্শককে নিয়ে তোলা এই ছবিতে মুষ্টিযুদ্ধের ভয়াবহ হৃদয়হীনতা যেমন গভীর-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, আজ অবধি কোনো ছবিতেই তা দেখা যায়নি।

সমস্যামূলক ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি বোধহয় 'দি হোম অভ দি ব্রেভ'। কারণ এ ছবিতে বর্তমান আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড বড় সামাজিক প্রশ্ন — নিগ্রো-সমস্যার রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। ছবির প্রধান চরিত্র একটি নিগ্রো সৈনিকের ভূমিকায় জেমস এডওয়ার্ডস-এর অভিনয় অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। নিগ্রো-সমস্যার সমাধান না দিলেও ছবিটি যে উপভোগ্য হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ বিখ্যাত 'চ্যাম্পিয়ান' ছবির প্রযোজক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার স্ট্যানলি ক্র্যামার, মার্ক রোবসন ও কার্ল ফোরম্যান 'হোম অভ দি ব্রেভ' ছবিটি তুলেছিলেন।

আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করব আর দুটি বিলিতী ছবির কথা বলে। ডেভিড লীন কিন্তু 'অলিভার টুইস্ট'-এর চেয়ে আরো হতাশ করেছেন তাঁর 'দি প্যাসোনেট ফ্রেন্ডস্', ছবিতে। ছবিটি কোথাও জমেনি আর লীন-এর ছবিতে আমরা যে সরলতা আর মাধুর্য এতদিন দেখে এসেছি এ ছবিতে তার নিতান্ত অভাব।

গত বছরে ইংলণ্ডে তোলা ছবির ইজ্জত রেখেছে বিখ্যাত পরিচালক ক্যারল

রীড-এর 'দি ফলেন আইডল'। গ্র্যাহাম গ্রীন-এর লেখা ছোট গল্প নিয়ে তোলা এই ছবিটিতে ক্যারল রীড-এর প্রতিভার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পেয়েছি। অভিনয়, চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা সব দিক থেকেই 'দি ফলেন আইডল' প্রথম শ্রেণীর। এ ধরনের ছবি দেখলে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা হয়।

হলিউড ও ইউরোপীয় চলচ্চিত্র

১৯৪৬ সালে নিউইয়র্ক-এর সমালোচকেরা সে বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের বিচারে একটি মাত্র মার্কিন ছবিকে স্থান দিয়েছিলেন : 'দি বেস্ট ইয়ারস অভ আওয়ার লাইভ্‌স্‌' (উইলিয়াম ওয়াইলার)। নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ পত্রিকা এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন : 'নিউইয়র্ক-এর আঠারোজন সমালোচকের এই সম্মিলিত বিচার থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে ইউরোপীয় চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ আজ হলিউডের বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী—শিল্পের দিক থেকে তো বটেই, জনপ্রিয়তার দিক থেকেও হয়তো তার ভবিষ্যৎ হলিউডের পক্ষে ভয়াবহ।'

হলিউডের নাভিশ্বাস

'সময় বদলেছে, কিন্তু হলিউড বদলায়নি। হলিউডের বুদ্ধি দেউলে হয়ে গেছে। তার বর্তমান কেবলই অতীতের পুনরাবৃত্তি, একটি ছবি দেখলেই আরো একশোটি ছবির কথা মনে হতে থাকে। সাধারণ লোকের মন থেকে হলিউড এত দূরে সরে এসেছে যে তার সৃষ্টি নীরস হতে বাধ্য। বেশি বড়লোক হয়ে আরামের আবেশে হলিউডের বুদ্ধি ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই বৃটিশ ছবির জনপ্রিয়তায় আমি খুশি। বাইরের আঘাতেই হয়তো হলিউডের ঘুম একদিন ভাঙবে। বিদেশের প্রতিযোগিতা বহুদিন পূর্বেই তার প্রয়োজন ছিল। আজ হলিউডকে বৃটেনের শক্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কাল হয়তো ফ্রান্স, ইতালী কিংবা রাশিয়ার মোকাবেলা করতে হবে। নিজেকে বাঁচাতে হলে ছাড়তেই হবে তার বাঁধা গৎ। ছাঁচে ঢালা গল্প বাদ দিয়ে এমন গল্প খুঁজতে হবে যার মধ্যে প্রকৃত বাস্তব জীবনের স্বাদ আছে, বড় বক্তব্য আছে; বর্তমান জীবনের বিক্ষোভ যার মধ্যে আন্দোলিত।' **—স্যামুয়েল গোল্ডউইন**
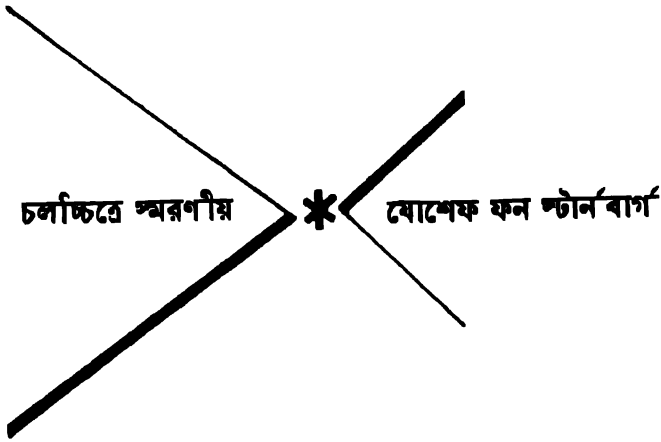
চলচ্চিত্রের গতানুগতিকতার ইতিহাসে যোশেফ্ ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগুলির স্থান অদ্ভুত স্বতন্ত্র। অধিকাংশ চিত্র-সমালোচক তাঁর ফিল্মগুলিকে গণ্যই করতে চান না। এসব যেন কম খরচায় তোলা, অখ্যাতভাবে প্রদর্শিত নগণ্য ছবি, কিম্বা ব্যবসাদারী কুরুচিতে ভরা, প্রচুর অর্থব্যয়ে তোলা ডি-মিল-জাতের ছবির মতো সমালোচকের দৃষ্টিক্ষেপেরও অযোগ্য! কক্তো যাঁদের শিল্পলোকের দশম-স্বর্গবাসী বলে বর্ণনা করেছেন, সিনেমার ইতিবৃত্তে কিম্বা রসালোচনার ক্ষেত্রে সেই সব বিশ্বকর্মাদের মধ্যে যাঁদের নাম করা হয় তাঁরা প্রায় সকলেই বিদেশী ডিরেক্টার। তাঁদের মধ্যে আছেন রুশদেশের আইসেনস্টাইন, পুদোভকিন, দভশেঙ্কো; ফ্রান্সের ক্লেয়ার, রেনোয়া, ভিগো; জার্মানীর পাব্স্ট্, মুর্নাউ, লাং। মার্কিন ডিরেক্টারদের মধ্যে নাম করা হয় স্ট্রোহাইম, ফোর্ড আর কাপ্রার।

কিন্তু দেখা যাবে ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগুলি মোটামুটিভাবে প্রায় উপেক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে জেকব্স্ লিখেছেন এসব হচ্ছে 'মর্মর মিনার লোকের' সৃষ্টি। রোথা বলেছেন স্টার্নবার্গ-এ বড় বেশি আত্মসচেতন ভাব। 'একের পর এক জঘন্য ছবির সমষ্টি, ক্রমে আরো জমকালো, আরো অসার,' তাঁর শেষদিককার ছবিগুলির সমালোচনা এই দুকথায় সেরে বার্ডিশ আর ব্রাসিলাখ স্টার্নবার্গকে প্রায় এড়িয়ে গেছেন। চলচ্চিত্রের আরো সব ছোটখাট ইতিবৃত্তের মধ্যেও ফন স্টার্নবার্গ-এর প্রতি এই রকম হতশ্রদ্ধা দেখা যাবে।

ইত্যাকার সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা স্মরণ রেখেও প্রশ্ন ওঠে যে মার্লিন ডিট্রিশের মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী চলচ্চিত্র শিল্পীকে সিনেমা জগতে পরিচিত করার বাইরেও স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগুলির স্বতন্ত্র কোনো মূল্য প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা! আমার বিশ্বাস নিশ্চয় আছে। কেননা এই সব ছবিতে এমন কিছু বিশেষ ফিল্মিক লক্ষণ এবং চিন্তাধারার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, ইউরোপের সাম্প্রতিক অর্থকরী সিনেমা আর

মার্কিন দেশের ফিল্মের নতুন পরীক্ষায় ক্রমেই যার প্রভাব বেশি অনুভূত হচ্ছে। মহাযুদ্ধের পরেকার ছবি দেখে ক্রমেই এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে খুব সম্ভব ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগুলি অচিরেই এমন ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করতে পারবে যার কোনো তুলনা নেই। ফিল্মসৃষ্টিতে তথা তাঁর শিল্পজীবনের ইতিহাসে যে সকল লক্ষণ দেখা যায় তা থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হয়।

সমসাময়িক ফরাসী চিত্রপরিচালক রবার্ট ব্রেসন-এর ছবিগুলিতে—তাঁর প্রথম ছবি ১৯৪৩ সালে মুক্তি পায়—সিনেমার যে আধুনিক ধারা লক্ষ্য করা যায়, যোশেফ ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মে এবং চিন্তাধারায় তার লক্ষণগুলির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ব্রেসন-এর মতে—ব্যাপক অর্থে ফিল্মকে গীতাত্মক হতে হবে—যেন ছন্দে বিধৃত কতিপয় দৃশ্যের সুবিন্যস্ত পারম্পর্য। তিনি ফিল্ম তৈরির এই নব্যরীতির নাম দিয়েছেন 'ল অফ দি টেকনিক অফ পোয়েট্রী।' তাঁর বিশ্বাস যে এই রীতির সমাদর আজ না হতে পারে, কিন্তু আগামী পঞ্চাশ কি একশো বছরের মধ্যে এই রীতিই হবে সর্বজন গ্রাহ্য। এই নব্যরীতির মধ্যে প্রধান কথাটা হচ্ছে এই যে এখানে গঠনসৌকর্যের দিক থেকে চলচ্চিত্ররূপের পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে যথোচিত মূল্য দেওয়া হয়েছে—আদ্যোপান্ত প্রত্যেকটি খণ্ডদৃশ্য ফিল্মের সামগ্রিক সত্তাকে যাতে পরিস্ফুট করতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। চলচ্চিত্রের যেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবয়ব তার গঠনসৌকর্যের প্রতি এরকম তীব্রভাবে সচেতন হওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে চলচ্চিত্রের একটা বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে উঠছে। ফলে ফিল্মের উপাদান এবং নির্মাণপদ্ধতির উপরে এতকাল সাহিত্যরীতির যে আধিপত্য ছিল ধীরে ধীরে তা কেটে যাচ্ছে। এতদিন ফিল্ম বলতে বোঝাত 'বিশিষ্ট নটনটীর সাহায্যে ভালো নাটকীয় অভিনয়।'

এই অভিনব ফিল্মিক রীতির প্রবর্তকদের মধ্যে ফ্রান্সের রবার্ট ব্রেসন-এর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেও এ রীতির অঙ্কুর কক্তোর ফিল্মগুলিতেও দেখা যাবে। তাছাড়া অর্সন ওয়েল্স-এর সঙ্গে সাম্প্রতিক কথাবার্তার বিবরণ পড়লে মনে হয় যুদ্ধের পরের যুগে পেশাদার পরিচালকদের মধ্যে আমেরিকায় তিনিই বোধ করি প্রথম এই বিশিষ্ট ফিল্মরূপ নিয়ে পরীক্ষা করবেন।

ফিল্মের এই রূপরীতির (ফর্মাল স্ট্রাকচার-এর) সঙ্গে ফিল্মের নাট্যরীতির সমীকরণ করা হচ্ছে না। অন্যান্য শিল্পকর্মে এই প্রভেদটা সুস্পষ্ট। নাটকের ইতিহাসে 'সুগঠিত' নাট্যরচনার যে যুগ গেছে তখনকার নাটকের মধ্যে এই রূপরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সিনেমা-শিল্পের রূপ নমনীয় বলে তার গঠনরীতিও ভিন্ন হতে বাধ্য। একই কাহিনী চলচ্চিত্রে যে রূপে প্রকাশ পায়, উপন্যাস বা রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিকে প্রকাশ করলে তার গঠনের রূপই যায় বদল হয়ে। এজন্যই আজ পর্যন্ত সিনেমা এবং সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ চলছে। এই দুই জিনিস আসলে দুই মেরুর তুল্য বিপরীত। অতি ব্যাপকভাবে এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করা হয় এবং ফিল্ম-আঙ্গিকের স্বরূপগত প্রয়োজনের কথা মনে রেখে যা করা দরকার স্বাভাবিকভাবে

ফিল্মকে সেভাবে তৈরি করা হয় না। ফলে যা আজকাল সৃষ্টি হয় তা অপসৃষ্টি মাত্র।

ইদানীং ফিল্ম সৃষ্টির এই নতুন ধারা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ১৯২৪ সালে যোশেফ ফন স্টার্নবার্গ নামে প্রাক্তন এক সহযোগী-ডিরেক্টর-এর নিজের টাকায় মাত্র চার হাজার আটশো ডলার ব্যয় করে তোলা 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্' নামক ছবিখানা দেখলেই ফিল্ম সৃষ্টির মধ্যে এই গঠনরীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দেখা যাবে একজন জাতশিল্পী নিজের ব্যক্তিত্বের অসীম শক্তিতে আস্থা রেখে কি রকম দ্বিধাশূন্যভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন।

এই ফিল্মের চরিত্রদের এমন বিরূপ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে যাতে সামাজিক অবস্থার কুফল সম্পর্কে গল্পের কাহিনী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে সহজেই আমাদের প্রত্যাশা জাগে। কেননা সামাজিক অবস্থার জন্যই চরিত্রগুলি এমন অবস্থা বিপাকে পড়েছে। অথচ ছবিতে দেখা যাবে বস্তির দৃশ্যাবলী চরিত্রের মানসিক গ্লানির দৃশ্যব্যঞ্জনা হিসাবে ছবির পশ্চাৎপটের স্থান পেয়েছে। এই মানসিক কুশ্রীতাকে দূর করার দায়িত্ব বাইরের কারো হাতে নেই। বাস্তব দৃশ্য এখানে মানসিক দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ ব্যঞ্জনা। অথচ ব্যঞ্জনার কথা না ধরলেও, বাস্তব দৃশ্যের যথার্থ আবেদনকেও অস্বীকার করা হয়নি। ছবির কাহিনীকে উভয় অর্থেই উপভোগ করা চলে, দর্শকের অভিরুচি আর মানসিক উৎকর্ষ অনুযায়ী যার যেভাবে খুশি গ্রহণ করতে পারে।

ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগুলির মধ্যে গঠনরীতি আর চিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ— দুই দিকেই 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্' ছবিখানি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ফন স্টার্নবার্গ-এর মতে এখানাই তাঁর একমাত্র ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সৃষ্ট ছবি। পরের সব ছবিই নাকি 'উদ্ধত প্রচেষ্টা' মাত্র! একথার যথার্থ অর্থ বুঝতে হলে তাঁর অন্যান্য ছবিগুলি বিশ্লেষণ করে এ ছবির সঙ্গে সেগুলির তুলনা প্রয়োজন। তাহলেই দেখা যাবে পার্থক্য কোথায়।

ছবিগুলি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই বলেছেন এগুলির একখানি হচ্ছে শিল্পকর্ম, বাকি আর সমস্তই হচ্ছে অর্থকরী। এগুলির মূল্য দিতে নিজেই তিনি অনিচ্ছুক। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি আরো যা বলেছেন উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন তাঁর কল্পনাকে মাত্র আর একখানি ছবিতে তিনি প্রায় রূপ দিতে পেরেছিলেন—সে ছবি হচ্ছে 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান্'।

দশ বছরের ব্যবধানে তোলা এই ছবি দুখানিতে বিস্তর পার্থক্য আছে। এ দুটির উপাদান এত স্বতন্ত্র যে মনে হয় দুজন সম্পূর্ণ আলাদা লোক পৃথিবী ও মানব-জীবনের প্রতি তাঁদের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছবি দুখানি সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যত এই পার্থক্যের মধ্যে যে সঙ্গতি আছে তা আবিষ্কার করতে হলে চিত্রপরিচালকের শিল্পরীতি প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। পরিণত মনের সৃষ্টি বলে এর মধ্যে একখানি

ছবি আর একটার চেয়ে নিশ্চয়ই ভিন্ন। কিন্তু উভয় ফিল্মের গঠনরীতির মধ্যে এমন একটা পারিপাট্য আছে যা স্টার্নবার্গ-এর অন্যান্য ছবিতে অনুপস্থিত। সেদিক দিয়ে দুখানি ফিল্মই একই রীতির সার্থক দৃষ্টান্ত। একমাত্র গঠনরীতির মধ্যেই এদের সাদৃশ্য আছে এ কথা মেনে নিয়ে ফিল্ম দুটির বিষয়বস্তু আলোচনা করলেই দেখা যাবে 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' ছবিখানি ডিরেক্টারের স্বকীয় বিচারে যোগ্যতায় দ্বিতীয় স্থান কেন পায়।

ছবি তোলার পর গণরুচির খাতিরে চিত্রের পরিবেশকগণ 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্'-এর মধ্যে কিছু কাটছাঁট করেছিলেন। সমালোচকের কাছে এ ছবি বেশ সমাদর পেলেও সাধারণ দর্শকের তবু সেটি যথেষ্ট সরস মনে হয়নি।

যাই হোক, প্রথম প্রচেষ্টায় ফন স্টার্নবার্গ-এর যেটুকু সুখ্যাতি হয়েছিল, তাতেই তিনি মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের ডিরেক্টরের কাজ পেলেন এবং 'দি এক্সকুইজিট্ সিনার' (১৯২৬) নামে একখানি বিদ্রূপাত্মক ছবি তুললেন। মুক্তির আগে ছবিখানা যখন পরীক্ষার জন্য দেখানো হল, দর্শকরা অনভিপ্রেত স্থানে যথারীতি হাস্য করলেন এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তির আগে ফিল রোজেনকে ছবিখানা পুনরায় তুলতে হল। এর পর স্টার্নবার্গ 'দি মাস্ক্ড্ ব্রাইড' বলে একখানা ছবিতে হাত দেন। মে মারে ছিলেন এ ছবির প্রধান অভিনেত্রী। ছবির দু' রীল পরিমাণ তোলার পর বিতৃষ্ণার সঙ্গে স্টার্নবার্গ ক্যামেরার মুখ ছাদের দিকে ফিরিয়ে রেখে সেট ত্যাগ করলেন।

এড্না পার্ভিয়ান্সকে পুনরায় ফিল্মে ফিরিয়ে আনার জন্য চার্লি চ্যাপলিন তখন একখানা ছবি তোলার কথা ভাবছিলেন। ফন স্টার্নবার্গ চ্যাপলিন-এর সঙ্গে এই ছবি পরিচালনা করার চুক্তি করলেন। 'দি সীগাল্' (১৯২৬) নামক এই ছবির কাহিনীকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে পরিচালকের যথেষ্ট খিটিমিটি হয়ে গেল। তোলার শেষে ছবিখানা পরীক্ষার জন্য দেখা হল একবার। দেখে চ্যাপলিন আর উচ্চবাচ্য করলেন না : ঐখানেই ইতি হল। সে ছবি প্রদর্শনের অনুমতি দিতে পারলেন না তিনি।

১৯২৬ সালে ফন স্টার্নবার্গ কোনো একটি ছবিকে সম্পূর্ণ করতে বা জনপ্রিয়ভাবে মুক্তিলাভ করাতে বার বার অকৃতকার্য হওয়ার ফলে তাঁর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তখন কোনো প্রযোজকই আর তাঁকে কোনো একটা ছবির পরিচালনার ভার দিতে সাহস করলেন না। 'সীগাল্'-এর পর প্যারামাউণ্টে সহকারী ডিরেক্টরের পদ ছাড়া আর কোনো কাজ তাঁর মিলল না।

কিছুদিন পরে ফ্র্যাঙ্ক লয়েডের 'চিল্ড্রেন্ অভ ডিভোর্স' (১৯২৭) ছবিখানার কিছু অংশ নতুন করে তোলার ভার পেলেন ফন স্টার্নবার্গ। এ কাজ এমন আশ্চর্য উৎরে গেল যে ছবির মালিক 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড' (১৯২৭) বলে বেন হেক্ট্ রচিত এক রোমাঞ্চকর দস্যুকাহিনীর ছবি তোলার কাজ দিতে চাইলেন ফন স্টার্নবার্গকে। নিতান্ত অর্থকরী এই ছবিখানা প্রভূত সমাদর লাভ করল দর্শকদের কাছে। ফলে

স্টার্নবার্গের বিভিন্ন চিত্রে মার্লিন ডিট্রিশ : (১) 'দি ব্লু এন্‌জেল'

(২) 'মরক্কো'
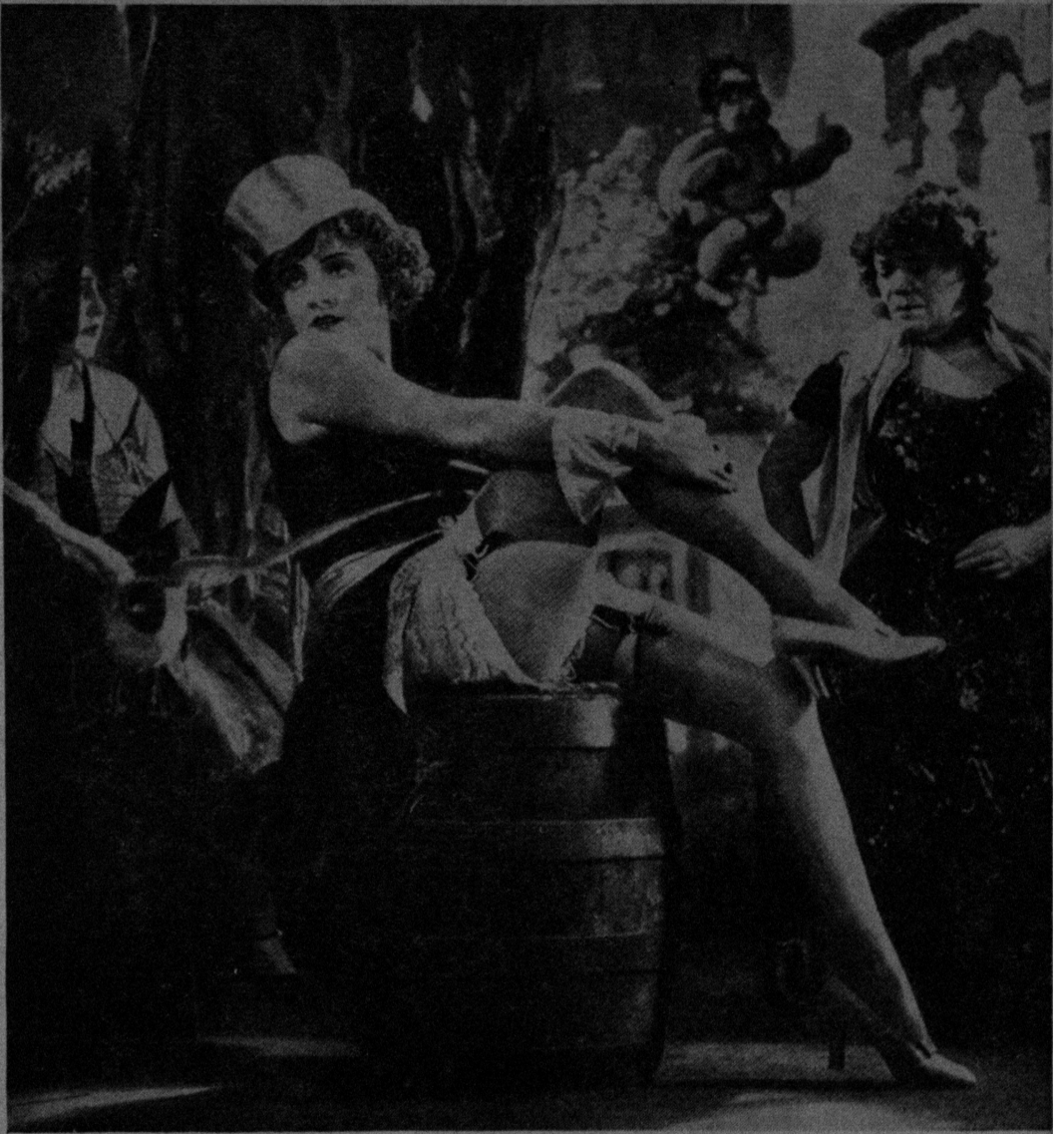
(৩) 'ব্লন্দ্‌ ভিনাস'

(৪) 'সাংহাই এক্‌স্‌প্রেস'

(৫) 'ডিজঅনার্ড'
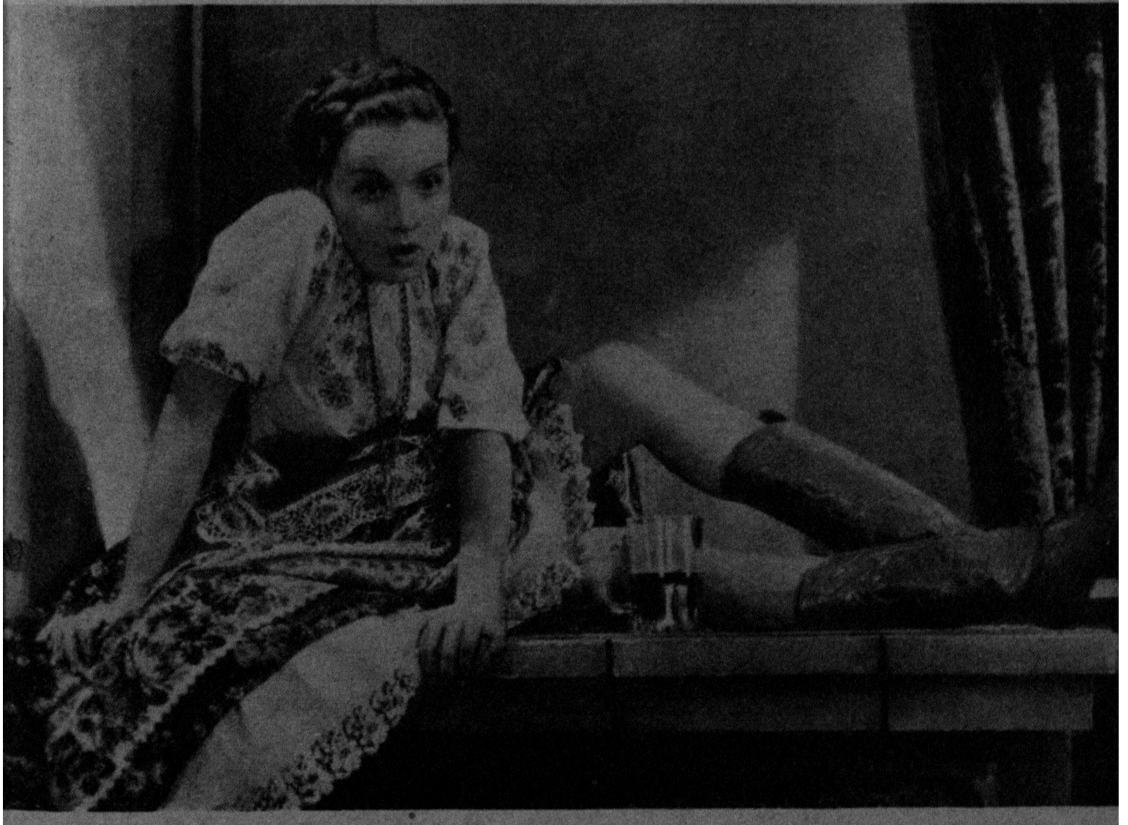
(৬) 'স্কারলেট এম্‌প্রেস'

(৭) 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান'

মার্লিন ডিট্রিশের এখনকার ছবি

অসামান্য জনপ্রিয় পরিচালক হিসাবে ফন স্টার্নবার্গ-এর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। হলিউডের বিচারে স্টার্নবার্গ এইবার যশের শিখরে আরোহণ করলেন। কিন্তু পরম কাম্য এই যশের অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁকে নিজের আদর্শ অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে হয়েছিল। 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্'-এর নির্মল আদর্শবাদ আর 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড'-এর পরিপক্ক ভাবালুতা—এই দুই বস্তুর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর, কিন্তু এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন ফন স্টার্নবার্গ নিজে।

ফন স্টার্নবার্গ যা করতে চেয়েছিলেন তা বোধহয় এই : তিনি বোধহয় এমন কোনো বিশেষত্ব আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন যা তাঁর নিজস্ব ছবি 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্' আর ষোলোআনা অর্থকরী ছবি 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড' উভয়ের মধ্যেই সমপরিমাণে উপস্থিত থাকবে। বলা বাহুল্য তাঁর এ চেষ্টা বিফল হয়নি। এই বিশেষত্বের কথা ভেবেই হয়তো বিরূপ আদর্শের সঙ্গে রফা করা তাঁর পক্ষে নেহাত অসম্ভব লাগেনি। তাঁর ছবির এই বিশেষত্ব হচ্ছে যৌন আবেদন। শারীর সত্তা (সেক্স) বিষয়ে স্টার্নবার্গ-এর অনুভূতি তীব্র ছিল। নারীত্বের এই আকর্ষণ তিনি ফিল্মে চমৎকার রূপ দিতে পারতেন; এবং এই বিশেষত্ব বজায় রেখে তিনি তাঁর আদর্শের সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যার একটা সামঞ্জস্য করতে পেরেছিলেন। যৌন আবেদনের এমন সব কাহিনী তিনি খুঁজতে লাগলেন যাতে তিনি নিজে এবং সাধারণ রুচির দর্শকরা সমান উৎসাহী হতে পারেন।

'আণ্ডারওয়ার্ল্ড'-এর ঠিক পরেই তিনি 'দি লাস্ট কমাণ্ড' (১৯২৭-২৮) ছবিটি তোলেন। কিন্তু এমিল জ্যানিংস্ এ ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলে অভিনেতার দাবির কাছে পরিচালকের গুণপনা খাটো থাকতে হল। 'আণ্ডার-ওয়ার্ল্ড'-এর মতো জনপ্রিয়তা লাভের আশায় এর পর তিনি 'দি ড্র্যাগ নেট' (১৯২৮) তোলেন। আর তার পরই তোলেন 'দি ডক্স্ অভ নিউ ইয়র্ক' (১৯২৮)—যে ছবি, বিশেষ করে তার সুনিপুণ দৃশ্যাবিন্যাসের জন্য, ফিল্ম-সমালোচকদের মতে তাঁর নির্বাক যুগের শ্রেষ্ঠ ছবি। এ ছবিতে বেটি কম্পসন আর অল্গা বাক্লানোভা নামে যে দুজন অভিনেত্রীকে তিনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলেন, তাঁরা উভয়েই আনকোরা নতুন। ইন্দ্রিয়াসক্ত হত্যাকারিণীর বেশে বাক্লানোভার অভিনয় থেকে দেখা গেল যে নারীচরিত্রের কতিপয় বিশেষত্ব ক্রমেই আশ্চর্য নিপুণভাবে এই ছবির পরিচালক চলচ্চিত্রে রূপ দিতে শিখেছেন। তা ছাড়া এছবিতে 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স্'-এর সামাজিক পরিবেশেও তিনি ফিরে যেতে পারলেন : কিন্তু দরিদ্র জীবনের দৃশ্যাবলী তিনি কোনো গভীর ভাবব্যঞ্জনা আনার জন্য ব্যবহার করলেন না, সিনেমার ছবিতে দৃশ্যসজ্জার মূল্যেই সেগুলির মূল্য।

ফন স্টার্নবার্গ-এর নির্বাক যুগের শেষ ছবি 'দি কেস অভ লিনা স্মিথ' (১৯২৯) যখন মুক্তিলাভ করল, ততদিনে সবাক ছবির যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে, কাজেই তাঁর এছবিকে বিশেষ আলোচনার যোগ্য বলেও মনে করলেন না কেউ। কিন্তু গঠনের

পারিপাট্যে আর কাহিনীর বিশিষ্টতায় এছবিখানি অতিশয় উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ফিল্মটির বিষয় ছিল যুদ্ধের-বিরোধিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার যুগে ভিয়েনার শাসকশ্রেণীর আত্মম্ভরিতা, নিয়মানুবর্তিতার প্রতি প্রাশিয়ানদের ভ্রান্ত নিষ্ঠা, আর এই ধরনের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট জগতে সামাজিক অধোগতির চিত্র এই ফিল্মে দেখানো হয়েছে। একথাই বরং বলা চলে যে অন্যান্য ছবির তুলনায় 'দি কেস অভ লিনা স্মিথ'-কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে কোনো সামাজিক সমস্যা নিয়ে এ ছবিখানাই তাঁর একমাত্র সত্যিকার প্রচেষ্টা।

দৃশ্যসজ্জার দিক দিয়ে এ সময় এমন অনেক কৌশল তিনি আবিষ্কার করেন, তাঁর পরবর্তী ছবিগুলিতেও যার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে। শুধু মাত্র আলোক নিয়ন্ত্রণ করে যাতে দৃশ্যে আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য দেখানো যায় সেজন্য তিনি এই সময়ে একখানা সেট আগাগোড়া শাদা রঙ করে নিয়েছিলেন। ফলে বিশেষ বিশেষ জায়গায় আলো নিক্ষেপ করে আর আসবাবপত্রের পিছনে অদৃশ্যভাবে আলো রেখে ক্যামেরায় প্রত্যেকটি দৃশ্যে আলো-ছায়ার বিচিত্র নক্সা দেখানো চলত। তা ছাড়া বিভিন্ন দৃশ্যের পুরোভাগে নটনটীর সিলুয়েট ছবি স্থাপন করে দেখানোর রীতিও তাঁরই আবিষ্কার। আজকাল এরীতি দেখতে আমরা যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু গ্রিফিথ-এর ক্লোজ-আপ্ দৃশ্য ব্যবহারের মতোই এজিনিস সেযুগে অভিনব ছিল।

দৃশ্যসম্পদে সিনেমা-শিল্পের কিরকম অগ্রগতি হয়েছে, 'দি কেস অভ লিনা স্মিথ'-এর এক একখানি খন্ড-দৃশ্য তারই দৃষ্টান্ত। কোনো এক লণ্ড্রির মধ্যে ঝোলানো চাদরের গায় ইস্ত্রিওয়ালীর চঞ্চল 'ছায়া' দেখিয়ে ফন স্টার্নবার্গ এই ছবির প্রথম দৃশ্যের উদ্ঘাটন করেন। ১৯৪৬ সালে তোলা 'লা বেল এ লা বেইত্' ছবিতে কক্তো পুনরায় এই দৃশ্যকৌশল অতি নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। ছবির আর এক দৃশ্যে নায়ক রাত্রিতে কয়েকতলা উঁচু এক ভাড়াটে ফ্ল্যাট-বাড়িতে এসেছে। বাড়ির সামনের দিকে অনেকগুলো ব্যালকনি আর সিঁড়ি। খোঁজ পেয়ে পুলিশও এসে হাজির হয়েছে। গোলমালে ঘুম ভেঙে উঠে বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা কেউ সিঁড়িতে, কেউ ব্যালকনিতে এসে জমায়েৎ হয়েছে। রাস্তা থেকে সমস্ত বাড়িটা একবারে দেখা যায়—প্রত্যেকটি ব্যালকনিতে আলো। আর নায়ক সেই সব সিঁড়ি দিয়ে এমনভাবে উঠছে-নামছে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রকান্ড একটা বাড়ি এইমাত্র ঘুম থেকে হঠাৎ অজ্ঞাত আশঙ্কায় জেগে উঠেছে।

এর পরে ফন স্টার্নবার্গ 'থান্ডারবোল্ট' (১৯২৯) নামে চলনসই একটা রোমাঞ্চকর ছবি তোলেন। এটাই তাঁর প্রথম সবাক ছবি। এর পরবর্তী ছবি 'দি ব্লু এঞ্জেল'-এ (১৯৩০) তিনি যে ফিল্মিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, 'থান্ডারবোল্ট'-এ তার প্রায় কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না।

এমিল জ্যানিংস তাঁর প্রথম সবাক চিত্রের পরিচালনা করার জন্য ফন স্টার্নবার্গকে এই সময় জার্মানীতে ডেকে পাঠান। হাইন্‌রিখ্ মান্-এর 'প্রফেসার উনরাথ্' নামক

উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগুলি ফন স্টার্নবার্গ-এর রীতিতে ফিল্মে তোলার এমন উপযোগী যে শিল্প হয়েও ফিল্মটি অর্থকরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মধ্য-বয়সী এক ইংরেজ অধ্যাপক লোলা-লোলা নামে হৃদয়হীন এক নৈশ-ক্লাবের গায়িকার আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে কিভাবে চরম অধঃপাতে গেলেন—উপন্যাস-খানির বিষয়বস্তু হচ্ছে তাই।

'দি ব্লু এঞ্জেল'-এর দৃশ্য পরিকল্পনাগুলিই বিশেষ করে এই ফিল্মের আকর্ষণ। দৃশ্যগুলি হুবহু বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া না হয়ে বরং তার কাল্পনিক প্রতিরূপ হয়েছে। কাল্পনিক দৃশ্যসজ্জা তৈরি করতে 'উফা' স্টুডিয়োর তুলনা ছিল না। ফন স্টার্নবার্গ এই স্টুডিয়োর দৃশ্যসজ্জাকারদের সম্পূর্ণ সহায়তা পেলেন, এবং তাদের দিয়ে এমন অভিনব দৃশ্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়ে নিলেন যা তাঁর কোনো ছবিতেই দেখা যায় না। 'দি ব্লু এঞ্জেল' চিত্রে নানারকম জিনিসপত্র দিয়ে অসম্ভব ঘেঁষাঘেঁষি করে সাজানো ছোট্ট একটা মঞ্চে লোলা-লোলার গানের একটি দৃশ্য আছে। দৃশ্যটি জালের আবরণে ঢাকা, উপরে নিচু কড়িকাঠগুলো বেরিয়ে আছে, দেয়ালে অসম্ভব সব জায়গায় আলো বসানো। গানের মাঝখানে মঞ্চের ঠিক নিচ থেকে পানীয়-বেসাতী একবার তার পণ্যের কথা হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেয়। নিপুণভাবে ক্যামেরার সাহায্যে এই সব খুঁটিনাটিতে ভরা দৃশ্যের যে ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়েছে, প্রচলিত রীতিতে দৃশ্য-পরিকল্পনা করলে সেটা অসম্ভব হত।

তারপর যে দৃশ্যে বৃদ্ধ অধ্যাপক অবশেষে ক্লাউনের ভূমিকাতেও নামলেন এবং তাঁর নিজের শহরে ফিরে এসে তাঁরই প্রাক্তন ছাত্রদের সামনে এই মর্মান্তিক পরিহাসের বেশে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন—সেখানে মনের ভাবাবেগকে সিনেমা-শিল্পের কৌশলে চিত্র-পরিচালক কি নিপুণভাবে দৃশ্যরূপ দিয়েছেন তারই চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রথমে তাঁকে আমরা তাঁর সাজঘরে দেখি, তিনি ক্লাউনের বেশ পরছেন—খোশমেজাজী ক্লাউনের চিরাচরিত বেশ নয়; দোমড়ানো, মোচড়ানো, বেদনাদায়ক একটা ক্লাউনের মুখোশ আঁটছেন তিনি—ভেঙে-পড়ার দিন যে আর বেশি দূরে নেই এযেন তারই ইঙ্গিত। এই মর্মান্তিক হাস্যকর বেশে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন স্টেজে ঢুকলেন—স্টেজের পশ্চাৎপটে নিরাকার আলো-ছায়ার ব্যঞ্জনা তখন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাচ্ছে। এথেকে স্পষ্ট ধরা যায় অধ্যাপকের মনের মধ্যে তখন করুণ ভাবাবেগের কি প্রলয়কান্ড চলেছে। ধীরে ধীরে দৃশ্য চরম পরিণতিতে এল। উইংস-এর ফাঁক দিয়ে অধ্যাপক মঞ্চ থেকেই দেখলেন লোলা-লোলা অন্য আর একজনের আলিঙ্গনে সমর্পণ করছে নিজেকে। মেয়েটাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য ভদ্রলোক মঞ্চ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

ফিল্মের ইতিহাসে 'দি ব্লু এঞ্জেল'-এর স্থান রীতিমতো উঁচুতে। শব্দ আর দৃশ্যের মিলন ঘটিয়ে ফিল্মের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টির যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, প্রথম সবাক চিত্রের মধ্যে এই ছবিখানিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। গুরুগম্ভীর

কথাবার্তায় ঠাসা ফিল্মের রাজ্যে 'দি ব্লু এঞ্জেল' নূতন আশার বাণী বহন করে আনল। গান আর সংলাপ, শব্দ আর সঙ্গীতের এক সুসমঞ্জস মিশ্রণ।

এর পর ফন স্টার্নবার্গ মার্লিন ডিট্রিশকে নিয়ে আমেরিকায় যান আর সেখানে ১৯৩০ সালে 'মরক্কো' নামে ছবি তোলেন। 'দি ব্লু এঞ্জেল'-এর লোলা-লোলার মধ্যে ডিট্রিশ পার্থিব কামাতুর এক চরিত্রের রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই অভিনয়ের ব্যাখ্যা করতে হলে, এখন মনে হয়, পরিচালক হিসাবে ফন স্টার্নবার্গ জ্যানিংস-এর প্রতি তাঁর মন এত নিবিষ্ট রেখেছিলেন যে তখন ডিট্রিশের দিকে বিশেষ তাকাবারই সময় পাননি তিনি। অথবা জার্মানীতে থাকার সময় হয়তো ডিট্রিশের চরিত্রের এমন অনেক বৈশিষ্ট্যই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিল যা পরে চোখে পড়ে। মার্কিনদেশে তোলা ফন স্টার্নবার্গ-এর ছবির ডিট্রিশ সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ। ম্রিয়মান, সংযত, চলায় বলায়, কথার ভঙ্গীতে চারিত্রিক বিশিষ্টতাময়। ফন স্টার্নবার্গের ফিল্মে মার্লিন ডিট্রিশের এই চারিত্রিক রূপ ফিল্ম-পরিচালকের নিজের সৃষ্টি।

এই 'মরক্কো' ছবিতে ফিল্মের গঠনরীতি-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন ফন স্টার্ন-বার্গ। খুব সরল রোম্যাণ্টিক একটা কাহিনী, বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হিসাবে দেখলে ছবিখানাকে হাস্যকরই বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ফিল্মে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি আঁকার অভিলাষ ফন স্টার্নবার্গ-এর ছিল না। তিনি অদ্ভুত সব চরিত্র সাজিয়ে অভিনব এক পরিবেশের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রয়াস সার্থক হয়েছিল। একজন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে ছবিখানি সবাক-চিত্র সৃষ্টির আদর্শ দৃষ্টান্ত। নির্মাণ কৌশলে ছবিখানি যথার্থই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ল্যাপ ডিসল্ভ্-এর সাহায্যে দুটি দৃশ্য, একটির উপরে আর একটিকে, যুগপৎ শব্দব্যঞ্জনার পরিবর্তন করে মিলিয়ে দেবার কৌশল এই ছবিটিতে দেখা যাবে। হাসপাতাল থেকে আরবীয় কাফের মধ্যে দৃশ্য পরিবর্তনের কথা ধরা যাক · প্রেমিকের খোঁজে হাসপাতালের করিডর বেয়ে ডিট্রিশ আসছেন; ধীরে ধীরে তাঁর চলন্ত মূর্তি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে এল, কানে এল আদিবাসীদের মাদলের শব্দ, ক্রমে ভেসে উঠল মুখোশ-পরা আদিম একটি মেয়ের আশ্চর্য মন্থর তীর্যক নাচের দৃশ্য। অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে দৃশ্য আর ভাবের পরিবর্তন ঘটানো হল।

'মরক্কো' চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে ছবিতে কোথাও অন্তরাল সঙ্গীত নেই। কাফের-দৃশ্য দুটির মতো যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সঙ্গীত আছে, তা ছাড়া কোথাও অস্বাভাবিক কিছুই নেই। আজকাল কাহিনীর ভাব ও দৃশ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য অন্তরাল সঙ্গীত ফিল্মের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সেই অতদিন আগেও গঠনরীতির উপর ফন স্টার্নবার্গ এত বেশি দখল দেখাতে পেরেছিলেন যে শুধু যথোপযোগী ধ্বনি আর যৎসামান্য সংলাপের সাহায্যে প্রত্যেকটি দৃশ্যের আকর্ষণ অব্যাহতভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। অন্তরালসঙ্গীত না থাকায় এই ছবির এমন একটা সুস্পষ্ট

অব্যবহিত আকর্ষণ আছে যা ঢালাও সঙ্গীতে ভরা আধুনিক ফিল্মে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

'মরক্কো'-র পরে ফন স্টার্নবার্গ পর পর অনেকগুলি ডিট্রিশ-ফিল্ম তোলেন। মাঝখানে শুধু ১৯৩১ সালে ড্রাইসার-এর জটিল সামাজিক সমস্যার উপন্যাস নিয়ে 'এ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি' বলে একটা ছবি তুলেছিলেন। ডিট্রিশ-ফিল্ম সমষ্টির চরম পরিণতি হল ১৯৩৫ সালে 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান' ছবিতে। যৌন আবেদনের কাহিনীর সঙ্গে ফিল্ম গঠনের বিশিষ্ট রীতির সংযোগ ঘটিয়ে ক্রমে কিভাবে ফন স্টার্নবার্গ ফিল্ম গঠনের অসামান্য এক ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন এই ছবিগুলিতে তার পরিচয় মেলে। 'ডিজঅনার্ড' (১৯৩১) ছবিতে দৃশ্য অংশের ব্যঞ্জনার প্রতি পরিচালক এতদূর বেশি মনোযোগ দিয়েছেন যে কাহিনী অংশের সামঞ্জস্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। 'সাংহাই এক্সপ্রেস' (১৯৩২) ছবিতে যৎসামান্য উপাদানের সাহায্যে বিপ্লবী চীনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া ছবির গতি আর তালের সঙ্গে চরিত্রের সংলাপ আর ঘটনার এমন চমৎকার বিন্যাস হয়েছে যে আশ্চর্য। এর পরে তিনি 'ব্লন্দ্ ভিনাস' (১৯৩২) নামে গতানুগতিক হালকা ভাবালুতায় ভরা কাহিনী নিয়ে একটি ছবি তোলেন। কিন্তু পরিচালনার কৌশলে এ ছবিটিও অসাধারণ আকর্ষণময় একখানি ছবি হয়ে উঠেছে।

নাম থেকেই বোঝা যায় মার্লিন ডিট্রিশই 'ব্লন্দ্ ভিনাস' ছবিটির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এ ছবির অস্তিত্বেরই মূলে আছেন তিনি। আগের যে কোনো ছবি অপেক্ষা এটিতে তাঁর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বেশি—কোথাও সামান্য গৃহিণী, কোথাও জননী, কোথাও বিলাসী অভিজাত মহিলা, আবার কোথাও লালসাময়ী কাফে-বিহারিনী কিম্বা গণিকা রূপে—নানাভাবে এ ছবিতে দেখানো হয়েছে তাঁকে।

কিন্তু এ ছবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হচ্ছে ফন স্টার্নবার্গের চোখে আমেরিকার স্বরূপ দেখা। আমেরিকার এই চিত্র কাফকার সৃষ্টির মতোই বিচিত্র। আমেরিকার যথাযথ প্রতিচ্ছবি আঁকায় স্টার্নবার্গ-এর অভিরুচি ছিল না। ছবির পটভূমিও বহুবিস্তৃত। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চল, একটা নৈশ-ক্লাব, সস্তা কাফে আর একটা ডাক্তারের ঘর—এই সব দৃশ্যের মধ্যে তিনি বাস্তবের এক কাল্পনিক রূপ আঁকতে চেষ্টা করেছেন। দেশকালের সীমান্ত-পারবর্তী কাহিনী গড়ে উঠেছে —এটাই এছবির অসামান্যতার হেতু।

ছবির শেষের দিকে এক দৃশ্যে মাতাল গণিকার বেশে ডিট্রিশ ক্ষীণ আলোকিত এক জুয়োর আড্ডায় টলতে টলতে ঢুকছে। এখানে তার হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গীতে এমন একটা তাল, দৃশ্যের গতিতে এমন একটা ছন্দ আছে, এবং সবটা মিলে ফিল্মিক রূপ এতদূর সার্থক হয়েছে যে ফন স্টার্নবার্গ-এর সমস্ত কলা-কৌশল যেন হঠাৎ এই এক জায়গায় এসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফিল্মের ছন্দ যে কি জিনিস সে বিষয়ে এই ছোট্ট দৃশ্যেই ফন স্টার্নবার্গ-এর তীক্ষ্ন অনুভূতির সাক্ষাৎ

পাওয়া যায়। সার্থক ফিল্মের সৃষ্টি করতে হলে ডিরেক্টারের মনে 'সিনেমা শিল্পের রসানুভূতি' অর্থাৎ ফিল্মে গতির ছন্দবোধ তীক্ষ্ণ থাকা প্রয়োজন—ফন স্টার্নবার্গ-এর মনে অসামান্য পরিমাণে এই বোধ ছিল। তার জন্য শুধু 'কাটিং' জানলেই চলে না, ছবির নিরূপিত জমির মধ্যে ঘটনার গতি, সমগ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ঘটনার যথাযথ বিন্যাস, ঘূরন্ত ক্যামেরার গতি, এবং গোটা ফিল্মের মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটা বিষয়বস্তুর প্রকৃত যোগাযোগের জ্ঞান থাকা চাই।

এর পরে 'দি স্কার্লেট্ এম্প্রেস' (১৯৩৪) নামে যে ছবি ফন স্টার্নবার্গ তুললেন, তা দেখে মনে হতে পারত যে নির্ভেজাল ভাবে নিজের ফিল্মিক রীতি নিয়ে কাজ করে যাবেন বলে তিনি যেন মন স্থির করে ফেলেছেন। ফিল্ম-রসের দিক দিয়ে ছবিখানি পূর্বের যেকোনো ছবি অপেক্ষা অনেক নিখুঁত। সাহিত্যিক অর্থে যাকে কাহিনী বলা চলে তার প্রায় কিছুই এ-ছবিতে নেই, সম্পূর্ণ দৃশ্যবস্তুর আবেদনের উপরে ছবিটি গড়ে উঠেছে। যৎসামান্য সংলাপ যা আছে তা বাহুল্য অলঙ্করণ মাত্র। ঘটনার পারম্পর্য বুঝতে হলে সংলাপের সহায়তা না হলেও চলে। এমনকি রাণী ক্যাথরিন-এর ইতিহাসলব্ধ কার্যকলাপের বিবরণ ফিল্মের উপরে লিখিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাথারিন-এর সিংহাসন লাভ অবধি আখ্যানভাগ শুধু দৃশ্য পরম্পরায় গ্রথিত। বিভিন্ন চরিত্র অভিনয়ের সুস্পষ্ট একটা ধারা আছে, দৃশ্যসজ্জা সম্পূর্ণ কাল্পনিক (অর্থাৎ বাস্তবের কোনো ছায়া নেই, দৃশ্যগুলি অভিনয়ের একটা প্রত্যক্ষ পটভূমি মাত্র), আর প্রত্যেকটি দৃশ্য যেন গানের আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগের ন্যায় সমগ্র অংশের সঙ্গে সুরে লয়ে সমন্বিত।

এই ফিল্মে চিরাচরিত ধর্মসম্মত রাশিয়ান বিবাহের একটি দীর্ঘ দৃশ্য সিনেমার আনুপূর্বিক ইতিহাসে একটা অসামান্য সৃষ্টির নিদর্শন। ধর্মপ্রথার কিম্ভূত আবেদন সম্পর্কে ফন স্টার্নবার্গ-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এই দৃশ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

'দি স্কার্লেট্ এম্প্রেস'-এর মধ্যে যৌন আবেদন প্রধান অংশ অধিকার করে আছে। দৃশ্যত এবং প্রতীক পন্থার সাহায্যে ডিট্রিশের শরীরের লালসার রূপ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। বিস্ময়ে ডাগর চোখ, সরল একটি তরুণী মেয়ে কিভাবে ধূর্ত কোপন-স্বভাবের নারীতে পরিণত হয়. ফন স্টার্নবার্গ-এর দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

নারীর এই ধ্বংসের রূপ একদিকে উত্তর-উনিশ-শতকী সাহিত্যে আর একদিকে ফন স্টার্নবার্গ-এর প্রথম যুগের সমস্ত ফিল্মে বার বার দেখতে পাওয়া যায়। 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' (১৯৩৫) নামে ডিট্রিশকে নিয়ে তাঁর শেষ ফিল্মে তিনি এ বিষয়ে যেন চূড়ান্ত সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই ছবির ডিট্রিশের সঙ্গে মারিও প্রাজ্-এর 'দি রোম্যান্টিক এ্যাগনি' গ্রন্থে বর্ণিত ধ্বংসময়ী নারীচরিত্র বর্ণনার চমৎকার মিল আছে। এ ছবির আখ্যান ভাগ পিয়ের লুই-র 'ওম্যান এ্যান্ড

পাপেট' নামক গল্প থেকে নেওয়া। রহস্যময়ী এমন একটি নারী এই গল্পের কেন্দ্রে আছে যার প্রভাব সর্বনাশ ডেকে আনে। ফিল্মের শেষ অংশে এমন অনেক নতুন ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে—আদি গল্পে যা ছিল না। ফিল্মের সমাপ্তির অংশটুকু ফন স্টার্নবার্গ-এর নিজস্ব কল্পনা। পর্দা নেমে আসা পর্যন্ত দম-আটকানো রহস্যবোধকে জাগ্রত রাখা হয়েছে। ফিল্মের ইতিহাসে এমন আর একটি উজ্জ্বল সমাপ্তি-দৃশ্যের নাম করা যাবে না।

দশ বছর আগে তিনি 'দি স্যালভেশন হাণ্টার্স' তুলেছিলেন। দশ বছর পরে তুললেন 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান'। রসের বিচারে প্রথম ছবির পরে শেষোক্ত ছবিকেই তাঁর সার্থকতম সৃষ্টি বলতে হয়। এর আগেকার প্রত্যেকটি ফিল্মে যে সব বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিল— এ ছবিতে সে সমস্তই তিনি একত্র সংহত করতে পেরেছেন। দৃশ্য হবে অসাধারণ নতুনত্বে ভরা যেখানে যৌন আবেদনময় রোমাঞ্চের অবতারণা করা যায়, আর এই সমগ্রের কেন্দ্রে থাকবে রহস্যময়ী, ছলনা-কুটিল একটি নারীমূর্তি—মুখে এমন মৃদু হাসি যার কোনো ভাষা নেই।

সতর্ক যত্নে শতাব্দীর ক্রান্তিকালে স্পেনের পরিবেশটিকে দৃশ্যসজ্জার মধ্যে রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলির অঙ্গসজ্জার আয়োজন আশ্চর্য নিখুঁত। ছবিতে ঘটনার গতিরোধ করে সংলাপের সাহায্যে ঐতিহাসিক পটভূমির ব্যাখ্যা করতে হয়নি। সমস্ত ঘটনাটি 'ফ্ল্যাশব্যাক'-এর সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে উপস্থিত। প্রতিটি খণ্ড-দৃশ্য সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশের ন্যায় সমগ্রের মধ্যে গ্রথিত। আবার দৃশ্যের এই গতিছন্দের সহায়তা করেছে ফিল্মের সঙ্গীত অংশ।

যৌন আবেগের প্রতি ফন স্টার্নবার্গ-এর এই টানের মূল অনুসন্ধান করতে হলে ঊনিশ-শতকী রোম্যাণ্টিক এবং উত্তর-ঊনিশ-শতকী ডেকাডেণ্ট সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হবে। সেদিক দিয়ে ফন স্টার্নবার্গ-এর ফিল্মগুলি ঊনিশ-শতকী রোম্যাণ্টিক ঐতিহ্যে গড়া।

'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' ছবিতেই ফন স্টার্নবার্গ-এর প্রতিভা শিখরে পৌঁছেছিল। সিনেমার রূপরীতিবোধ আর মানব হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের শিল্পায়িত দৃশ্যরূপ-সৃষ্টির আকুলতা নিয়ে ১৯২৪ সালে তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ফিল্ম-সৃষ্টির সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যার যোগ এতদূর ঘনিষ্ঠ এবং অধিকাংশ দর্শকের অব্যবহিত মনোরঞ্জনের উপরে তার সার্থকতার এত বেশি নির্ভর যে পরিচালকের পদ বজায় রাখতে গিয়ে ফন স্টার্নবার্গকে আদর্শচ্যুত হয়ে ভিন্ন রুচির সঙ্গে রফা করতে হল। রফা করতে গিয়ে তিনি এমন দুটি ফিল্মিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন যা তাঁর নিজের পক্ষে তৃপ্তিকর তো বটেই, সতর্কভাবে প্রয়োগ করতে পারলে সাধারণ দর্শকের পক্ষেও তা রুচিকর।

স্বেচ্ছায় স্বাধীনতার সীমা এভাবে কমিয়ে তবু তিনি কিভাবে ফিল্মজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন এতক্ষণ তারই আলোচনা হল। মার্লিন ডিট্রিশের মধ্যে যৌনমূর্তির

আদর্শ আবিষ্কার করাই তাঁর সার্থকতার প্রধান সোপান। ডিট্রিশের ছবিগুলি দেখতে দেখতে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই এই অভিনব যৌনআবেদনের চরিত্রসৃষ্টি তাঁর হাতে বিসদৃশ হয়ে উঠতে লাগল। অবাস্তব দৃশ্যসজ্জা, আর রূপকথার অবাস্তব চরিত্রের মধ্যে ডিট্রিশের পরিণতির বিরুদ্ধে দর্শকরা প্রচণ্ড ক্ষোভ জানাতে লাগল। 'দি স্কার্লেট্ এম্প্রেস' আর 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান', দুটো ছবিতেই লোকসান হল। ফন স্টার্নবার্গকে বলতে গেলে ফিরে যেতে হল সেই দশ বছর আগেকার অবস্থার মধ্যে।

তাঁর পরবর্তী জীবনকাহিনীর মধ্যে প্রায় কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। 'দি ডেভিল ইজ্ এ ওম্যান' তোলার পর কলাম্বিয়া স্টুডিও থেকে তিনি ডস্টয়েভ্স্কির 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' (১৯৩৬) তোলেন। পিটার লরে এ ছবিতে রাস্কল্নিকভ-এর ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। এর পরে গ্রেস মুরকে নিয়ে 'দি কিং স্টেপ্স্ আউট' নামে একখানা সঙ্গীতমুখর ছবিও তিনি তুলেছিলেন। ১৯৩৭ সালে রবার্ট গ্রেভ্স্-এর 'আই, ক্লডিয়াস' উপন্যাসের ফিল্ম তোলার জন্য আলেক্জাণ্ডার কর্ডার সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হয়ে ফন স্টার্নবার্গ ইংলণ্ডে আসেন। এ ছবিতে চার্লস লটন আর মার্ল্ ওবেরন অভিনয় করেন। কিন্তু ছবির অর্ধেক তোলা হয়ে যাবার পরে, ছবিতে বীভৎসতার বহর দেখে কর্ডা ছবির কাজ বন্ধ করে দিলেন।

১৯৩৯ সালে মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের তরফ থেকে স্টার্নবার্গ 'সার্জেণ্ট ম্যাডেন' তোলেন। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর 'দি সাংহাই জেস্চার' নামে যে ছবি তিনি তোলেন, সেটাই তাঁর শেষ কাজ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফ্লরেন্স্ রীড আর মিসেস লেসলি কার্টার অভিনীত এই নাটক রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। হয়তো সেইজন্যই সিনেমা হিসাবে এ নাটক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কিন্তু এক একটি খণ্ড দৃশ্যে ফন স্টার্নবার্গ সিনেমার গতিছন্দ আশ্চর্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বড় বেশি কথার বাহুল্য থাকায় সমগ্র ছবিটি উৎরাল না। 'সাংহাই এক্সপ্রেস'-এর ন্যায় এ ছবিতেও তিনি সামান্য উপকরণের সাহায্যে অদ্ভুত রকম চীনা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। মাদার জিন স্লিং-এর জুয়োর আড্ডার দৃশ্যসজ্জার মধ্যে আধুনিক রুচির পরিচয় মেলে।

এই ছবিতেই প্রথম তিনি ভিক্টর মেচিওরকে নিয়ে তাঁর লালসাময়ী নারীচরিত্র-গুলির অনুরূপ একটি পুরুষচরিত্রও সৃষ্টি করেন। 'সাংহাই এক্সপ্রেস'-এর মতো এ ছবির চরিত্রগুলিও সুস্পষ্ট ভঙ্গীপ্রধান। অভিনেতাদের অভিনয়ে বাস্তব অনুভূতির মধ্যে অবাস্তবতার এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে যে কখনো কখনো মনে হয় অভিনেতারা অভিনয়ের ব্যঙ্গ করছে। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে আমরা যা প্রত্যাশা করি, আর স্রষ্টার দৃষ্টি নিয়ে ফন স্টার্নবার্গ যা উপস্থিত করেন, তার মধ্যে সামঞ্জস্য করা প্রকৃতপক্ষে কঠিন ব্যাপার। ফিল্মের কোনো কোনো অংশের ছন্দগতি এত ভঙ্গীময় হয়েছে যে তালটা মনে হয় যেন নৃত্যের।

'দি সাংহাই জেস্‌চার' তোলার পর আজ বহু বছর কেটে গেছে। ফন স্টার্নবার্গ এখন নিউ ইয়র্কে বাস করছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে শিগগিরই এমন একটা ফিল্ম তোলার তিনি জল্পনা-কল্পনা করছেন যার সঙ্গে তাঁর অতীত কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তাঁর নিজের কথায় এ ছবির 'বিষয়বস্তু অত্যন্ত সিরিয়াস। হয়তো কেউই প্রশংসা করবেন না, তাহলেও এ ছবি হবে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা।' জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের মূল কোথায় এবং সহানুভূতি থাকলে কিভাবে সমস্ত মানবসমাজকে একত্র মিলিত করা যায়—সেটাই হচ্ছে ছবির বিষয়-বস্তু। মনে করা অন্যায় হবে না দশ বছর আগে তাঁর যে মর্যাদা ছিল, আজ আবার সেখান থেকে তাঁকে নতুন করে শুরু করতে হবে। —**কার্টিস হ্যারিংটন**

মহাস্থবীর শৃগাল

ইউরোপের আরো নানা বিখ্যাত পরিচালকের মতো ফরাসী পরিচালক রেনে ক্লেয়ারকে একবার নানাভাবে প্রলুব্ধ করে হলিউডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর চুক্তি হয়েছিল টোয়েণ্টিয়েথ্‌-সেঞ্চুরি-ফক্স-এর সঙ্গে। কাজ করতে গিয়ে কয়েকটি বেশ ভালো ছবি তিনি তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু টোয়েণ্টিয়েথ্‌-সেঞ্চুরি-ফক্স-এর মতে ক্লেয়ারের ছবির কাটতি মোটেই আশাপ্রদ হয়নি। কাজেই যেদিন তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হল সেদিন টোয়েণ্টিয়েথ্‌-সেঞ্চুরি-ফক্স-এর কর্তা তাঁকে বললেন : ম'সিয়ে ক্লেয়ার, কি আর বলব, আপনি বিখ্যাত লোক। কিন্তু আপনার ছবিতে পয়সা হয় না। আপনার চুক্তির মেয়াদ তাই আর বাড়াতে পারছি না। গুড্‌-বাই।

রেনে ক্লেয়ার উত্তরে বলেছিলেন : গুড্‌-বাই। আপনাদের ধন্যবাদ। যাবার আগে আমি কেবল বলে যেতে চাই যে 'নাইণ্টিন্‌থ্‌-সেঞ্চুরি-ফক্স'-এর সঙ্গে কাজ করে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছি।
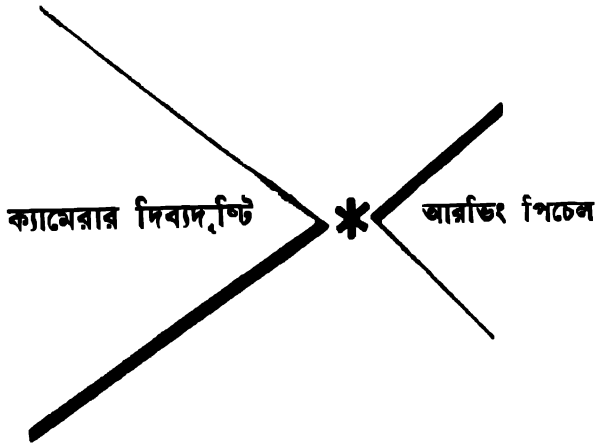
থিয়েটার, সার্কাস, খেলার মাঠ প্রভৃতি সমস্ত রকমের চলমান দৃশ্যের গোড়ার কথাটি হচ্ছে এই যে, দর্শক দৃশ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্থির হয়ে থাকেন। ফুটবল খেলার মাঠে দর্শক দুই দলের খেলা দেখেন তাদের নিজ নিজ গোলপোস্ট থেকে তাদের আপেক্ষিক অবস্থান বিবেচনা করে। গোলপোস্ট দুটোর ব্যবধান তাঁর থেকে সবসময়েই এক আছে, কেবল খেলোয়াড়েরা চলাফেরা করছে, আর তিনি ঘাড় ফিরিয়ে ঘুরিয়ে তাদের গতিবিধি অনুসরণ করছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মনও গোল থেকে খেলোয়াড়দের দূরত্ব অনুধাবন করছে। দর্শক খেলার নিয়মকানুন জানেন তাই এই দূরত্ব তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ। প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটির মধ্যে কোনোটির প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব থাকলে, যখনই খেলোয়াড় আর গোলের ব্যবধান কমতে থাকে তাঁর মনে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেওয়াও বিচিত্র নয়—তিনি লাফালাফি করতে পারেন, হাতপা ছুঁড়ে আনন্দ বা হতাশাও প্রকাশ করতে পারেন।

নিউজরীলের ক্যামেরাম্যান মাঠের অনেক উপর থেকে ছবি নেন। তিনি এমনভাবে ছবি নিতে পারেন যাতে দুইদিকের গোলই একসঙ্গে দেখা যাবে। এরকম ছবি সময়বিশেষে কাজে লাগে, যেমন ধরুন, খেলোয়াড়েরা যখন মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়চ্ছেন এমন অবস্থায়। কিন্তু অনেকদূর থেকে তোলা বলে এই ছবিতে খেলার খুঁটিনাটি কিছুই দেখা যায় না, খেলোয়াড়দেরও চেনা যায় না—বল তো অদৃশ্যই থাকে। ক্যামেরাম্যান সেজন্যে কিছু পরেই নিকটে চলে আসেন অথবা ক্যামেরার লেন্স পালটে নেন। খেলার খুঁটিনাটি এখন অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অবশ্য মাঠের পরিধি এখন অর্ধেক। তাহলেও ক্ষতি নেই, কারণ খেলোয়াড়েরা সব এখন মাঠের একদিকেই, কোনো গোলের কাছাকাছি। ক্যামেরাম্যান তাঁর ক্যামেরা সরিয়ে এনে আসলে দর্শকদেরই এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ছবি যখন পর্দায় ফেলা হয় তখন প্রথমে সমস্ত মাঠটাকে সাধারণ ভাবে এবং তারপরে অংশ-বিশেষকে বিশদভাবে দেখানো হয়। দৃশ্যগুলি ক্রমান্বয়ে দেখানো হলেও দর্শকের দৃষ্টিকোণেব পরিবর্তন হয় সহসা। আবার, যখন কোনো খেলোয়াড় বল নিয়ে মাঠের অপর প্রান্তে ছুটে যায়, তখন ক্যামেরাকেও আগের মতো দূরে নিয়ে যেতে হয়, যাতে মাঠের বেশিভাগ দর্শকের নজরে আসে এবং দূরবর্তী গোল থেকে খেলোয়াড়েরা কে কোথায় আছে তার একটা ধারণা তিনি পান।

ক্যামেরাকে একবার দূরে সরিয়ে নিয়ে পরক্ষণেই আবার কাছে নিয়ে আসা এবং সেই সঙ্গে দৃশ্যের পরম্পরা যাতে ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা করা—বিজ্ঞানের কল্যাণেই ক্যামেরার এই অভিনব ব্যবহার সম্ভব হয়েছে এবং এই উন্নতির ফলেই আজ চলচ্চিত্রে আমরা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দৃশ্যসংস্থানের সন্ধান পাই। চলচ্চিত্র বাস্তবিকই এক অভিনব অভিজ্ঞতা। দর্শক আর দৃশ্যবস্তুর সনাতন সম্বন্ধটি চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। এখন যে কোনো দৃশ্যকে কাছে টানা যায়, দূরেও ঠেলা যায়; অর্থাৎ, উল্টে বললে দর্শক নিজে না নড়েও কাছে গিয়ে দেখার পুরো অনুভূতি লাভ করতে পারেন।

•দৃষ্টিকোণের এই যে আকস্মিক পরিবর্তন, এ কিন্তু দৃশ্যবস্তুর বা ফিল্মদ্রষ্টার অবস্থানের পরিবর্তন নয়, পবিবর্তনটি ঘটছে ফিল্মেই। দৃশ্যপটে কোনোরকম ঘটনার (অ্যাক্শন) অবতারণা না করেও এইভাবে ছবির গতিকে অব্যাহত রাখা হয়। চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছবির এই গতির (মুভমেণ্ট) নানা রূপান্তর ঘটতে লাগল; যেমন সংক্ষিপ্ত গতি অর্থাৎ লং থেকে মিডিয়ম এবং তারপরে আরও কাছে—ক্লোজ শট; আবার বিশেষ একটি ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে কিংবা আরো বিশদভাবে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে দৃষ্টিকোণকে স্থানান্তরিত করা।

দৃষ্টিকোণের আকস্মিক পরিবর্তন যে দর্শকেরা মেনে নেবেন এটা যেন প্রায় স্বতঃসিদ্ধই ছিল কারণ, প্রথমত এ ব্যাপারে চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা বিশেষ সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়ত, এতে দর্শকের কল্পনার স্বাভাবিক গতি কোথাও ব্যাহত হয় না। দর্শকের চোখ কোনো একটি ঘটনা বা দৃশ্যের মধ্যে কাকে বা কোনটিকে বিশেষভাবে দেখতে উৎসুক, চলচ্চিত্র অনেকটা সঠিকভাবেই সেটা দেখাতে পারে এবং একই সময়ে সমস্ত দৃশ্যটি দেখাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো বিশেষ অংশকেও বিশদভাবে দেখাতে পারে। গল্প পড়বার সময়ে পাঠকের মন যেমন লেখকের বিবরণ অনুসারে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে, কি এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় নিবিষ্ট হয়, অথবা কোনো সময়ে বহুবিস্তৃত স্থানের সাধারণ দৃশ্য, কোনো সময়ে আবার সীমাবদ্ধ স্থানের বিশদ দৃশ্য দেখে, চলচ্চিত্রেও ঠিক তেমনই হয়। এর আর একটা শক্তি আছে যেটা একান্তভাবে চলচ্চিত্রেরই—সেটা হচ্ছে দর্শকের মনে দৃশ্যবস্তুর নিকটে আসার ইচ্ছাকে প্রায় ম্যাজিকের মতো কার্যে পরিণত করা এবং

দৃশ্যবস্তুকে অনেক পরিষ্কার ও ঘনিষ্ঠভাবে দেখাতে পারা—যা এমনিতে সম্ভব নয় এবং আগেকার দিনে থিয়েটার কখনো দেখাতে পারেনি।

আবার আমরা কিছুক্ষণের জন্য ফুটবল খেলায় ফিরে আসি। মনে করুন ক্যামেরা-ম্যান নিকটেই আছেন, তাঁর লেন্সে মাঠের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। ফাইন্ডারের মধ্য থেকে তিনি দেখছেন, একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে মাঠের অন্য প্রান্তের গোলের দিকে ছুটছেন। তিনি ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলোয়াড়টিকে অনুসরণ করে চললেন—ঠিক যেমন মাথা ঘুরিয়ে দর্শক খেলা দেখেন। দৃশ্যের পরিবর্তন এখানে আকস্মিক নয়; ঘটনার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সমতালেই দৃশ্যপটেরও পরিবর্তন ঘটছে। এবং এই পরিবর্তন চলচ্চিত্রে ঘটছে না, ঘটছে দর্শনেন্দ্রিয়ে, চক্ষুতে অর্থাৎ ক্যামেরায়।

চলচ্চিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার গতিকেও (মুভমেন্ট) আরো বিশদ করা হয়েছে। ক্যামেরার নিচে এখন চাকা লাগানো হয়, আর তার সাহায্যে ক্যামেরাকে দৃশ্যের আগে আগে বা পিছনে পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়; আবার ক্রেনে করে ক্যামেরাকে দৃশ্যের বহু ঊর্ধ্বেও তোলা হয়। ক্যামেরাকে এখন বিশেষ থেকে সাধারণে (ফুল শট) আবার বিপরীতভাবে সাধারণ থেকে বিশেষে নিয়ে যাওয়া চলে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ক্যামেরার গতি চলচ্চিত্রের গতির চেয়ে অনেক ধীর, আর এর উদ্দেশ্যও পৃথক। এর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় দর্শকের চক্ষুর গতির পরিমাপে অথবা দর্শক যে চলমান বস্তু বা ব্যক্তিটিকে দেখছেন তার গতির পরিমাপে। এর উদ্দেশ্যও সেই জন্য দুটি। যে দৃশ্যের ছবি নেওয়া হচ্ছে দর্শক সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর চোখের গতি যেমন যেমন হতে পারত ক্যামেরাকে তেমনভাবে চলতে হবে অথবা দর্শকের কাছে এমন একটি বিভ্রম সৃষ্টি করতে হবে যেন দর্শক ক্যামেরার চোখ দিয়েই দেখছেন।

পথ দিয়ে একজন পথিক চলেছে। তার একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান আছে এবং সে যে সেইদিকে এগোচ্ছে এ অনুভূতি তার আছে। একটা গাছ হয়তো সেখানে আছে। পথিকের এগোবার সঙ্গে সঙ্গে 'গাছটির আকারের এবং আশেপাশের অন্যান্য জিনিসের তুলনায় তার অবস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। পথিক যত এগোচ্ছে, তার দৃষ্টির প্রসারও আসছে কমে; গাছের মাথার দিকে তাকাতে তাকে আগের চেয়ে মাথা উঁচু করতে হচ্ছে বেশি। এখন সে যা দেখছে তা দেখবার জন্যে তাকে দৃষ্টিকোণ বদলাতে হচ্ছে। তার এবং গাছটির মধ্যেকার ব্যবধান কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটিরই রূপান্তর ঘটছে—তার মনে এমন একটি ধারণা রয়েছে। যতোই সে এগোবে তার মনে হবে—গাছটি লম্বা হচ্ছে, গাছটিকে আগেকার চাইতে বড় দেখাচ্ছে।

লোকটি যদি কোনো গাড়ি করে, ধরুন মোটরে চড়ে, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তার দৈহিক গতি আর সে অনুভব করবে না, ফলে সে আর

তখন বলবে না যে সে নিজে এগোচ্ছে বা গাড়িখানা চলছে—বরং বলবে, 'মাঠটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল,' কিংবা 'বাড়িটা কাছে এসে পড়ল।'

কোনো চলমান দৃশ্যের ছবি তুলতে ক্যামেরাকে যখন এদিক ওদিক নিতে হয় তখন কতকটা এইরকমই হয়। চলমান ব্যক্তি বা বস্তুটি ফাইন্ডারের কেন্দ্রীভূত হয়ে পর্দায় স্থির হয়ে থাকে, তার আশেপাশের যা কিছু সেইগুলিই চলতে থাকে। দর্শকের দৃষ্টি এই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুতে নিবদ্ধ থাকায় আশেপাশের যে সব বাড়িঘর বা দৃশ্য চলে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এই গতির স্বাদ পান, যদিও আদতে তিনি নিশ্চলই থাকেন।

গতিটাকেই বড় করে দেখাতে হবে, না জিনিসটাকে কাছে এনে দেখাতে হবে—ছবি তোলবার সময়ে এটা আগে ঠিক করে নিতে হয়। চলমান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাকে চালানো হলে গতি আর দেখানো যায় না, কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে বস্তুটি তখন পর্দার উপর নিশ্চল হয়েই থাকে, আশেপাশের দৃশ্যগুলিই চলতে থাকে। এ সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা পরে করা হবে।

ক্যামেরার গতি সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে ক্যামেরার কাজ কি, সে সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। চিত্রনাট্যকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবার যন্ত্র বললেই ক্যামেরার পরিচয় সম্পূর্ণ দেওয়া হল না। ক্যামেরা আর তার নেগেটিভ ফিল্ম থেকে শুরু করে প্রাথমিক ডেভেলপিং ও প্রিন্টিং তারপর পজিটিভকে ডেভলপ করা এবং সর্বশেষে পজিটিভ প্রিন্টকে পর্দায় প্রতিফলিত করা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কাজগুলির সঙ্গে মানুষের একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের হুবহু মিল রয়েছে। সেজন্যই ক্যামেরাকে সাধারণ আর দশটা যন্ত্রের সমপর্যায়ে ফেলা চলে না। ক্যামেরা যেন একটি চোখ। অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো এ মানুষের দৃষ্টির পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়। এ চোখের ব্যবহার বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে। ক্যামেরা তাহলে কার চোখের প্রতিভূ? এর ব্যবহারই বা কিভাবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। ক্যামেরায় তোলা ছবি যখন দর্শকদের দেখবার জন্যই তখন ক্যামেরাকে দর্শকের চক্ষুর একটি বিস্তৃত সংস্করণ বা অধিচক্ষু বলা যায়। দর্শক স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যা দেখতে পেতেন ক্যামেরাও তাই দেখে এবং নিউজরীলের মতোই তাকে দর্শকের দৃষ্টিগোচর করে। প্রতি মুহূর্তে ক্যামেরা দর্শকের দেখবার ব্যক্ত ও অব্যক্ত আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করে; যেমন ধরুন, কখনো সাধারণভাবে কখনো বিশদভাবে একাধিক স্থান বা ব্যক্তি—তাদের হাতমুখ, অস্ত্রশস্ত্র, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কার্যকলাপ—সমস্তটা মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গ নাটক, একটি অখণ্ড কাহিনী।

থিয়েটারের হলে দর্শক যেমন আই-গ্লাস দিয়ে কখনো এ অভিনেতা কখনো ও

অভিনেতার দিকে দেখেন, ক্যামেরাও সেই রকম এক থেকে অন্য ব্যক্তি বা দৃশ্যকে দর্শকের দৃষ্টিগোচর করে, আই-গ্লাস ঘুরিয়ে নেবার কালক্ষেপটুকুও তার হয় না। একস্থানের সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত হলে তৎক্ষণাৎ সে দর্শককে স্থানান্তরে নিয়ে যায়। গল্পের কোনো চরিত্র গাড়িতে, উড়োজাহাজে বা ডুবোজাহাজে যেখানেই থাক ক্যামেরা স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে পারে। প্রেমিক প্রেমিকার অনুবর্তী হয়ে তাদের কথা সে শোনে, আসামীর সঙ্গে সঙ্গে সে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত যায়। ক্যামেরাকে যদি দর্শকের চক্ষুর বিকল্প বা উন্নততর সংস্করণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে একটা জিনিস সম্বন্ধে একটু সচেতন থাকা দরকার—ক্যামেরার বিচরণ-ক্ষমতা যেন মানুষের সামর্থ্যসীমা অতিক্রম না করে।

ক্যামেরাকে যদি দর্শকের কথা ভাবতে না হয়, তা হলে সে ঔপন্যাসিকের মতো অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে। তখন সে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি পায় এবং সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিকের স্বকীয়তা, এবং বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীটিও তাতে এসে বর্তায়। সে তখন সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী। অর্থাৎ গল্পটি বলবার জন্য যা সে দেখতে চায় তা দেখতে পায়, যেখানে যেতে চায় সেখানে যেতে পারে। সময়, স্থান আর কার্যকারণের যে পরম্পরা গড়ে ওঠে তাকে জীবনের নির্দিষ্ট কতকগুলি ঘটনা থেকে ক্যামেরা অনায়াসে বাছাই করে নিতে পারে; মানুষের সাধারণ চোখ তা পারে না। পক্ষান্তরে, আখ্যায়িকার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি ক্যামেরা বাদ দিতে পারে। ক্যামেরার এই ব্যবহারে দর্শকচক্ষুর অন্তরালে একটি অখণ্ড চরিত্রের সন্ধান মেলে যেটা স্বয়ং কথকের মতোই স্পষ্ট এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—তা সে ক্যামেরা লেখকই চালান বা পরিচালক। এইভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করলে চিত্র-পরিচালক লেখকেরই মতো নিজস্ব একটি বিশেষ ঢং সৃষ্টি করতে পারেন। পরিচালক (ডিরেক্টর) কথাটি এখানে ক্যামেরার মতোই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো ছবি যিনি সৃষ্টি করেন তাঁকে বা যাঁরা পরিকল্পনা, রচনা, পরিচালনা এবং সম্পাদনে সহযোগিতা করেন তাঁদের সকলকেই এখানে পরিচালক পর্যায়ভুক্ত করা হচ্ছে। ডিরেক্টর যেমন করে গল্পটি দেখেন, ক্যামেরাও ঠিক তেমন করেই দেখবে এবং তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকে দর্শকের কাছে বর্ণনা করবে। ডিরেক্টরের কাছে যে দৃশ্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ক্যামেরা শুধু সেগুলোকেই বেছে নেবে। এবং এই দৃশ্যগুলি এমন ভাবে সাজানো হবে যাতে সেই সাজানোর মধ্যেও ডিরেক্টরের অভিপ্সিত একটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ক্যামেরার গতিবিধিও এমন হবে যাতে ডিরেক্টর যখন যেদিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান সেদিকেই সে ঘুরবে ফিরবে।

কোনো কোনো আখ্যায়িকায় লেখক যেমন নিজেই একটি চরিত্র হয়ে গল্প বলে যান, ক্যামেরাকেও তেমনি করে ব্যক্তির রূপ দিয়ে আরো অন্তরঙ্গ করবার চেষ্টা হয়েছে; ক্যামেরা যেন বর্ণিত গল্পেরই কোনো চরিত্রের চক্ষুস্বরূপ। রুবেন

ম্যামুলিয়ান তাঁর 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড' চিত্রটি যে দৃশ্য দিয়ে শুরু করেছেন তাতে ক্যামেরাকে ডক্টর জেকিলেরই চোখ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য কয়েকশো ফুট পরে এ পদ্ধতি ত্যাগ করতে হয়েছিল কারণ গল্পটি ডক্টর জেকিলকে নিয়েই।

কয়েক বছর আগে বর্তমান লেখকের পরিচালনায় 'দি গ্রেট কমান্ডমেন্ট' নামক চিত্রে ক্যামেরাকে দুটি পর্যায়ে (সিকোয়েন্স) উত্তমপুরুষে ব্যবহার করা হয়েছিল—যিশু-খৃষ্টের চোখ হিসেবে। এই আখ্যায়িকায় যিশু কেবল দুটি ছোট ছোট দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমত গল্পটি ঠিক তাঁর সম্বন্ধে নয়, তাঁর চতুর্দিকে যারা ছিল তাদের নিয়ে, দ্বিতীয়ত তিনি সমগ্র কাহিনীতে কখনো প্রকট হয়ে ওঠেননি, কাহিনীর কেন্দ্রস্থল হয়েও বরাবর প্রচ্ছন্নই থেকে গেছেন, সেজন্যই উত্তম পুরুষের প্রয়োগে দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল যা অন্য কোনো রকমে হতে পারতো না। বেশির ভাগ দর্শকের মনঃপুত করে যাঁকে রূপায়িত করা মোটেই সম্ভব হত না, তাঁকে দেখাবার প্রয়োজনই আর রইল না, দ্বিতীয়ত, ক্যামেরা প্রধান প্রধান চরিত্রের উপরে যিশুখৃষ্টের প্রভাব আরো ঘনিষ্ঠভাবে অনুভব করাতে সক্ষম হল।

ক্যামেরাকে একটি চরিত্ররূপে ব্যবহার করা হলে তার ক্ষেত্র যে কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে সেটা সহজেই বোঝা যায়। এখন, ক্যামেরা যে চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছে তার সঙ্গে যে চরিত্র কথা বলবেন তাঁকে সোজা লেন্সের দিকেই তাকাতে হবে; অর্থাৎ তাকে পর্দা থেকে সোজা দর্শকের চোখের দিকে তাকাতে হবে। এতে ক্যামেরারূপ চরিত্রের সঙ্গে দর্শক এক হয়ে গেলেন। হিচককের 'স্পেলবাউন্ড' নামক চিত্রের শেষের দিকে ক্যামেরা মুহূর্তের জন্য ডক্টর মার্চিসনের চোখ হয়ে যায়। ক্যামেরা দেখতে থাকে ইনগ্রিড বার্গম্যান ঘর পার হয়ে দরজার দিকে গেলেন, তার পর ক্যামেরার নিচে পর্দার ঠিক মাঝখানে ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর গতি অনুসরণ করে আমরা দেখি মার্চিসনের হাতে রিভলভার। ইনগ্রিড চলে গেলেন, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন মার্চিসনের হাত দরজার দিক থেকে রিভলভার ফিরিয়ে নেয়, একটু থামে, তার পরে সোজা লেন্সের দিকে রিভলভারের মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দেয়। সটান দর্শকের দিকে। এতে সমস্ত উদ্দেশ্যটাই পন্ড হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া দৃশ্যের পরম্পরাকে কখনো ব্যাহত কবা চলে না। এবং এটাও সব সময়ে মনে রাখা দরকার যে ক্যামেরা এখন কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েছে, তার গতির সঙ্গে, তার শারীরিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তবেই ক্যামেরাকে সরানো সম্ভব। যা সে দেখতে বা জানতে পারে সেই তার সীমা। অরসন্ ওয়েল্স হলিউডে জোসেফ্ কনরাডের 'দি হার্ট অভ্ ডার্কনেস' চিত্রখানি তুলতে চেয়েছিলেন এমনিভাবে, যাতে ক্যামেরা স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শীরূপে ঘটনাটি বিবৃত করছে; কিন্তু উপরোক্ত কতকগুলি ত্রুটির জন্যে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

আর একভাবে ক্যামেরাকে ব্যবহার করা যায়। এতে ক্যামেরার উপর কোনো ব্যক্তিত্ব

আরোপ করা হয় না, ক্যামেরা তখন ডিরেক্টরের হাতে একটি যন্ত্র মাত্র; একজন ওস্তাদ বাজিয়ের হাতে বেহালা যেমন বাজে, ডিরেক্টরের ইচ্ছামতো ক্যামেরাও ঠিক তেমনই সুন্দর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যামেরা দর্শকের মনের বা চোখের বিস্তার মাত্র নয়, সম্পূর্ণ অভিনব একটি দর্শনযন্ত্র, রাডারের (radar) মতোই বিস্ময়কর, এবং মানুষের দৃষ্টির মতো সীমাবদ্ধ বা অস্পষ্ট নয়। ক্যামেরাকে যদি ডিরেক্টর এইভাবে ব্যবহার করতে চান তাহলে তিনি সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশভাবেই তা করেন। মানুষের দৃষ্টি যেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, ক্যামেরা সেখানে যায়। কতকগুলি বিধিনিয়ম সে হয়তো মানে, কিন্তু সে তার নিজের, মানুষের দৃষ্টি বা জ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। একাধিক ডিরেক্টর এইভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করে অদ্ভুত ফল পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ফন স্টার্নবার্গের 'দি স্কারলেট এম্‌প্রেস' এবং অরসন্ ওয়েল্‌সের 'সিটিজেন কেন্' চিত্রদ্বয়ের কথা মনে পড়ে।

নিপুণ হাতে পড়লে ক্যামেরার এই শিল্পচাতুর্য কাহিনীর নাটকীয় রস অনেকখানি বাড়িয়ে দিতে পারে এবং এমন ছবি সৃষ্টি করতে পারে যা কেবল ক্যামেরার পক্ষেই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ছবির সঙ্গে ক্যামেরার সম্বন্ধ ঠিক ততখানিই যতখানি বেহালার সুরের সঙ্গে বেহালার। ক্যামেরাকে এভাবে ব্যবহার করায় বিপদ আছে। স্বল্প কথায় সেটা হল এই যে এতে ক্যামেরাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার একটা ঝোঁক আসে, যেন (ছবির মূলধারার সঙ্গে তার সঙ্গতি না থাকলেও) শুধু চমকপ্রদ বলেই বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ বা দৃশ্যবিন্যাসকে (কম্পোজিশন) ছবির অন্তর্গত করা চলে; যেন ক্যামেরার যান্ত্রিক সামর্থ্যে কুলোয় বলেই বিশেষ একটি ভঙ্গীতে ছবি তুলতে হবে, এ জন্য কোনো মুখ্য উদ্দেশ্যেরও প্রয়োজন নেই।

মোট কথা, ডিরেক্টরের কাছে বিশেষ একটি দৃশ্যবিন্যাসের (কম্পোজিশন) বিশেষ একটি অর্থ থাকবেই এবং সেই বিশেষ অর্থে পৌঁছবার জন্য তিনি স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সব উপায়কেই অপরিহার্য বলে মনে করবেন।

নাটকের মধ্যে নাচগানের কোনো আসরের ছবি বা অনুরূপ অনাটকীয় বিষয় বস্তু আমদানি করতে হলে ক্যামেরাকে এইভাবে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। গানের বা নৃত্যছন্দের সঙ্গে ক্যামেরার গতির একটা প্রকৃত বা কাল্পনিক সম্বন্ধ অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডিরেক্টর নিজের খেয়াল মতো কতগুলো কোণ বেছে নিয়ে ক্যামেরা চালান, আর কিছুর জন্য নয়, শুধু যাতে দর্শকের মন ঝিমিয়ে না পড়ে।

ক্যামেরার ব্যবহার যেভাবেই হোক না কেন, সে সম্বন্ধে দর্শকদের কখনো সচেতন করে দেওয়া হয় না। ক্যামেরাকে দর্শকেরা তাঁদের নিজের চোখ বা লেখকের চোখ অথবা কোনো পাত্র বা পাত্রীর চোখ হিসেবে দেখবেন সে সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেওয়া

হয় না। গল্পের কোনো চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতেও তাঁদের বলা হয় না। আসলে ডিরেক্টর বিশেষ কোনো একটা রীতি মেনে ক্যামেরা ব্যবহার করেন না। তাঁরা ক্যামেরাকে এমনভাবে ব্যবহার করেন যাতে ক্যামেরা কখনো দর্শক, কখনো গল্পলেখক, কখনো একেবারে উত্তমপুরুষ, আবার কখনো বা বিশেষ একটি ভাব বা ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলার যন্ত্র মাত্র। ক্যামেরার এই বিচিত্র ব্যবহারের স্বপক্ষে তাঁদের যুক্তি হল, কাহিনীর গতিকে অবারিত রাখার জন্য ক্যামেরাকেও সচল রাখতে হবে। তাঁদের মতে ঘন ঘন ক্যামেরার দিক পরিবর্তনেই ছবি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং এইভাবে ক্যামেরা ব্যবহারের ফলে যে সব চমকপ্রদ দৃশ্যপট সৃষ্টি হয় সেগুলোর বিশেষ তাৎপর্য আছে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের মতবাদের সার্থকতা থাকতে পারে কিন্তু এতে ক্যামেরা যে যন্ত্রমাত্র নয়, সজীব বস্তুর মতোই তার ব্যবহার, এই মূল সত্যটিকে তাঁরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

মানুষের চোখের মতো ক্যামেরাও দৃষ্টিবিজ্ঞানের বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কার্যত ক্যামেরা শুধু দৃষ্টিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকে না, দৃষ্টির জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অনুশাসনেও প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়। ক্যামেরার কার্যকলাপ সম্পর্কে ডিরেক্টর এবং দর্শকের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা খুব কম ডিরেক্টরের মধ্যেই দেখা যায়। জন ফোর্ড এ দিক থেকে একজন আদর্শ ডিরেক্টর। প্রবন্ধ লেখকের মতে ফোর্ড বরাবর ক্যামেরাকে দর্শকের চক্ষুস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। তিনি ক্যামেরাকে সচলভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন। ফলে তাঁর ছবিতে দর্শকেরা এমন এক স্থিতিশীল জগতে এসে পড়েন যেখানে শুধু মানুষই প্রাণশীল, প্রকৃতি বা ঘরবাড়ি, আর সবই নিশ্চল। ক্লোজ-আপের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম, কাছ থেকে ছবি নিতে হলে পাত্রই ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে, ক্যামেরা এগিয়ে যায় না। ফোর্ডের মতে ক্যামেরার সচলতা বাস্তবতা বিরোধী। এর কারণ, তিনি বলেন, ক্যামেরার গতির (মুভমেণ্ট) সাহায্যে দর্শকের মনে গতির সঞ্চার করা সম্ভব নয়। ক্যামেরা যেভাবেই চলাফেরা করুক, দর্শকের পক্ষে ভোলা মুশকিল যে তাঁরা এক জায়গায় স্থাণু হয়ে আছেন। ফোর্ড সামান্য যে কয়েক ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে সচলভাবে ব্যবহার করেছেন সেখানে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন এবং তার ফলও হয়েছে অভিনব। 'দি গ্রেপ্‌স অভ্‌ রথ' চিত্রে ক্যামেরার এমনি একটি সুষ্ঠু ব্যবহার রয়েছে, যেখানে ক্যামেরা জোড পরিবারকে অনুসরণ করে ওকি উপনিবেশের মধ্য দিয়ে তাদের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে। কিংবা 'হাউ গ্রীন ওয়জ মাই ভ্যালি' চিত্রে যেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য ফোর্ড [illegible] স্থান গ্রহণ করেছেন—এখানে মর্গ্যান দম্পতীর মুখের উপর থেকে সরে এসে ক্যামেরা রাস্তায় এসে পড়ে, দেখায় দু'ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফোর্ডের উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনমতো এখানে ওখানে টিপ্পনি সহকারে গল্পটিকে দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরা। টিপ্পনিও এত স্বল্প যে সমগ্র চিত্রের নিরপেক্ষতার মধ্যে তার

ব্যবহার বিশেষ অর্থময় হয়ে ওঠে। লিও ম্যাক্‌ক্যারির 'দি বেলস অভ সেণ্ট মেরিস' চিত্রে ক্যামেরাকে বার ছয়েক মাত্র সচলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে—যেমন ধরুন, কোনো চরিত্র হয়তো বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে দৃশ্যের একাংশ থেকে আরেক অংশে যাচ্ছে। এ জায়গায় দর্শকের চোখ যেমন চরিত্রটিকে অনুসরণ করছে, ক্যামেরাও ঠিক সেইভাবে ঘোরানো হচ্ছে।

আর একদল ডিরেক্টার আছেন যাঁদের ক্যামেরা ব্যবহার আরো স্বচ্ছন্দ। কাহিনীকার যেমন কথাকে তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেন, এ'রা ক্যামেরাকেও ব্যবহার করেন ঠিক সেইভাবে। ক্যামেরা চালান নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে। দর্শকদের কথা যে একেবারে ভুলে যান তা অবশ্য নয়, তবে এ'দের ভাবটা হল যেন 'আমি কি দেখেছিলাম আপনারাও দেখুন।' এ'রা গাইডের মতোই দর্শকদের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়ে যান। কখনো করুণ কখনো বা ঠাট্টার পরিবেশে এক একটি চরিত্রকে দর্শকের কাছে উপস্থিত করেন। মাঝে মাঝে আবার তাঁদের দৃষ্টির অভিনবত্ব দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গী অস্বাভাবিক না হলেও দর্শকের দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যায়। ক্যামেরা যে কোথায় চোখ ফেলবে, কি উদ্ঘাটিত করবে, সে সম্বন্ধে দর্শক কোনোরকম আঁচ করতে না পারলেও ডিরেক্টরের মনে তার একটা পরিকল্পনা গোড়া থেকেই থাকে। সে জন্যই ক্যামেরা যখন কোনো কাহিনীকে রূপায়িত করে তখন তাতে সব কিছুই পূর্বকল্পিত—এমনকি কোনো অপ্রত্যাশিত বিষয়ও প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, লুবিশ-এর যে কোনো ছবিতেই দেখবেন, হয় দর্শকের চিত্তরঞ্জনের নয় চিত্ত উদ্বেলিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। যা দেখানো হল সেটা কতদূর বাস্তবসঙ্গত সে প্রশ্ন এখানে গৌণ। এসব ক্ষেত্রে ছবির উদ্দেশ্য হুবহু সত্যানুসরণ নয়, দর্শকের চিত্তবিনোদন।

ক্যামেরার ব্যবহার সম্বন্ধে যার যে মতই থাকুক না কেন, অভিজ্ঞ ডিরেক্টরমাত্রেই একটা বিষয় লক্ষ্য রাখেন—কোনো দৃশ্যেই প্রকাশভঙ্গীটা যেন কখনো বিষয়-বস্তুকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে না ওঠে। কাহিনীটা যথাযথভাবে বলা হল কিনা সেটাই প্রথম বিবেচ্য। ছবির এক একটি দৃশ্য এক বা একাধিক চরিত্রের কথাবার্তা বা ভাবভঙ্গী প্রকাশেরই বাহক মাত্র। ধরুন, একটি দৃশ্যে কোনো চরিত্রকে নড়েচড়ে কিছু করতে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে চরিত্রটির শারীরিক ক্রিয়াকে ছবিতে ধরে রাখার উপযুক্ত ভূমিকা ক্যামেরা তৈরি করে নেবে। যদি শারীরিক ক্রিয়াটা কোনো দৃশ্যে গৌণ হয়ে পড়ে এবং চরিত্রটি কি বলছে বা কি ভাবছে সেটাই মুখ্য হয়ে ওঠে তবে ক্যামেরা তাকে পর্দার মাঝখানে রেখে ছবি তুলবে, তা সে একজায়গায় স্থির হয়েই থাক বা নড়াচড়াই করুক। আবার কোনো দৃশ্যে যদি চরিত্রটির কথা বা মুখের

ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং আবেদনপূর্ণ হয় তবে দর্শকের কাছে ক্যামেরার অস্তিত্ব প্রায় প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এমন হয় যে চরিত্রটি স্থির হয়ে আছে আর ক্যামেরা তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বা তার কাছ থেকে সরে আসছে, তবে ক্যামেরার গতি দর্শকের কাছে ধরা না পড়ে পারে না এবং সে ক্ষেত্রে ক্যামেরা যেন দর্শককে বলে, 'এই লোকটিকে লক্ষ্য করুন!' কিংবা 'লোকটি কি ভাবছে শুনলেন তো, এবার দূরে সরে এসে দেখুন তিনি কি করেন।' এইভাবে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে যদি গল্পের নাটকীয়তা বাড়ানো যায় তবেই ক্যামেরার কাজ সার্থক। কিন্তু ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ যদি উদ্দেশ্যহীনভাবে শুধু অভিনবত্বের খাতিরেই বদলানো হয় তবে দর্শকের দৃষ্টি যান্ত্রিক ক্রিয়াটুকুতেই আটকে পড়বে, বিষয়বস্তুর আবেদন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হবে।

'প্যান শট' অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টির অনুসরণে ক্যামেরাকে ঘোরানো ছাড়া আরো দুভাবে ক্যামেরা চালানো হয় : (১) এক বা একাধিক চরিত্রের গতিমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সমতালে, কিংবা (২) ভিন্ন তালে।

আগেই বলা হয়েছে ক্যামেরাকে কোনো চরিত্রের শারীরিক ক্রিয়ার সমতালে চালানো একমাত্র তখনই সার্থক যখন সেই চরিত্রটি নিজেই দৃশ্যের প্রধান আকর্ষণ, পরিবেশ বা পার্শ্বচরিত্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক তখন গৌণ। সাধারণত, ক্যামেরাকে যখন এইভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন দর্শক আর পর্দায় প্রতিফলিত চরিত্রের মধ্যবর্তী ব্যবধানের বিশেষ তারতম্য ঘটে না।

যে সব ক্ষেত্রে ক্যামেরার চলাফেরা কোনো চরিত্রবিশেষের চলাফেরার অনুসরণে নয় সেখানে হয় স্বয়ং কাহিনীকারের নয়তো দর্শকের কল্পনার গতিবিধিকেই ক্যামেরা রূপ দিতে চেষ্টা করে। ক্যামেরার এই জাতীয় ব্যবহার নানাভাবে হতে পারে : (১) দূর থেকে কাছে এগিয়ে যাওয়া, (২) কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, (৩) সম্পূর্ণ দৃশ্য থেকে দৃশ্যাংশে বা (৪) দৃশ্যাংশ থেকে সম্পূর্ণ দৃশ্যে যাওয়া। ক্যামেরা যদি এইভাবে কোনো ছবিতে দর্শকের দৃষ্টিকে কখনো চরিত্রবিশেষের কাছাকাছি এনে, কখনো বা দূরে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ দৃশ্যের উপর ফেলে, কিংবা কখনো দৃশ্যের বিশেষ একটি অংশে টেনে নিয়ে আবার কখনো কোনো দৃশ্যাংশ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ দৃশ্যের উপর প্রসারিত করে দর্শকের মনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাল রাখতে পারে তবেই তার চলা সার্থক। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্যামেরাকে স্থির রেখেও অন্য উপায়ে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে, যেমন ধরুন, সরাসরি কাট্-এর (cut) সাহায্যে। এতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে এবং অনেকটা অলক্ষিতেই দৃষ্টিকোণ বদলানো যায়। ক্যামেরাকে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী চালালে আবার একটা সমস্যা এসে জোটে — ছবিব গতি অনেকখানি শ্লথ হয়ে আসে। অবিশ্যি গতিমাত্রা সংক্ষিপ্ত হওয়াতে হয়তো হৃদয়াবেগের হেরফের ঘটতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দর্শকমনের উপর কোনো দৃশ্যের প্রাথমিক আবেদন

বিষয়গত। এই আবেদনকেই যদি ক্যামেরার গতির সাহায্যে আরো ঘন করবার চেষ্টা হয় তবে তাতে কৃত্রিমতা থাকবেই, কারণ ছবির গতিমাত্রাকে প্রায় জোর করেই দর্শকের চোখে সঞ্চারিত করে দেওয়া হচ্ছে। ছন্দ বা কল্পনার বিচারে এধরনের গতিমাত্রার কিছু মূল্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে এসব ক্ষেত্রে দর্শকমনের উপর ছবির প্রভাব সরাসরি কাট্-এর মতো কল্পনার পথে নয়, দর্শকের শারীরিক অনুভূতির দোলতে। সহজ করে বললে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়। ছবির যে গতির সঙ্গে তাল রেখে দর্শক কাহিনীকে অনুসরণ করেন সেটার মূলে দেহ, মন নয়। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে ক্যামেরাকে ঐভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সেটাই ব্যর্থ হল। ছবির কাহিনীর গতিমাত্রা প্রথমত নিরূপিত হয় ছবির কাঠামোতে। এই গতির মাত্রাবৃদ্ধিও নির্ভর করে ছবির গতির উপরে; কিন্তু যদি ক্যামেরাকেও ছবির গতির সঙ্গে সমতালে চালানো হয় তবে হয় গতি হ্রাস পাবে, নয় তো একেবারে লোপ পাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ছবিতে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অথবা দর্শকের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমতালে না চালালেও ক্যামেরার গতি ছবির রসসৃষ্টিতে সাহায্য করে কিনা। কেনই বা করবে না? যখনই কোনো পরিচালকের মনে সন্দেহ জাগে কিভাবে ক্যামেরা চালালে ভালো হবে—স্থির অবস্থায় না সচল অবস্থায়, তিনি তখন বিনা দ্বিধায় ক্যামেরাকে স্থির রেখে চালাতে পারেন।

সিনেমায় যাই কেন?

আমি কেন সিনেমায় যাই তার কারণ বলতে গেলে এক কথায় হয় না। যেমন ধরুন—যখন আমি নিজেকে ভুলে থাকতে চাই, যখন আমার চিত্তবিক্ষেপের প্রয়োজন হয় তখন আমি সিনেমা দেখতে যাই। যখন আর চিন্তা করতে ভালো লাগে না, কিংবা যখন চিন্তা করতেই ভালো লাগে, আর সেজন্য বাইরে থেকে খানিকটা উত্তেজনা প্রয়োজন হয়, তখনও সিনেমায় যাই। অনেক সময় যাই সুশ্রী চেহারার লোকজন দেখতে, জীবনেব অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখতে, প্রাণ খুলে হাসতে কিংবা দুঃখে উদ্বিগ্ন বোধ করতে। কখনো আবার এলোমেলো ব্যস্ত, বিশৃঙ্খল দিন কাটিয়ে দিনের শেষে অসম্ভব, অস্বাভাবিক সিনেমাব গল্পেও এক ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে। তা ছাড়া উজ্জ্বল আলো, হঠাৎ অন্ধকার, ঘটনার বেগ ইত্যাদি দেখতে ভালোবাসি আমি। সিনেমায় গিযে আমি আমেরিকা দেখি, ফ্রান্স দেখি, রাশিয়া দেখি। সিনেমার সাজানো কথাবার্তা শুনতে, মার্জিত আচার ব্যবহার দেখতে ভালো লাগে। অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা নিয়ে কাহিনীর দৃশ্য দেখতে ভালোবাসি বলে সিনেমায় যাই। কিংবা যাই অন্ধকারে ঘরভরা মানুষের মধ্যে বসে একই বিষয়ে শতশত লোকের সঙ্গে একত্র উদ্বেলিত হতে।..

—এলিজাবেথ বোএন

আমাদের দেশের অভিনেতাদের মঞ্চের প্রতি একটি বিশেষ পক্ষপাত আছে। বহু-কালের ঘনিষ্ঠতা তার একটি কারণ। সে ক্ষেত্রে ছবির অভিনয় আমরা দেখেছি চিনেছি অল্পকাল, ভালো করে তার প্রধান সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। বহু-বিখ্যাত ও কৃতিত্বসম্পন্ন মঞ্চ-অভিনেতারা তাই এমন কথাও বলেন, চিত্রে অভিনয় নাকি আসল অভিনয় নয়; পরিচালকদের হাতে থাকে প্রায় সব স্বাধীনতা, তাঁরা যা খুশি করেন। আর অভিনেতাও তাঁদেরই হাতের অনেকটা যন্ত্রের মতোই। কিন্তু এ তর্কে প্রবেশ করার আগে, মঞ্চ ও ছবি উভয়কেই অভিনব প্রমাণের ক্ষেত্র মেনে নিয়ে তারপর তাদের ব্যবধান বিচার কিছুটা সহজ হবে।

দেখা যাবে মঞ্চ বা ছবির অভিনয়ের বক্তব্য প্রধানত এক। শিল্পী বাস্তবকে বুঝে অর্থাৎ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তাঁর সমালোচনা সমেত বাস্তবকে আবার ফুটিয়ে তোলেন। একথা সব শিল্পেরই মুখ্য কথা, অভিনয়েরও কথা। আগে আসা যাক অভিনয়ের আঙ্গিকের বিষয়ে, যেখান থেকে মূল সমস্যাগুলির উদ্ভব। আঙ্গিক কি ও কেমন করে আসে? সমস্ত শিল্পে আঙ্গিক হচ্ছে এমন একটা উপায় যা সেই শিল্পকে প্রাণদান করে। অভিনয়ে বিশেষ বিশেষ আঙ্গিকগুলি মঞ্চের সহজাত বাধা অতিক্রম না করে শুধু অভিনয়কেই প্রকাশ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। মঞ্চ অভিনয়ের মস্ত বড় অসুবিধা এই যে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যে দূরত্ব সেটা পরিবর্তনীয় নয়, বরং স্থির। অল্প দূরত্বই তার পরিধি—প্রয়োজন হলেই অভিনেতা পারেন না দর্শকের শারীরিকভাবে অন্তরঙ্গতা পেতে, একেবারে নিকট-তম হতে। কিন্তু প্রত্যেক অভিনয়েই অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী উচ্চারণ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পিছনের শেষ দর্শকটি পর্যন্ত তা অনায়াসে পৌঁছুতে পারে। অভিনেতাকে তাই বাধ্য হয়ে স্বাভাবিকতাকে ভেঙে কৃত্রিমতার সাহায্য নিতে হয়। কানে কানে বলার যে কথা তার গোপনতাটুকু সভাময় বিস্তারিত করার জন্য অভিনেতাকে

কানের কাছে মুখ নিয়েও তারস্বরে উচ্চারণ করতে হয় অথবা বিস্ময় প্রকাশের জন্য যে সামান্য ভ্রূ তোলা তাও অনেকগুণ বড় করেই তাঁকে দেখাতে হয়। বহুকাল ধরে মঞ্চ তাই উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ রীতির জন্ম দিয়েছে। এরা অকারণে অথবা কারও খেয়ালে তৈরি হয়নি।

আজ সব দেশে বাস্তবধর্মী নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠছে, জীবনই বিষয়বস্তু শিল্পের। অর্থাৎ জীবনের যে সহজ গতি তাকেই রূপ দেবে শিল্প। অভিনয়েও এর জোয়ার লেগেছে। অভিনয়ে এই প্রগতিধারার বাহক হিসেবে আমরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রবর্তিত প্রকাশভঙ্গীকে মানতে পারি। অনেককাল সঞ্চিত মঞ্চের অপ্রয়োজনীয় স্তূপকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এঁরা বাস্তবকে রাতারাতি মঞ্চে তুলে এনে মঞ্চেও বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কিন্তু এখানেও ব্যক্ত করার রীতি উক্ত আঙ্গিকেরই মুখাপেক্ষী। উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গী, মঞ্চের ভারসাম্য রক্ষা সবই আগের কৃত্রিমতাকে মেনে নিয়েই রয়েছে। কারণ মঞ্চে এটা প্রয়োজন, এরই ভিতর দিয়ে বাস্তবকে তার রূপ দিতে হবে। আর এই রূপ দেবার উপায় আঙ্গিক।

কিন্তু চলচ্চিত্র এদিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, তার কর্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত। মঞ্চের মতো তিনদিকে ঘেরাটোপ লাগানো কাঠের কয়টি পাটাতনের উপর সমস্ত কিছুর কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। বিশ্বময় ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতা নিয়েই তার সৃষ্টি হয়েছে। ভারি আশ্চর্য, এই মুক্তি আর এই ব্যাপ্তি কেমন করে সে পেল! পেয়েছে দুটি যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে। একটি ক্যামেরা অর্থাৎ চিত্র-গ্রহণ যন্ত্র, সব জায়গায় গিয়ে সব কিছু ছবি নিজের বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারে। আর একটি শব্দ-ধারণ যন্ত্র; এরও শক্তি অসাধারণ। মঞ্চের দর্শককে কানের ও চোখের যে পরীক্ষা দিতে হত তার বদলে এরাই সে কাজগুলি সেরে শুধুই নাটকটি দর্শকদের উপহার দেবে। এরা যেখানে-সেখানে যাবার যে অবাধ স্পর্ধা রাখে, সেইটেই হল চিত্রের শক্তিশালী চিত্র-মাধ্যম হবার কারণ। দর্শক পরম সুখে দিব্যি বসে বসে নানান জায়গায় ছড়ানো ঘটনাবলীর গাঁথা মালা দেখে 'যাবেন। কত কষ্ট কমল!

মঞ্চের আঙ্গিকের জন্ম সেই দূরত্ব এবং কৃত্রিমতাকে কাজে লাগানোর সহজাত ধর্ম থেকে। চিত্রের আঙ্গিকের জন্ম খুঁজতে গেলে এ দুটি আশ্চর্য যন্ত্রকে কেন্দ্র করেই আমাদের সন্ধান চালাতে হবে।

মঞ্চের সেই দূরত্বের ব্যবধান আর রইল না। চিত্র-গ্রহণ যন্ত্র সামান্য ভ্রূ তোলাটাও কত কাছে এসে তুলে নিয়ে হাজার গুণ বড় করে দেখাবে। ফিসফিস করে যে কথা বলার সে কথা তেমনই বলা চলবে; শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম কান ঠিক খাড়া আছে, শুনবেই। কথা বলা বা হাত-পা নাড়া কিছুই বাড়িয়ে করবার দরকার নেই। স্বাভাবিকতাই আবার এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ মঞ্চ-প্রচলিত আঙ্গিককে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেও রূপ রসের সঞ্চার এখানে সম্ভব। আর তা না করে উপায় নেই। মঞ্চের কৃত্রিমতা এখানে অচল। আমাদের মন সে কৃত্রিমতা এখানে গ্রহণ করবে না।

কিন্তু মঞ্চে দর্শকের মন আলাদাভাবে প্রস্তুত থাকে। তিনি দিতেও যান, নিতেও যান। যেখানে যেটুকু কমতি তিনি সেটুকু তাঁর কল্পনা দিয়ে ভরে নিতে সব সময়েই রাজী। কিন্তু এমন কেন হয়? কারণ, মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা, পারিপার্শ্বিক সব কিছুই দর্শকের কাছে কল্পনা দাবি করে। তিনি কল্পনা করেন, অর্থাৎ নিজেও আরো কিছু সৃষ্টি করেন। একটা দোদুল্যমান পটকে কখনো শিবির, কখনো যুদ্ধক্ষেত্র আর কখনো রাজপ্রাসাদ ভাবতেও তাঁর কষ্ট হয় না। তা যদি হত তা হলে নাটকের গতি রুদ্ধ হত। একটু আগে যে কাঠের পাটাতনটি ছিল দিল্লীর প্রাসাদকক্ষ, পর্দা একবার পড়ে আবার উঠলে দেখি রাজপুতানার মরুভূমি। এখানে আমরা অর্থাৎ দর্শকরা এই সুবিধা দান করি মঞ্চকে। তাই গ্রহণে বাধা আসে না কখনো।

ছবির কথা ভিন্ন। মরুভূমি সেখানে পটের উপর তেল রঙ-এর পোঁচ নয়, প্রাসাদও পটের উপর আঁকা নয়। এসব ছাড়াও চিত্রযন্ত্রের চোখকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা কৌশল সব সময়েই ব্যবহৃত হচ্ছে, যাতে অস্বাভাবিক কিছুকেও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হতে পারে। পরিবেশ এখানে তাই বাস্তব ঘেঁষা। এতে বাস্তবের মায়া বা 'ইল্যুশন' বেশ জোরালো হয়। এখানে অতিরঞ্জিত কিছু রস সঞ্চার করে না বরং ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। মঞ্চের আঙ্গিক এখানে বোঝা। কিন্তু এখানে অভিনয় বহন করার বাহন কোথায়?

তাই এটাই অভিনেতার একমাত্র বিষয়। এই অভিব্যক্তির সাহায্যের জন্য কিছু আঙ্গিকের জন্ম মঞ্চ দিয়েছিল, কিন্তু চিত্রে তা অচল। তবু চিত্রে তো আঙ্গিক চাই! সে আঙ্গিক কোথায় খুঁজব? মঞ্চে যে চলাফেরায় বাধা নেই, এখানে যান্ত্রিক প্রয়োজনে তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু একদিকে যেমন এই সীমাবদ্ধতা অভিনেতার সমস্যা, আবার এর সমাধানের মধ্যেই নতুন আঙ্গিক আবিষ্কারের বীজ লুকানো আছে।

চিত্র-গ্রহণ যন্ত্রের লেন্স এবং ফোকাস-এর একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে, যার বাইরে অভিনেতা কখনো যেতে পারেন না। চিত্রগ্রহণ কক্ষের আলোকিত পরিধির মধ্যেই বিশেষ কতকগুলি স্থান অভিনেতার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর স্থান-বদল, যা-কিছু আগে থেকে নির্দেশ দেওয়া। অনেক মহড়ার ভিতর দিয়ে এগুলিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে তারপর চিত্র-গ্রহণের সময় তিনি অভিনয় করেন। শব্দের বেলাতেও ঠিক একই নিয়ম অর্থাৎ তিনি কখন ক'টি শব্দ ব্যবহার করবেন তাও আগেই ঠিক থাকে। মহড়াতে একটি পর্দা ঠিক করে নিয়ে তিনি সংলাপ বলেন। বাচন স্তরের সমতা ও মহড়ার কথা তাঁকে শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হয়।

এই যান্ত্রিক বাঁধাবাঁধি সব কিছুর প্রথম দিকে অভিনেতাকে বেশ বাধা দিতে থাকে। মহড়ার গতিবিধির কথা স্পষ্ট মনে করে করে অনুকরণ করতে অনেক অসুবিধা হয় তাঁর। চরিত্র ফোটানো বা আর কিছু করা তখন বেশ দূরের কথা; সম্মান ঠিক রেখে নিখুঁত চলাফেরার দিকে স্বভাবতই তাঁর ঝোঁক গিয়ে পড়ে।

কিন্তু এটা কষ্টের হলেও বাহ্যত কষ্টের। যে কেউ-ই একটু কষ্ট করে এই বাধাগুলি কাটিয়ে অভ্যাসের সাহায্যে নিজের আয়ত্তাধীনে আনতে পারেন; এবং প্রত্যেক অভিনেতাকেই তাই আনতে হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো শিল্পীরই সমস্যার বিষয় এগুলো হয় না। কিন্তু যান্ত্রিক প্রয়োজনে ছবি তোলার যে পদ্ধতি আজ স্টুডিওতে প্রচলিত, তাই থেকে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যাগুলিকে একে একে আনি। স্টুডিওতে দর্শক নেই। অভিনেতার প্রথম দর্শক দুটি ভ্রাম্যমান যন্ত্র যারা একান্ত বিশ্বাসে অভিনেতার অভিনয়কে গ্রহণ ও শ্রবণ করে। তারা অনুভব করে না, হৃদয় তাদের নেই। কিন্তু মঞ্চের অভিনেতার অভিনয় প্রথম দর্শকেরাই চরম স্থানে গ্রহণ করে; তার যথাযথ মূল্য নিরূপিত হয় তৎক্ষণাৎ। অভিনেতা তাঁর অভিব্যক্তির মজুরি পান সঙ্গে সঙ্গে। প্রেক্ষাগৃহের মিলিত অনুভব তিনিও অনুভব করেন, বোঝেন তাঁর অভিনয় সার্থকতায় পৌঁছল কিনা। দর্শকের উৎসাহ তাঁরও মনে সঞ্চারিত হয়, তাঁকে আরো কিছু দিতে প্রেরণা জাগায়। অভিনয়ে মনের এই আদান-প্রদানের প্রভাব অপরিমেয়। ছবি তোলার সময় প্রেরণার এ উৎস কোথায় থাকে? সেখানে অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয় ভবিষ্যতের হাজার জনের হাততালির অথবা আরো কিছুর কথা ভেবে। এই অদেখা হাজার জনকে তাঁর পক্ষে কল্পনা করে নিয়ে প্রেরণা পাওয়া বাস্তবিক কঠিন।

একটা সমাধান এর খুঁজে পাওয়া যায়। পরিচালক নিজে অনেক দর্শকের হয়ে অভিনয়ে অভিনেতাকে প্রেরণা দিতে পারেন। অভিনয়কে ভালো করে অনুধাবন করে, বিশ্লেষণ করে অভিনেতাকে তিনি উৎসাহিত করতে পারেন। বুঝিয়ে শ্রোতার সামনে যেমন গানের গলা খুলে যায়, বুঝিয়ে দর্শক পেয়ে অভিনেতার মনও তেমনই পাখা বিস্তার করে। অভিনয়ের তারিফ (অভিনেতার নয়) অভিনয়কেই এগিয়ে দেয়।

স্টুডিওর পদ্ধতি কতটুকু অভিনয়কে ব্যাহত করে?

চিত্র-গ্রহণেরও একটি পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি হচ্ছে, একই স্থানে অবস্থিত বহু জিনিসের মধ্যে যন্ত্রটি বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপর দৃষ্টি ফেলে। দৃশ্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে শুধু প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই পর্দায় প্রতিফলিত কবে। চিত্রেব কাহিনী বলার আঙ্গিকের মধ্যেও এটা পড়ে। ধরুন, একটা দৃশ্যে কোনো একটি বক্তৃতায় কোনো একজন বক্তাকে দেখা যাচ্ছে বক্তৃতা করতে; মাঠে জনতা জমায়েত হয়েছে। প্রথমে গোটা দৃশ্যটাকে দেখিয়ে নেওয়া হল। তার পর শুধুই বক্তাকে আমরা দেখলুম, হাত নেড়ে নেড়ে বলে যাচ্ছেন, পরে দেখলুম জনতা উদ্বেল হয়ে উঠেছে বক্তৃতা শুনে। আবার বক্তাকে দেখা গেল, হাত নামিয়ে চুপ করে আছেন; মিলিত কণ্ঠস্বরের উৎসাহধ্বনি তাঁকে স্পর্শ করেছে। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথম ও তৃতীয় ছবিটি নেয়া ফাঁকা মাঠে। বহুদিন পরে হয়তো স্টুডিওর অভ্যন্তরে বাকি ছবি দুটি নেয়া। একটা অসুবিধা, অভিনেতাকে এইখানে কল্পনা করে নিতে হয় আগেকার সেই আনন্দের স্মৃতিটি, কানেও শুনতে হয় অসংখ্য জনতার উল্লাস; কিন্তু তিনি বাস্তবিক

দেখবেন কয়েকটি আলো, কয়েকজন কর্মী আর বন্ধ একটি ঘরে তিনি হাঁটাচলা করবেন।

অথবা, কোনো দৃশ্যে অভিনেতা উদ্বিগ্নভাবে কারও জন্যে একটি ঘরে অপেক্ষা করছেন, হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এল গাড়ি থামার শব্দ; তিনি উদগ্রীব হয়ে জানালায় এলেন। মুখে হাসি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি, যেন বাইরের আগন্তককে অভ্যর্থনা করার জন্যই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছবি তোলার সময় গাড়ির শব্দ হয়নি, বাইরে তিনি কিছুই দেখেননি। অর্থাৎ অভিনেতাকে সব কিছুই কল্পনা করে নিতে হয়েছে। এবং বহু পরে ছবি গ্রহণেরও শেষে, সম্পাদনা কক্ষে ছবিটির সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শব্দ জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত স্টুডিওতে প্রতিদিনই ঘটছে, প্রতি ক্ষেত্রেই এই কল্পনা করে নেবার বিশেষ চাপ আসে অভিনেতার উপর।

পদ্ধতির প্রয়োজন ছাড়াও অভিনেতাকে আরো কল্পনা করতে হয়। যে নাটকটি চিত্রে অভিনীত হবে এবং যে চরিত্রটি তিনি অভিনয় করবেন, সেটি বিশেষভাবে পড়ে, নানান অবস্থায় চরিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাত্ম হতে হয়েছে। বহুবার পড়ে দেখার পর তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। চরিত্রটিকে নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে মিলিয়ে তার পরে তফাত করে সম্পূর্ণ গঠন করতে হয়েছে তাঁকে মনের মধ্যে। মঞ্চেও কিছু পরিমাণে তাঁকে এসব করতে হত, চিত্র-মঞ্চেও হয়েছে। কিন্তু মঞ্চে পটভূমির পরিবর্তনে অসুবিধা থাকায় স্থান ও কালের পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ চরিত্রটিকে বাস্তবিক বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় না। চিত্রে সহজেই স্থান-কাল বদলানো যায়, অনেক বড় এর পরিধি, অনেক বেশি ঘটনাস্রোত স্বাভাবিক-ভাবেই এর মধ্যে স্থান পেতে পারে। ফলে, চরিত্রটি অনেক বৈচিত্র্যময় প্রবাহে পড়ে, অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণতার পথে সহজ হতে পারে। এই জন্য অভিনেতাকে গভীর চিন্তা করতে হয়েছে, তলিয়ে যেতে হয়েছে নাটকটির হৃদয়ে। মঞ্চের কিছু শিক্ষা এই ক্ষেত্রে কিছু সাহায্য করতে পারে অভিনেতাকে।

কল্পনাকে বেঁধে নিতে, চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে, স্বাভাবিক গতি দিতে সাহায্য করে মহড়া। ছবিতে অভিনয় করার সময়ে অনেক মহড়ার সাহায্য অভিনেতার লক্ষ্যকে কতখানি সাহায্য করে সে হিসেব দেওয়া কঠিন। মঞ্চের অভিনেতাকে এক-টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে চরিত্রকে বিকাশের পথে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তা ছাড়া প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে ছড়িয়ে দেবার অবকাশ তিনি পান। আজ যে অংশের অভিনয় তাঁর মনঃপূত হয়নি, কাল তা শোধরাতে পারেন। ছবিতে কিন্তু এ সুযোগ নেই। আজ যে অভিনয়ের ছবি গৃহীত হল, অভিনেতার অভিনয়ে অসম্পূর্ণতা থাকলে সে অংশের ছবি আবারও তুলতে হবে; আর যে ছবিতে তাঁর অভিনয় তোলা হল, তাকে আর ইচ্ছে করেও বদলাতে পারবেন না তিনি; তা চিরকালের জন্যই গৃহীত হয়ে গেল। কাজেই, সম্পূর্ণ অভিনয়টি তৈরি করেই তবে চিত্র-গ্রহণ যন্ত্রের মুখোমুখি

দাঁড়াতে হবে তাঁকে। আরো, মঞ্চের মতো এখানে চরিত্র ধারাবাহিকভাবে এগোতে পারে না। চিত্র গ্রহণের সুবিধা মতো আজ হয়তো মৃত্যুর দৃশ্যটি তোলা হল, কাল অসুখের, পরশু বিয়ের ইত্যাদি; এরকম সর্বদাই হচ্ছে। মঞ্চে এটা নেই। চরিত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে ফুটিয়ে তোলার অভাব তিনি সর্বক্ষণ অনুভব করেন। তাঁকে তাই আরো পটু হতে হয় অভিনয়ে, সমগ্র ঘটনাটিতে নিজেকে মিশিয়ে রাখতে হয় সর্বদা এবং তখনই তার যে কোনো অংশের অভিনয়েই তিনি নিজেকে সহজ বোধ করেন। অভিনয়টি এবং চরিত্রটি সম্পর্কে তাই স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার অভিনেতার। আর এজন্যই অনেক মহড়া তাঁকে সাহায্য করবে। যেমন, আজ কোনো একটি অংশের ছবি তোলা হল, সাতদিন পরে সেই অংশেরই শেষটুকু তোলা হবে; আজকের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাগুলিকে সাতদিনের জন্য বিশ্রাম দিতে হবে। সাতদিন পরে যাতে আবার তিনি সেই অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন এইজন্য ধারারক্ষীর কাজ চিত্র পরিচালক করলেও অভিনেতার দায়িত্বই সবটুকু। মনের এই স্যুইচিং অফ্ আর অন্ করবার অভ্যাস একমাত্র বারবার মহড়া থেকেই আসে।

অধুনা, কোনো একজন বিখ্যাত এবং চিন্তাশীল বিদেশী পরিচালকের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তিনি ধারাবাহিকতার অভাবকে ছবির অভিনয়ে অন্যতম বাধা মেনে নিয়েও চিত্র-গ্রহণ পদ্ধতির অনেকগুলি সুবিধার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, একজন অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের চরিত্রটির মধ্যে ডুবে থাকেন অনেককাল ধরে, তিনি আরো সুবিধা পান চরিত্রের উপরে যা-কিছু পড়াশুনো করবার, ভাবার ও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেবার। মঞ্চের থেকেও ছবির এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি সময় তিনি পান। কোনো চিত্র-গ্রহণের দিনে অভিনেতা ব্যস্ত থাকেন আটঘণ্টা। সারাদিন তিনি তাঁর অভিনয়ের চরিত্রটির পোশাকে ঘুরে বেড়ান, একেবারে বাস্তবের অনুরূপ দৃশ্যসজ্জার ভিতরে বাস করতে হয় তাঁকে। তাঁর কল্পনাকে খোরাক দিতে থাকে এসব, তাই তাঁর অভিনয় আরো উন্নত হতে পারে।

এভাবে ধারাবাহিকভাবে চরিত্র ফোটানোর অভাববোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কি রকম, আর দীর্ঘ সময় নিয়ে চিত্র-গ্রহণের পদ্ধতির কেবল ভালোটুকু দেখা বৈজ্ঞানিক কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। সোজা মহড়ার পথে চরিত্র বিশ্লেষণে না গিয়ে কেবল চিন্তার ভিতর দিয়ে অভিনয়ে উন্নতি হবে এটা খুব গোছানো কথা নয়। তার পরে, বহু সপ্তাহ ধরে একই অবস্থায় ডুবে থাকা একজন অভিনেতার পক্ষে বাস্তবিক জীবনে কতখানি সম্ভব তাও বিচার করা উচিত। মঞ্চে তিন ঘণ্টার জন্য হলেও ধারাবাহিকভাবেই অভিনেতা পরিণতিতে আসেন—সেখানে তাঁর নিজস্ব সত্তাও ওই কিছুক্ষণ ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু ছবিতে অভিনয় একদিনে কিছুক্ষণের জন্য নয়, এখানে পোশাকের মতোই তিনি ব্যবহার করেন চরিত্রটিকে। স্টুডিওতে ঢুকে অভিনয়ে নামার সময়ে চরিত্রটিকে পরিধান করেন, আবার স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে ফেলে আসেন। আরো, বহু সপ্তাহে তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনেও ঘাতপ্রতিঘাত আছে, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁকেও পার হতে হয়। অর্থাৎ তাঁর চিন্তাধারাকে এককেন্দ্রিক করবার অন্তরায় থাকে অনেক। বরং মঞ্চে সুবিধা একটু আছে। সেখানে পর পর কয়েক রাত্রি একই ঘটনার মধ্যে তাঁর গতিবিধি থাকায় প্রতিদিনই নতুন কিছু চিন্তার খোরাক তিনি পান। ছবিতে এ সুবিধা নেই। ধরুন, একদিনে যে আটঘণ্টা অভিনেতা কাজ করবেন, স্টুডিওর আবহাওয়ায় তিনি ঐ কয়েকঘণ্টাও নিরবচ্ছিন্ন তাঁর কাজে ডুবে থাকতে পারবেন না। চারদিকে যান্ত্রিক গোলমাল আছে, খাওয়ার ছুটি আছে, চিৎকার, নানান আলোচনা ইত্যাদি (তিনি অভিনয়ে চরিত্রের পোশাক পরে বাস্তব ঘেঁষা দৃশ্যসজ্জার মধ্যে ঘুরলেও) তাঁর কাজে বাধা দেবে। কিন্তু অনেক মহড়ার গুণ এই, বাস্তবিক এত গোলমালের মাঝেও তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, অনেকবার আবৃত্তির মতো সহজ হয়ে আসে চরিত্রটি। তাই মহড়াই অভিনেতার কাছে তখন একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হবে। ছবিতে এই মহড়ার প্রয়োজন অনেক বেশি।

চিত্রশিল্প স্বভাবতই যৌথশিল্প। ব্যক্তিগতভাবে পরিচালকের দায়িত্ব থাকলেও অনেক কর্মীর অনেক কাজের যোগফল এ শিল্পে। কিন্তু এই নানান কর্মীর কাজের অংশগুলিকে গুছিয়ে দেবার শেষ দায়িত্ব পরিচালকের। চিত্র শিল্পের জন্মেরও আগে এই যৌথ সৃষ্টির ভালো উদাহরণ ছিল মঞ্চ। মঞ্চেও অভিনেতাকে লেখকের বন্ধনী আঁকা গণ্ডিতেই থাকতে হয়, প্রযোজক অনেক পরিমাণে তা ঠিক করে দেন। অভিনেতাকে মঞ্চে একটা নির্দিষ্ট নক্সায় নড়াচড়া করতে হয়, সমস্ত নাটকটির অর্থ পরিস্ফুট করবার জন্যই। সহ-অভিনেতার সঙ্গে থাকার সময়েও তাঁকে মঞ্চের ভারসাম্যের কথা মনে রাখতে হয়।

ছবিতেও পরিচালকেরই নির্দেশ মতো চলতে ফিরতে হয় অভিনেতাকে। পরিচালকের চরিত্র ব্যাখ্যা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত তিনি জানবেন না অভিনয়ের কতটুকু অংশ শেষ পর্যন্ত ছবিতে থাকবে আর কতটুকু বাদ দেবেন সম্পাদক-কক্ষ কাঁচি চালিয়ে। অনেক অভিনেতা বলেন, এখানে তিনি গোটা ছবির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হন পরিচালকের হাতে।

আবার পরিচালক বহুক্ষেত্রেই সিম্বল বা দ্যোতক ব্যবহার করেন। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর কাছে অভিনেতা ছাড়াও আরো উপাদান আছে। তাদের ব্যবহার ছবিটির পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই মূল্যবান। অভিনেতার অভিনয়কেও নানাভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই প্রয়োগের পদ্ধতিতে অভিনেতার অনেক কাজ কমে যায়। কিন্তু যৌথশিল্পে এরকম বিচার চলে না।

অভিনেতার কাজের অংশগুলি অর্থাৎ অভিনয়ের ছবিগুলি সম্পাদনা-ঘরে চলে যায়, সম্পাদক ও পরিচালক পরামর্শ করে কিছু বাদ দিয়ে কিছু রেখে অর্থাৎ কোন অংশ ভালো হয়েছে, কোন অংশ থাকবে, থাকবে না ইত্যাদি ঠিক করেন। এতে

অভিনয়ের মান অনেকখানি নির্ভর করে তাঁদেরই উপর। কাজেই দেখা যায়, সম্পাদনা-কক্ষেই অভিনয়ের আরো একটা জন্ম হয়। যদিও অভিনেতার কাজ স্টুডিওতেই আরম্ভ ও শেষ। এতে সম্পাদকের বিচার ও পরিচালকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে সব কিছু শেষ পর্যন্ত।

সম্পাদককে আমরা তা হলে ধরে নিতে পারি, চিত্র মাধ্যমে অভিনয়কে দর্শকমনে সঞ্চারিত করে দেবার একটা আঙ্গিক হিসেবে। মঞ্চে এ আঙ্গিককে অভিনেতা নিজেই ব্যবহার করবেন। ছবিতে এ ব্যবহারকে ছাড়তে হয়েছে। এর স্থান গ্রহণ করেছে সম্পাদনা-কক্ষ।

এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনেতার সমস্ত কাজকে নির্ধারিত করা হয় বলেই একটা ধারণা অনেকেরই আছে যে, ছবিতে অভিনয় আসল অভিনয়ই নয়। অভিনেতার অভিনয়কে না বোঝাই বোধহয় এ ধারণার একমাত্র কারণ। এটা ঠিক, নতুন মাধ্যমে কোনো কিছু করতে যাওয়াতে প্রথমে অপবাদ আসে। লুমিয়ের-এর চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর কোনো ফরাসী চিত্রকর বলেছিলেন, 'এ হচ্ছে ছেলে ভোলানো খেলনা।' চলচ্চিত্র যে কোনো দিন শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের মতোই আশ্চর্য 'কম্পোজিশন' আর মধুর ভাব প্রকাশের বাহন হতে পারে একথাকে অনেকের মতোই তিনিও হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি প্রমাণ করেছে (অদূর ভবিষ্যতে আরো করবে) আর্টের রাজ্যে ফিল্ম কি করতে পারে।

পুরনো মতে বিশ্বাসী, জীবনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু লোক আছেন, তাঁরা অভিনয়েরও পরিবর্তনের কথা ভাবেন না বা ভাবতে পারেন না। সকলের সঙ্গে একত্রে কিছু সৃষ্টি—এ তাঁরা তাই আয়ত্তে আনতে পারেন না। কিন্তু ছবিকে আরো এগিয়ে নিতে হলে একথা সকলের মতোই অভিনেতাকেও মানতে হবে। ছবি তৈরির সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যৌথশিল্পের এই পদ্ধতি।

চিত্রের আঙ্গিক সম্পাদনা, এ ধারণা পুরনো দিনের; অভিনেতার অভিনযকে কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করে পরিচালক ও সম্পাদকের অভিনয়বোধ দেখানো যাবে এ মতেরও পরিবর্তন তাই দরকার। যৌথশিল্পের সবচেয়ে বড় কথা সমবেত দৃষ্টিভঙ্গী: সকলের মধ্যেই এ চেষ্টা থাকা দরকার। অভিনেতারও এই দাবি হোক। প্রচলিত আঙ্গিক অভিনেতার কাছ থেকে তাঁর ক্ষেত্রকে কেড়ে নিয়েছে, তাঁর কাছে এই দাবিই অভিনয়কে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার উপায় বা পথ। সম্পাদনার বিভিন্ন পদ্ধতি জানা যেমন পরিচালকের দরকার তেমনই অভিনেতারও প্রয়োজন অভিনয় ছাড়া সম্পাদনা, পরিচালনা ইত্যাদি ভালো করে শেখা। যাতে তিনিও সক্রিয়-ভাবে সকলকেই কাজে সাহায্য করতে পারেন। এ সিদ্ধান্ত অবাস্তব কিছু নয় কাজে লাগালে পরিচালকও লাভবান হবেন।

মঞ্চে যা ছিল সহজ ও একান্ত ব্যক্তিগত কাজ, সমবায় আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য তা অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে, আর কাজও জটিল হয়ে উঠেছে। অথচ

ছবির উদ্দেশ্য কোথাও খর্ব করছে না বরং উদ্দেশ্য আরো সফলতা লাভ করতে পারে এ পথে। কিন্তু অভিনেতার একমাত্র বাহন চরিত্র বিকাশের জন্য থাকবে তাঁর অভিনয়। শক্তিশালী অভিনেতা দরকার আজ তাই অভিনয় ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছবির অভিনয় ক্ষেত্রে।

অভিনেতাকে চিত্রনাট্য রচনার শেষে আসতে হবে প্রত্যহ মহড়ায়। দিনের পর দিন মহড়ার ভিতর দিয়ে আরো পরিষ্কার করতে হবে অভিনয়কে, আবার সম্পাদক ও পরিচালকের পাশে থেকে তাঁকেও কাজে সাহায্য করতে হবে। শুধু অভিনয়ই নয়, সব কাজই অভিনেতাকে জানতে বুঝতে হবে ও সকলকেই সাহায্য করতে হবে। আর এই সমবেত চেষ্টার সঙ্গমেই আছে ভালো ছবি গড়ে ওঠার পথ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'চলচ্চিত্র প্রকাশেব ব্যাপারে বহু সহৃদয় ব্যক্তি আর কিছু প্রতিষ্ঠান আমাদের সহায়তা করেছেন। 'নিবারণবাবুর সমস্যা' প্রবন্ধ রচনায় বি-এম-পি-এ পত্রিকা প্রভৃত ব্যবহার করা হয়েছে। এবিষযে বাংলা সিনেমাক্ষেত্রে খ্যাতনামা শ্রীশিশির মল্লিক মহাশয়ের সহযোগিতার জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ।

'চলচ্চিত্রে স্মরণীয় · যোশেফ ফন স্টার্নবার্গ' প্রবন্ধের সঙ্গে মার্লিন ডিট্রিশ-এর অভিনয় থেকে ধারাবাহিক ভাবে যে ছবিগুলি প্রকাশিত হল, সেগুলি সংগ্রহ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। প্রথমে স্থানীয় প্যারামাউণ্টে খোঁজ করা হয়। পরে হলিউড-প্যারামাউণ্টে। এ'রা স্টার্নবার্গ-ডিট্রিশ-এর ছখানা চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন একসময়। কিন্তু এ'রা কেউই ছবি দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ছবিগুলি পাওয়া গেছে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট থেকে। চলচ্চিত্র বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে এই প্রতিষ্ঠান অদ্বিতীয়। ছবিগুলির জন্য এ'দের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করি।

দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিসংগ্রহে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী বেগম পারা, শ্রীহরিসাধন দাশগুপ্ত, শ্রীসরোজ মিত্র, ও শ্রীবেণী ঘোষ। এ'রা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন॥

পশ্চিম ভারতের অভিনেত্রী

দক্ষিণ রায়

চিরকালই দেখা গেছে যে বিখ্যাতদের মধ্যে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা তাঁরাই সহজে পেয়েছেন যাঁরা লোকের অবসর মুহূর্তে আনন্দ দিয়েছেন, আর সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের দুঃখকষ্ট ভোলাতে পেরেছেন। লেখক আর শিল্পী, নট-নটী আর ক্রীড়াকুশলী—এ'দের এই শ্রেণীতে রাখা যায়। এ'দের মধ্যে লেখক বা শিল্পীর গৌরব পেতে সময় লাগে প্রচুর, আর তাঁদের ভক্তমণ্ডলীও কখনোই অগণ্যের কোঠায় গিয়ে পে'ছয় না। নট-নটী আর ক্রীড়াকুশলীরা কিন্তু অগণ্য মানুষের মন জয় করেন তাঁদের জীবনের শুরুতেই। সেকালে তাঁদের খ্যাতির পাশে এমন কি রাজা-রাজড়া বীরপুরুষেরাও নিষ্প্রভ হয়ে যেতেন। তবে লেখকের রচনা কবির গান আর শিল্পীর আঁকা ছবি তাঁদের মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। মৃত্যুর পরে হলেও তাঁদের যশ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নট-নটীদের কথা মানুষ সেই মুহূর্তে ভুলে যায় যে মুহূর্তে শেষ হয় তাঁদের চাতুর্য আর কলানৈপুণ্য, যে মুহূর্তে তাঁরা বিদায় নেন মঞ্চ আর প্রাঙ্গণ থেকে।

আগের মতোই এখনো অবশ্য মঞ্চের নট-নটী আর ক্রীড়াপটুদের খ্যাতি সাধারণত একটা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আটকে থাকে। খবরের কাগজ এবং আরো নানা উপায়ে তাঁদের নাম-ধাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লেও তাঁদের আসল পরিচয় আর আসল রূপটি তাঁরাই জানতে পারেন এ'দের কলানৈপুণ্যের সঙ্গে যাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে। কিন্তু তার মধ্যেই প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন এনেছে চলচ্চিত্র। শিল্পীকে শারীরিক সংকীর্ণতা থেকে অনেক পরিমাণে চলচ্চিত্র মুক্তি দিয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর শিল্প-চাতুর্যের নিদর্শন এখন আর তাঁদের শারীরিক উপস্থিতির উপরে নির্ভরশীল নেই। সমস্ত পৃথিবীই এখন তাঁদের রঙ্গমঞ্চ। চলচ্চিত্র-তারকাদের আজ তাই যেরকম বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তা মানুষের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আগেকার দিনের কোনো অসামান্য অভিনেতার পক্ষেও

চ্যাপলিনের যশ আর প্রতিপত্তির একশোভাগের একভাগ পাওয়া সম্ভব হয়নি। কোনো অনিন্দ্যকান্তি উর্বশীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না মেরী পিকফোর্ড বা গার্বোর মতো সর্বজনের মনোহরণ করা, অশ্বমেধ করেও মিকি মাউসের মতো দিগ্বিজয়ী হতে পারত না কেউ। আর তা ছাড়া যশোৎকর্ষে উত্তীর্ণ হলে চলচ্চিত্র এখন অভিনয়কে রীতিমতো কালজয়ী করতে পারে, যা কেউ কল্পনাই করতে পারত না আগেকার দিনে।

একবার এক ইংরেজ সমালোচক লিখেছিলেন যে সেকালের কোনো মানুষ যদি আজকের কোনো প্রেক্ষাগৃহের সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলে ভাববে এ বুঝি আমাদের যুগের দেবমন্দির। দেবমন্দির না হলেও প্রেক্ষাগৃহ যে আমাদের যুগের নাটমন্দির তাতে সন্দেহ নেই। বারো মাস, ত্রিশ দিন এগুলির সামনে রথের মেলা লেগে আছে—ঝড়-বাদল মাথায় করে কাতারে কাতারে দর্শনার্থী তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রণামী দিয়ে প্রবেশের আশায়। আর সব দেশের মতো আজ আমাদের দেশেও শহরে শহরে, গ্রামে বাজারে সব জায়গাতেই যাত্রা-অপেরার জায়গা নিয়েছে চলচ্চিত্র। লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ফিল্ম দেখাটা একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পরিবেশের গ্লানি থেকে মানুষকে কিছুক্ষণের মুক্তি দিতে, চিন্তাক্লিষ্ট মনকে হাল্কা করতে চলচ্চিত্রের মতো আর কিছু নেই। তাই আর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও চলচ্চিত্র তারকারা যে জনসাধারণের সবচেয়ে পরিচিত ও প্রিয়জন হবেন তা আর বিচিত্র কি।

সুরাইয়া আর নার্গিস, কামিনীকৌশল ও মধুবালা, গীতাবলী ও রেহানা, প্রতিমা দাশগুপ্তা ও বেগম পারা—এঁদের কথাই ধরা যাক। শ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেত্রীদের মতো বোম্বাই চলচ্চিত্র-জগতের এঁরা বিশ্বব্যাপী খ্যাতিবান না হলেও আমাদের দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে লোকে আজ এঁদের এক ডাকে চেনে। এঁদের খ্যাতির এহেন বিস্তার খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, কারণ মাত্র কয়েকটি বড় শহর ছাড়া আমাদের দেশে এখনো বিজ্ঞাপনের জোরে চিত্র-তারকাদের সুপরিচিত করে তোলা সম্ভব নয়।

অন্যান্য দেশে, বিশেষত আমেরিকায়, ছবির বনিকেরা অজস্র উপায়ে তাঁদের বিশেষ বিশেষ অভিনেত্রীর নাম সব সময়েই লোকের চোখের সামনে ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন। কারণ লোকে তাঁদের ভুলে গেলে অতি বড় সুন্দরী অভিনেত্রীরও হাসিতে মানিক আর কান্নায় মুক্তো ঝরবে না একথা তাঁরা ভালো ভাবেই জানেন। পর্দার ছায়ায় যাঁদের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঘটে, বাস্তব জীবনে সে মানুষগুলি কেমন—এটা জানবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। লোকের এই কৌতূহলের পূর্ণ সুযোগ ছবি-ব্যবসায়ীরা নিয়ে থাকেন। তাই সকালবেলাকার কাগজে কাগজে চলচ্চিত্র তারকাদের বিজ্ঞাপন ছাড়াও তাদের ডিভোর্সের খবর দুনিয়ার বড় বড় সব ঘটনাকে সরিয়ে দিয়েও ছাপানো হয় সামনের পাতায়, রেডিওতে ভেসে আসে তাঁদের কথা

কাহিনী, অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে তাঁদের নাম জ্বলে, তাঁদের সাত-রঙা ছবি লক্ষ লক্ষ আলোর মালায় শহরের মোড়ে মোড়ে ঝলমল করে। এ ছাড়া তাঁদের হাতে হাজার হাজার পত্রিকা আছে যেগুলির একমাত্র কাজ হচ্ছে ঢাকঢোল আর গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে এই সব তারকাদের বিষয়ে সত্য মিথ্যা অজস্র কাহিনী আর তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি অসংখ্য খবর প্রচার করা। কোন চলচ্চিত্র তারকা পুডিং-এ নুন দেন, কালচে-লাল গোলাপ কার প্রিয় ফুল, কালকের পার্টিতে হঠাৎ অমন চটুল কথাটি কে বলে বাহবা পেলেন, কাকে কার সঙ্গে গোপনে নিভৃতে অহরহ আজকাল দেখা যাচ্ছে, বেড়াল দেখলে কোন সুন্দরীর সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যায়—এই ধরনের অহেতুক খবর দিবারাত্র শোনানো হয় লক্ষ লক্ষ লোককে। আর এইভাবেই চিত্র-তারকাদের প্রতিকৃতি আর নাম লোকের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। ও দেশের বহু অভিনেত্রীর খ্যাতির মূলে অভিনয়-কুশলতার চেয়ে এই কারণগুলিই বড়। অন্যপক্ষে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীদের পক্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করতে হলে তাঁদের কলা-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ওপরে যাঁদের নাম করা হয়েছে তাঁদের ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই কথাটা সত্যি।

নার্গিস, সুরাইয়া, গীতাবলী, কামিনীকৌশল, মধুবালা, রেহানা, প্রতিমা দাশগুপ্তা, বেগম পারা—ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা কে, কি ধরনের লোক, সে বিষয়ে কিছু বলার আগে বিদেশী অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় ব্যাপারে এঁদের কোথায় তফাত, তা বলে নেওয়া দরকার। বিদেশীয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে ফেলা যায়। একদলে পড়েন তাঁরা যাঁদের অভিনয়-শক্তি যথার্থই অনস্বীকার্য, অন্যদলে তাঁরা যাঁদের মধ্যে কেউ ভালো গায়িকা, কেউ ভালো নাচেন, আবার কারো সবচেয়ে বড় মূলধন হল তাঁদের নিরাবরণ দেহ-সৌষ্ঠব—অর্থাৎ যাঁরা 'গ্ল্যামার গার্লস' বলে সুপরিচিত। এঁদের চারপাশে আবার থাকেন এমন সব কর্ম-কুশলী লোক যাঁরা এঁদের জ্যোতিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করেন। ভালো অভিনেত্রীর জন্য কাহিনীকার সুসংবদ্ধ চিত্রনাট্য লেখেন, দক্ষ পরিচালক সহায়তা করেন তাঁদের অভিব্যক্তির সুনিপুণ ব্যঞ্জনার আর সেই অভিনয় রস-ঘন করে তোলেন সঙ্গীতকার তাঁর আবহ-সঙ্গীত সহযোগিতায়। তা ছাড়া প্রত্যেক অভিনেত্রীর স্বাভাবিক চেহারাকে আরো সুন্দর করে তোলা হয় নানাবিধ ছলাকলার সাহায্যে। সজ্জাকার দেখেন কাকে কি এবং কতখানি বেশভূষা পরালে কিংবা না পরালে ভালো মানাবে; মেক-আপের লোক মুখ-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন রঙের সুচতুর প্রয়োগে আর পরিপাটি কেশ-বিন্যাসে; ক্যামেরাম্যান এমনভাবে ছবি তোলেন যাতে চিত্রপটেও দেহের মনোরম বন্ধুরতা ও মুখশ্রীর সবটুকুই বজায় থাকে।

এদেশে বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে এখনো কোনো 'শ্রম'-বিভাগ নেই—তাঁরা একাধারে অভিনেত্রী, নর্তকী, গায়িকা আর 'গ্ল্যামার গার্ল'। এঁদের তাই বিদেশী তারকাদের চেয়েও আনুষঙ্গিক কর্মকুশলী শিল্পীদের দক্ষ সহায়তার বেশি দরকার।

ফটো : স্টুডিও এভারেস্ট

কমল মিত্র

বিকাশ রায় ও নীলিমা দাস
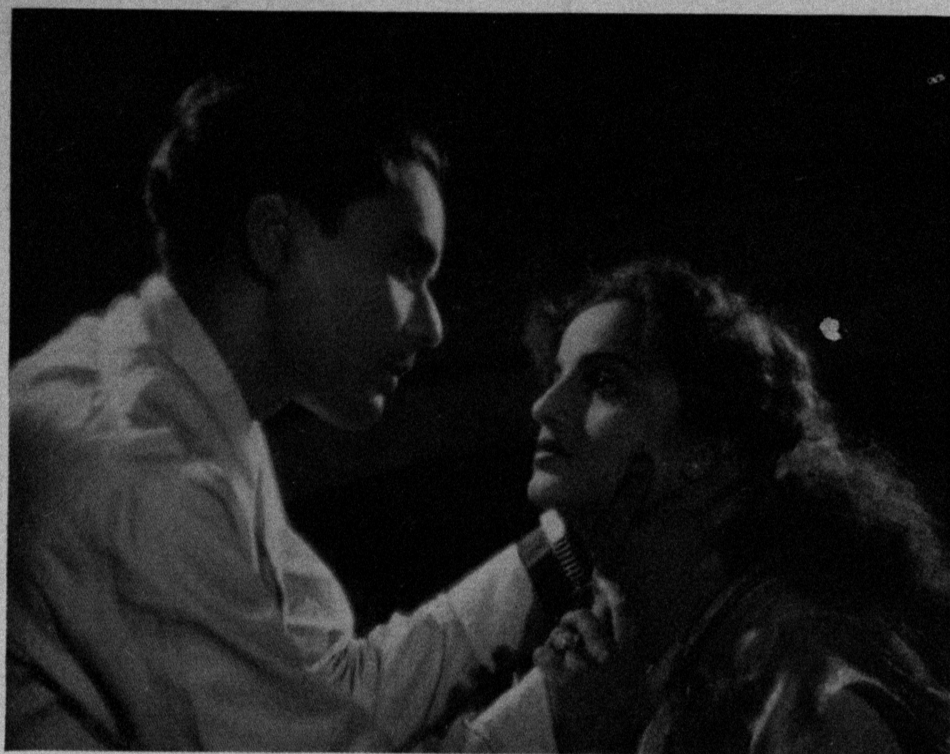
বিকাশ রায় ও শিপ্রা দেবী

শ্রীএম জি পিকচার্সের 'কুলহারা'
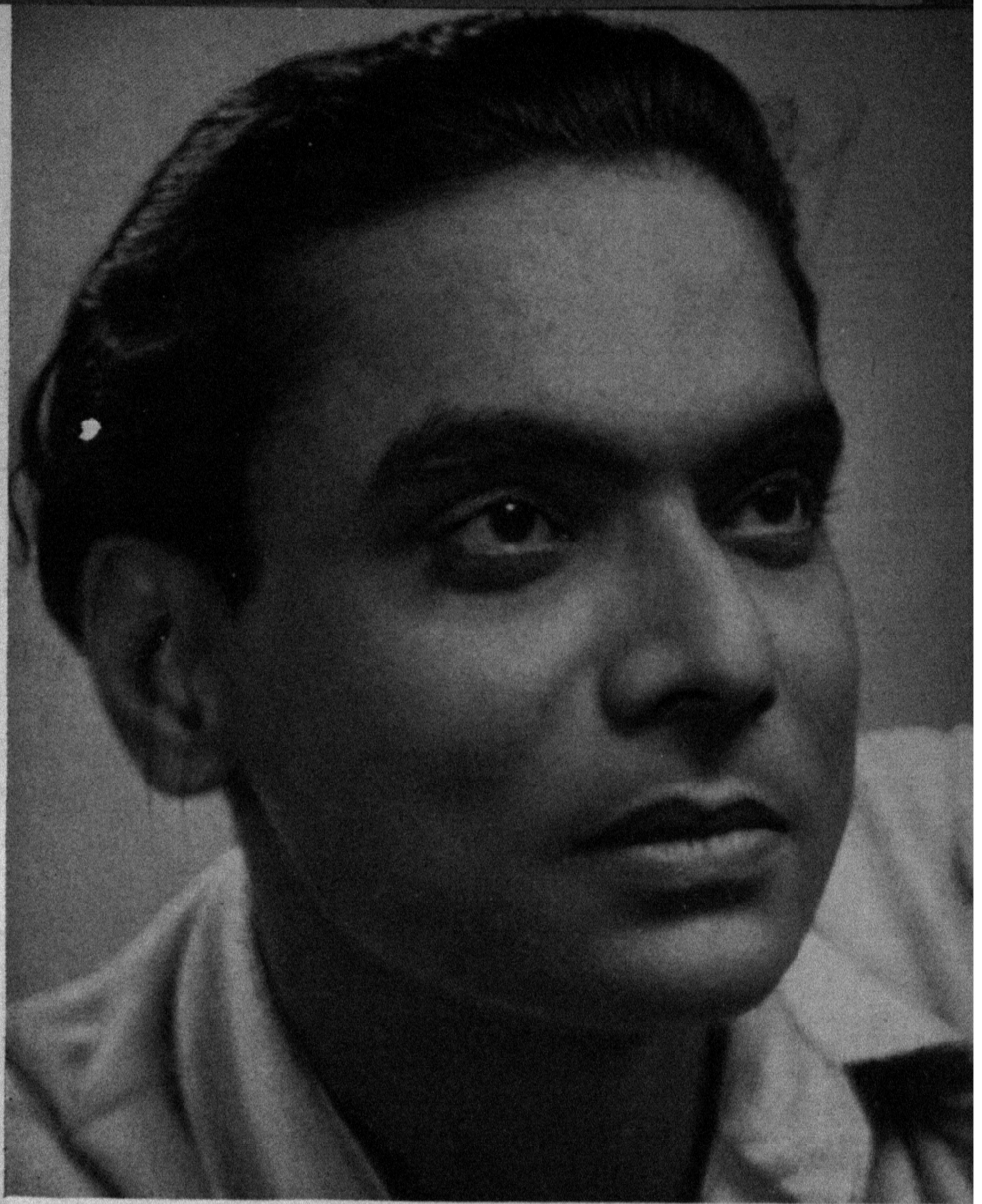
ফটো : সুনীল জানা

বিকাশ রায়
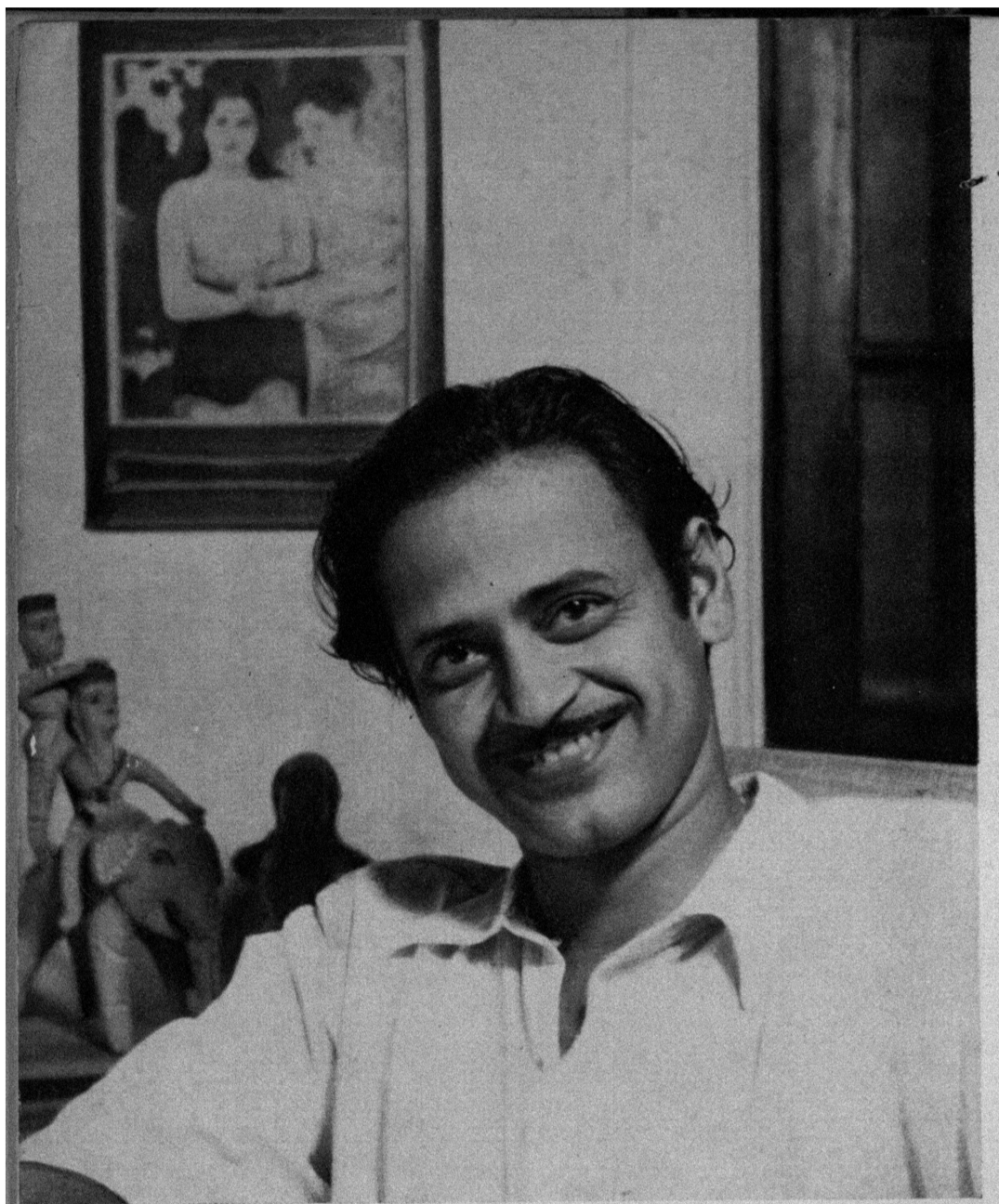
অভি ভট্টাচার্য

ফটো : গোপাল সান্যাল

নার্গিস

বেগম পারা (১)

বেগম পারা (২)

মধুবালা

কামিনী কৌশল

গীতা বলী

সুরাইয়া
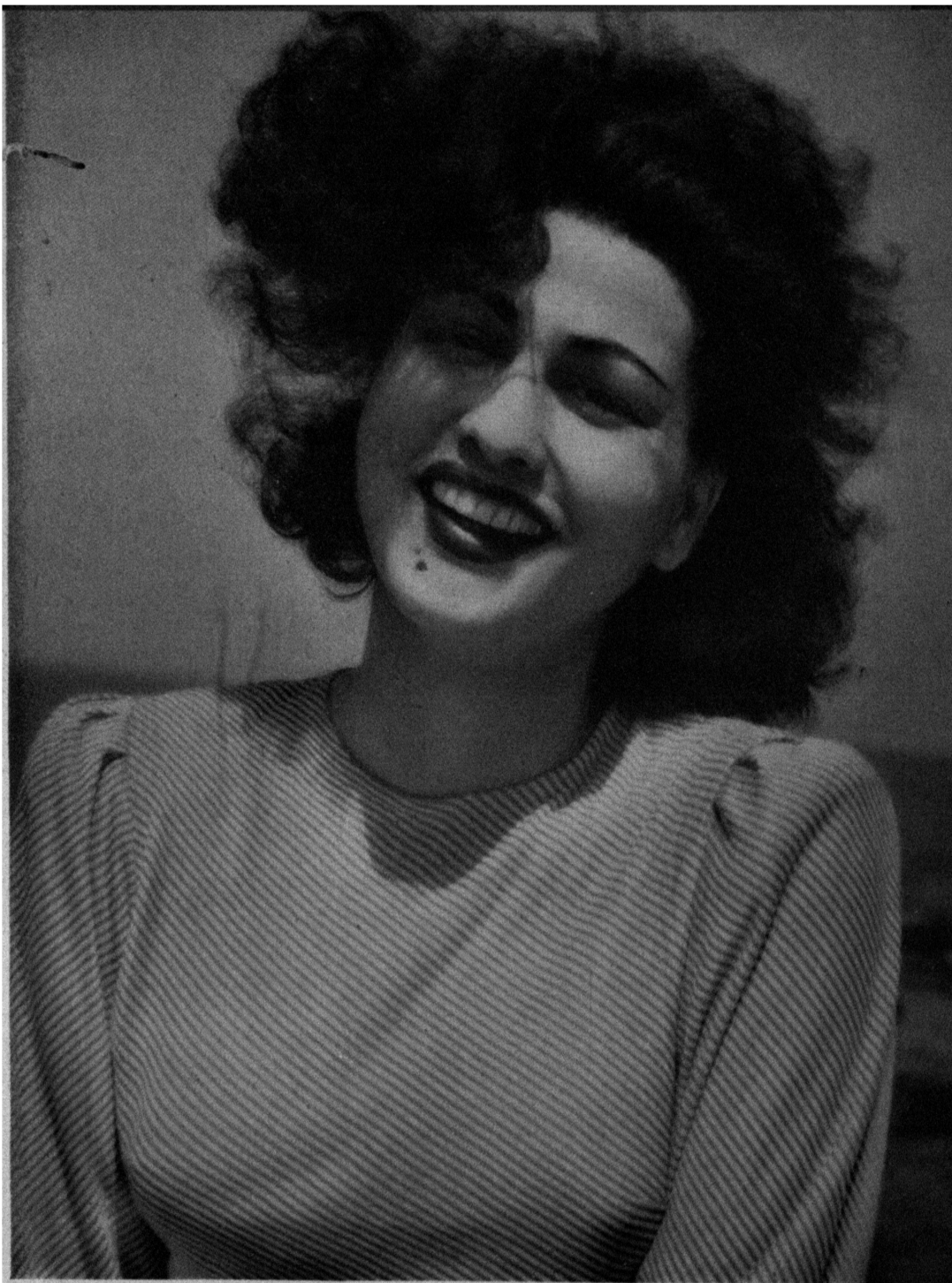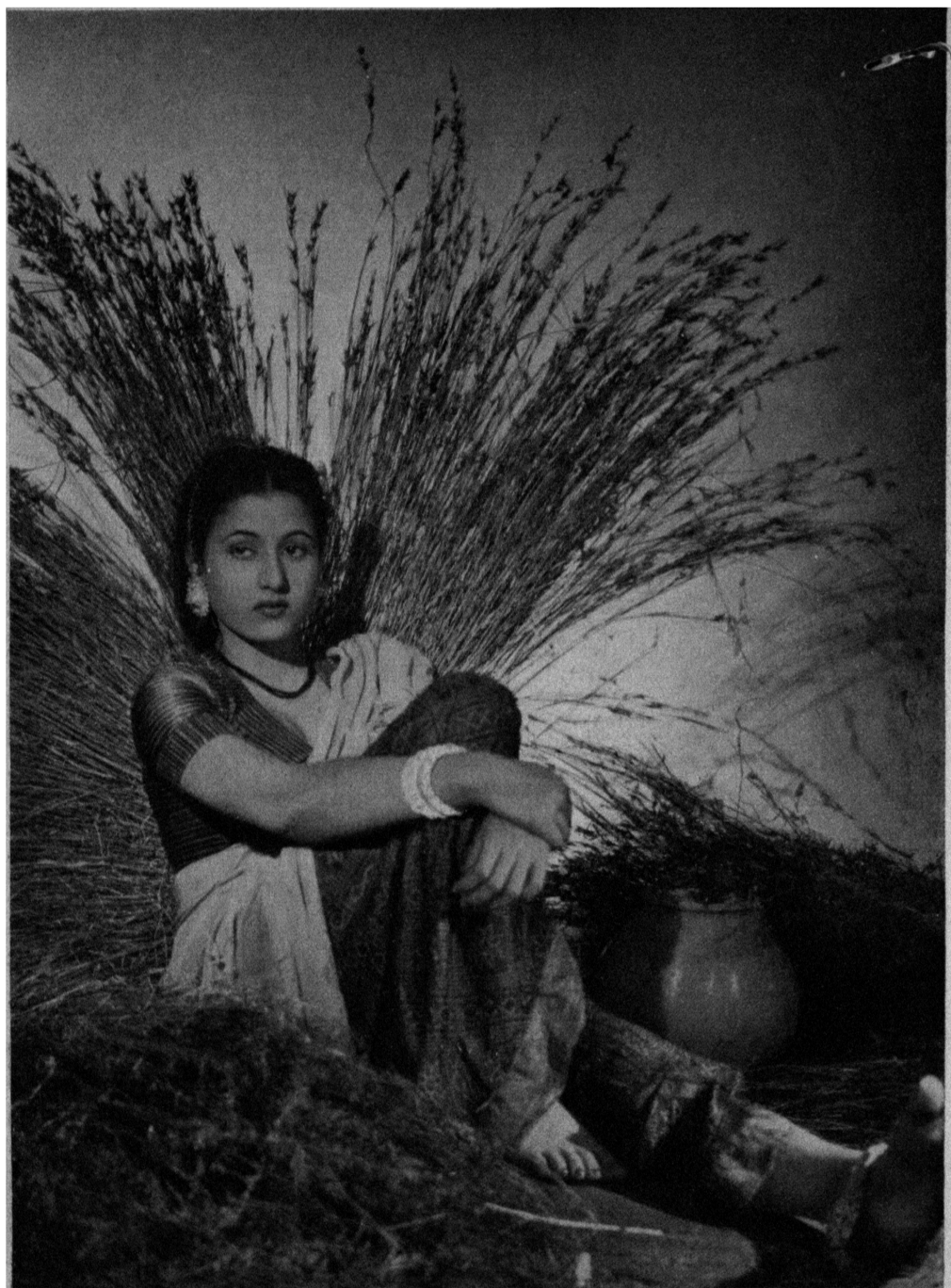
প্রতিমা দাশগুপ্তা

কিন্তু তা তো এ'রা পানই না, বরঞ্চ এ'দের অভিনয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা আসে স্টুডিওর ভিতর থেকেই। অসংলগ্ন কাহিনী, অক্ষম পরিচালনা, মামুলী চিত্র-গ্রহণ এসবের জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ'দের আশ্চর্য ভালো অভিনয় সত্ত্বেও ছবিগুলি ব্যর্থ হয়।

আর একদিক থেকে এই অভিনেত্রীদের যে বড় অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা হল কাজের অত্যধিক চাপ। অন্যান্য দেশের চিত্রতারকাদের কাজের একটা বাঁধা ছক আছে। সাধারণত তাঁরা একই সময়ে একটার বেশি ছবিতে অভিনয় করেন না। নানা কারণে ভারতীয় অভিনেত্রীদের একই সঙ্গে অনেকগুলি ছবিতে অভিনয়ে প্রতিশ্রুত হতে হয়। তাই তাঁদের অনেক সময় একই দিনে একাধিক ছবিতে খণ্ড অভিনয় না করলে চলে না। এর ফলে এ'রা যে সমস্ত অসুবিধায় পড়েন তা বিদেশী অভিনেত্রীরা বোধহয় কল্পনাই করতে পারবেন না। প্রথম অসুবিধাটা হল, শারীরিক। অভিনয়ের জন্য এক এক সময়ে দিনের মধ্যে তাঁদের বেশভূষা আর রূপসজ্জাই বদলাতে হয় দশবার। এ যে কি ক্লান্তিকর তার আভাস কিছুদিন আগে বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিকের সঙ্গে সুরাইয়ার কথায় পাওয়া গিয়েছিল। তার চেয়ে বড় অসুবিধাটা হল মনের দিক থেকে। কোনো চরিত্রের অভিনয়কে জীবন্ত করে তুলতে হলে অভিনেতা আর অভিনেত্রীর পক্ষে সেই চরিত্রকে একাগ্রচিত্তে বুঝে সেই মতো মনকে তৈরি করে নেওয়া দরকার। বিদেশে সব জায়গাতেই এই রীতি মেনে চলা হয়। কিন্তু এই জিনিসটি আমাদের দেশে এখনো সম্ভব নয়। ফলে একই সময়ে একজন অভিনেত্রীকে হয়তো একবার বড়লোকের শিক্ষিতা মেয়ে আর পর মুহূর্তেই শান্ত গ্রাম্য বালিকা, এই মুহূর্তে পৌরানিক ও পর মুহূর্তেই আধুনিক-সামাজিক ছবিতে অভিনয় করতে হয়। তা সত্ত্বেও এ'রা যে কেমন করে বহু চিত্রেই মর্মস্পর্শী অভিনয় করতে পারেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

বিদেশী অভিনেত্রীদের সঙ্গে ভারতীয় চিত্র-তারকাদের এই তুলনা-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর দুটো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। বিদেশিনীদের তুলনায় এ'রা সকলেই অতি অল্প-বয়সে খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রতিমা দাশগুপ্তা ও বেগম পারা ছাড়া এই লেখায় আলোচিত অন্যান্য সব অভিনেত্রীদেরই বয়স বাইশ-তেইশ বছরের নিচে—যে বয়সে অন্যান্য দেশের তারকারা সাধারণত অখ্যাত থাকেন। সৌন্দর্যের যথাযথ দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া এ'দের প্রায় সকলেরই মধ্যে আর যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল একটা সুস্নিগ্ধ, লাজ-নম্রভাব যা অন্তত আমরা ভারতীয়েরা বিদেশিনীদের মধ্যে সচরাচর খুঁজে পাই না। অভিনয়ের অভিব্যক্তিতে এই স্নিগ্ধশ্রী অভিনেত্রীদের বড় ঐশ্চর্য, কারণ বিরহ ও বেদনাকে এই স্নিগ্ধতা আরো বিধুর করে তোলে, প্রেমকে করে আরো মদির, আনন্দকে মধুরতর।

এই বৈশিষ্ট্যটি আজকের বোম্বাইয়ের চিত্র-তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে সুরাইয়ার। সুরাইয়ার জন্ম ১৯২৯ সালে, লাহোরের এক মুসলমান পরিবারে।

নির্বাক ছবির বিখ্যাত অভিনেতা জহুর তাঁর কাকা, তাঁরই মারফত সুরাইয়ার চলচ্চিত্রে হাতে খড়ি হয়। কাকার সঙ্গে একদিন তিনি লাহোরের এক স্টুডিওতে ছবির স্যুটিং দেখতে যান। সুরাইয়াকে দেখে প্রযোজকের এত ভালো লাগল যে তিনি তখনি তাঁকে মমতাজ-মহলের ছেলেবেলার চরিত্র অভিনয়ের জন্য চুক্তিবন্ধ করেন। আজকের সুরাইয়াকে প্রথম দেখা গেল 'ইশারা' ছবিতে। মধ্যে কয়েকটা ছবিতে তিনি অন্য অভিনেত্রীদের হয়ে গান গেয়েছিলেন। 'ইশারা'য় তাঁর আবির্ভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র দর্শকমহলে সাড়া পড়ে গেল। এর পর তিনি 'ওমর খৈয়াম', 'পর-ওয়ানা', 'আনমল ঘোড়ি', 'নাটক', 'দর্দ', 'বিদ্যা', ও আরো নানা ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'বিদ্যা' ছবিতেই তাঁর সঙ্গে দেব আনন্দ্ প্রথম অভিনয় করেন। ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের অন্যতম সুরাইয়া এখন দেব আনন্দ্-এর বাকদত্তা। শোনা যাচ্ছে যে শিগগিরই নাকি তাঁরা তাজমহলের ছায়ায় চন্দ্রালোকে পরিণয়সূত্রে আবন্ধ হবেন। ব্যক্তিগত জীবনে সুরাইয়া পার্টি বা নাচগানের চেয়ে গৃহের শান্তিপূর্ণ পরিবেশই পছন্দ করেন বেশি।

সুরাইয়ার মতোই আর একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নার্গিস। নার্গিসের জন্ম কলকাতায়, বাইশ বছর আগে। তাঁর মা বিখ্যাত গায়িকা জদ্দনবাঈয়ের চিরকালের ইচ্ছা মেয়ে বড় অভিনেত্রী হোক। নার্গিস নিজে কিন্তু গোড়ায় এদিকে বিশেষ চাড় বা কৃতিত্ব দেখাননি। বিখ্যাত ওস্তাদ অনন্ত আলী খান তাঁকে গান শেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্ণৌয়ের লচ্চু মহারাজ হার মেনেছেন তাঁকে নাচ শেখাতে গিয়ে। আরো অনেক মেয়ের মতো স্কুল-কলেজে দু'একবার রাণীর ভূমিকায় অভিনয করা ছাড়া পনেরো বছর বয়স অবধি এদিকে তাঁর কোনো প্রতিভা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সাত বছর আগে যখন তাঁকে 'তগদীরে' প্রথম দেখা গেল, তখন অনেকেই বুঝেছিলেন যে নার্গিস একদিন ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করবেন। সেকথা আজ সত্যি হয়েছে। 'তগদীরে'র পর তিনি আরো বহু ছবিতে নেমেছেন, আর প্রত্যেকটি ছবিই ভারতবর্ষের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ দর্শক আকর্ষণ করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে নার্গিস আর পাঁচজন মেয়ের মতোই হাসিখুশি মানুষ। কাপড় জামা আর গয়না কেনার তাঁর খুব ঝোঁক। শখের মধ্যে প্রধান হল বাড়িতে ষোলো মিলিমিটারে নিজের ছবি দেখা, কুকুর পোষা, বলরুম নাচ, ব্যাডমিণ্টন, আর বাড়িতে ভাইপো ভাইঝিদের সঙ্গে খেলাধুলা। নার্গিস অবিবাহিতা।

গীতাবলীর বাড়ি লাহোরে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দিদি ভীরপুত্রীর মতো গীতাবলীও ভালো নাচতে পারতেন। তাঁর মা বাবার ইচ্ছা ছিল না যে গীতাবলী নাচগান নিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ও বন্ধুবান্ধবদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ছবিতে যোগদান করেন। লাহোরেই কতকগুলি ছবিতে ছোট ছোট নাচের ভূমিকা দিয়ে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত হয়। সে ১৯৪৫ সালের কথা। এই ছবিগুলিতে তাঁর সহজ সুন্দর অভিনয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। এর পরেই প্রযোজক

মজহুর খান তাঁকে 'দ্নিয়া' ছবিতে নায়িকার ভূমিকা দেন। বোম্বাইয়ে এসে 'দ্নিয়া'র পর 'সোহাগ রাত', 'বাড় বাহন' ইত্যাদি নানা ছবিতে গীতাবলী অভিনয় করেছেন। সেসব অভিনয় লোকের মনোহরণ করেছে। গীতাবলীর বিশেষত্ব হল তিনি ছবিতে কোনো রকম মেক-আপের সাহায্য নেন না। আরো দ্'একজন অভিনেত্রীর মতো গীতাবলীও সম্প্রতি নিজে ছবি তোলার চেষ্টা করছেন।

স্রাইয়া আর গীতাবালীর মতো কামিনীকৌশলও লাহোরের মেয়ে। লাহোরের এক কলেজে পড়া শেষ করে ছবিতে অভিনয় করার জন্য কামিনীকৌশল বোম্বাইয়ে আসেন। ভাগ্যক্রমে চেতন আনন্দ তখন 'নীচা নগরে'র জন্য নতুন অভিনেত্রী খংজছিলেন। তিনিই কামিনীকৌশলকে একটি চরিত্র অভিনয় করতে দেন। নবাগত হলেও এই ছবিতে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অপ্র্ব। ফলে বিখ্যাত পরিচালক জাগীরদার তাঁকে 'জেলযাত্রা'র নায়িকার ভূমিকায় নামান। তাঁর শেষ ছবি 'আরজ্'।

দেখতে স্ন্দরী না হলেও অভিনয়গ্ণে কামিনীকৌশল আজ চিত্র-জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। কয়েক বছর আগেকার দেবীকারাণী আর অশোক-কুমারের মতো কামিনীকৌশল আর দিলীপকুমার আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'টিম'।

লাহোরের মেয়েদের মধ্যে সাঁতারে কামিনীকৌশল এক সময়ে অপরাজেয় ছিলেন। তিনি বিবাহিতা, তাঁর স্বামীও চলচ্চিত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট। ছবিতে অভিনয়ের চেয়েও তাঁর বেশি ঝোঁক নাচের দিকে। ভারত নাট্যম তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নাচ এবং তিনি নিজে খ্ব ভালো নাচতে পারেন।

অন্যান্য নবাগতা অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা হলেন মধ্বালা। যখন তাঁর বয়স আট-দশ বছর তখনই তিনি বিখ্যাত ছবি 'বসন্ত'এ অভিনয় করেছিলেন। আজকের স্ন্দরী মধ্বালাকে দর্শকেরা প্রথম দেখলেন 'নীল কমল' ছবিতে। সৌন্দর্য আর অভিনয়কুশলতার গ্ণে মধ্বালা এই ছবিতেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। এ পর্যন্ত বারোটিরও বেশি ছবিতে তিনি নেমেছেন, তার মধ্যে 'পরশ পাথর', 'সিংগার', 'নিশানা' আর 'মহলে'র নাম সকলেই জানেন। মধ্বালার বাড়ি হায়দ্রাবাদে। তাঁর আসল নাম মমতাজ।

আসলে বাঙালী হলেও প্রতিমা দাশগ্প্তা এখন হিন্দী ছবির সঙ্গেই বেশি সংশ্লিষ্ট। মধ্ বোসের 'রাজনর্তকী'তে এক সখীর ভূমিকায় তিনি প্রথম নেমেছিলেন। তারপর আরো দ্'একটি বাংলা ছবিতে অভিনয়ের পর কলকাতা ছেড়ে তিনি বোম্বাইয়ে যান। সেখানে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় শেষ করে প্রতিমা দাশগ্প্তা এখন নিজেই প্রযোজক হয়েছেন। 'ঝর্ণা' আর 'ছামিয়া' তাঁর নিজের প্রযোজনায় তোলা। দ্ঃখের বিষয় বোম্বাইয়ের সেন্সর বোর্ড 'ছামিয়া' ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

'ছামিয়া'র নায়িকা ও প্রতিমা দাশগ্প্তার বান্ধবী হলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী বেগম

পারা। বেগম পারার বাবা এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী। শিক্ষা সমাপনের পর ইনি অজ্ঞাতসারেই চলচ্চিত্র জগতে এসে পড়েন। বর্তমানে বিশিষ্ট ভারতীয় তারকাদের মধ্যে বেগম পারাই সবচেয়ে লাস্যময়ী বলে খ্যাতি লাভ করেছেন।

এই অভিনেত্রীদের কথা শেষ করার আগে আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্র ও তার দর্শকদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কারণ এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে এঁদের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা অজানা থেকে যাবে। বোম্বাইয়ের প্রযোজকেরা এতদিন এমন ভাবে ছবি তৈরি করেছেন যাতে সাধারণ দর্শকের মন ভোলে। ভালো হোক মন্দ হোক লক্ষ লক্ষ দর্শকের পছন্দসই হলে প্রযোজকের পক্ষে টাকার ভাবনা থাকে না। দর্শক তুষ্টির এঁরা একটা সহজ উপায় বার করেছিলেন। নাচগান, হাসি-তামাশা, কিছু অশ্রুপাত, বিরহ আর প্রেম, ধর্মের জয় কিংবা অধর্মের পরাজয় ইত্যাদি জোড়াতালি দিয়ে এঁরা ছবির একটা চেহারা খাড়া করে তুলেছেন। নিরক্ষর জনসাধারণের এধরনের ছবি ভালো লাগা স্বাভাবিক। ছবির দৈর্ঘ্যও তাঁদের কাছে পীড়াদায়ক নয়। রাত জেগে যাঁরা যাত্রা দেখেন তাঁদের বরঞ্চ ছবি বড় হলেই বেশি পছন্দ হয়। এই জাতীয় ছবিতে গল্পের কেন্দ্র হন প্রধানত নায়িকারাই। ফলে নায়িকাকে নাচতেও হয় গাইতেও হয়, হাসতেও কাঁদতেও হয়, সবই এক সঙ্গে।

বিদেশী চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকের চেহারাটাও কিছুটা এই ছাঁচের ছিল, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশে আমাদের দেশেও আজ ছবিতে পট-পবিবর্তন চলছে। একই ছবিতে সব কিছু থাকার যে দরকার নেই, ট্র্যাজেডি আর কমেডি যে সব সময়ে মিশ খায় না, প্রত্যেক ছবিতেই গাদা গাদা নাচগান থাকতে হবে তাব যে কোনো মানে নেই ইত্যাদি কথা দর্শকের মধ্যেও অনেকে বলতে শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে বোম্বাইয়ের প্রযোজক-মহলেও কেউ কেউ দর্শকদের সুরুচির কথা আজ ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কাজেই আজকের এই অভিনেত্রীরা এক দিক থেকে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পের একটা বিশেষ যুগের শেষ প্রতীক, যে যুগেব সূচনা সুলোচনা ও গহর জান্‌কে নিযে, যার মাঝে এসেছিলেন দেবীকারাণী, লীলা চিৎনীশ, নাসিম বান্নু, খুরসীদ ইত্যাদি। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়তো নতুন যুগের সূচকও হতে পারেন— যখন অভিনেত্রীদের বর্তমান রূপ পাল্টে যেতে বাধ্য হবে, যখন প্রত্যেক অভিনেত্রীকেই সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী, গায়িকা ও 'গ্ল্যামার গার্ল' হতে হবে না। 'শ্রম'-বিভাগ, 'শ্রম'-লাঘব ও অন্যান্য নানা অসুবিধাগুলি দূর হলে এঁদের অভিনয় নিশ্চয়ই আরো উন্নত হবে।

আলোচিত অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউই অবশ্য এখন পর্যন্ত এমন কিছু অভিনয়-শক্তি দেখাননি যা তাঁদের স্মরণীয় করে রাখতে পারে। তবে, যে সমস্ত বাধা বিপত্তির মধ্যে বর্তমানে তাঁদের অভিনয় করতে হয় সেসব যদি আমরা মনে রাখি তা হলে অনেক কিছু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁদের শক্তি সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হব না।

এ-দেশটার মতো এমন গান পাগলা দেশ আর কোথাও নেই। ইস্কুল যেতে যেতে সারা পথ হিজিবিজি কথার ফাঁকে ফাঁকে, এ-গলা সে-গলায় সরু মোটায় মিহিতে মিলিয়ে মিশিয়ে বিচিত্র সুরের রেশ; স্নান-ঘরে ছোট বোনের গলা যখন রিনরিন করে, সারা বাড়িতে ঢেউ তুলে উপর থেকে বড় বোন গুনগুন করতে করতে নেমে আসে নিচে। পাশের বাড়িতে তখন কেউ প্রাণপণে চিৎকার করে রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। কি সুন্দর সকাল হয় এদেশে! মাটিতে তখনো আবছা আঁধার। বাড়ির দরোয়ান, ঠাকুর-চাকর 'ভজ গোবিন্দ নাম' গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যায় বাড়ির পাশ দিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে। সমস্ত বাড়ির ঘুম তারপর ভাঙে। আবার তারা স্নান থেকে ফিরে আসে রাম-সীতার নাম গাইতে গাইতে। আশ্চর্য আলোয় ভরা এমন ভোর আর কোথাও হয় না। টহলদার গান গাইতে গাইতে আসে :

'রাই জাগো, রাই জাগো
আর কত নিদ্যে যাবে গো ধনী
কালো মানিকের কোলে—'

দুপুরে ভিক্ষে চায় যে লোক সেও খালি গলায় দরজায় দাঁড়ায় না। ভিক্ষে দিয়েও রেহাই নেই, তার গানটিও শুনতে হবে। এ যেন আবদার। আমাদের দেশেই এ আবদার চলে। জীবনে তার দুঃখ আছে; কিন্তু জীবন তারও বড়। জীবন শুধু শহরে নয়, গাঁয়েও। খাল-বিল-নদী ঘেরা গাঁয়ে। এলোমেলো পথে হঠাৎ সাঁকো। সাঁকো মচমচ করে কোমরে ভারি ভারি মাটি-পিতলের কলসী নিয়ে সকাল-সাঁঝে মেয়েরা গুনগুন করে। অনেক ভোমরার মতো শোনায় দূর থেকে, মাঝে মাঝে সরু গলায় হাসি আবার গুনগুন। হয়তো অনেক পুরোনো গাঁয়ের কবির রচনা পুরোনো

সুরে গান করে তারা। তবু তারা গান করে। বাস্তবিক অনেক দুঃখ সুখ ছাড়াও আমাদের জীবনই অনেক বড়। নৌকোর মাঝি আমাদের নাম ধরে চেনে, ডেকে বসায় পাটাতনে, হুঁকো তুলে দেয় হাতে, তার পর পৌঁছে দেয় গান শুনিয়ে। লক্ষ্ণৌতে দেখেছি মুলো হাঁকছে গান করে, 'লে লো মুলি ডবল ডবল'। নিজেরই রচিত নিজেরই দেওয়া সুর। এতে আমরা অবাক হই না। বরং গানের আসরেই আমরা সহজ হই। যেখানে গান নেই সেখানে আমাদেরও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমাদের দেশ ছাড়া সব দেশের লোক আশ্চর্য হবে শুনে, তাদের একমাত্র শোকের জায়গা যে শ্মশান সেখানেও আমরা গান করি। আগেই বলেছি, জীবন আমাদের অনেক বড়। আমরা কথা বলি কম; অর্থাৎ আমরা কম বলায় অনেক বলি। গভীর আমাদের জীবনের সুর তাই কথাও কম, তাই অনেক কথার অবকাশ।

তাই, আমাদের দেশের ছবিতে যে গান থাকবে এ আর এমন আশ্চর্য কি। আমাদের দেশের ছবিতেই তো গান থাকবে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ছবিতেই এতো গান নেই। তারা গানের জন্য, বিশেষ করে গানের জন্যই, আলাদা করে ছবি তোলে; তার নাম দেয় 'গীতি-চিত্র'। তারা গান বলতে বোঝে হয়তো চটুল আনন্দের রূপকে। আমাদের গানে আনন্দের চটুলতাও আছে গভীরতাও আছে; আবার বেদনার অতলস্পর্শী স্তব্ধতাও আছে সুরে। তখন অবাক হয়ে কথা হারায়। তাই আমরা যেখানে-সেখানে যখন-তখন কথার আগে গান খুঁজে পাই। কিছু বা বলি কিছু বা শুনি গানে। আমাদের ছবির এটা নিজস্ব রূপ, একমাত্র রূপ বলতে পারি; যাকে কেন্দ্র করে আমরা ডুবে থাকতে পারি। হোক না হাসির ছবি, হোক সুখের কি দুঃখের, গান আছে কিনা জানতে চাই সবার আগে আমরা; পরিচালনার অভাব হলে ক্ষমা করি, ফোটোগ্রাফী আশ্চর্য না হলেও বসে থাকি, তার পরেও একটা গানও যদি ভালো না হয়, সহ্য হয় না আমাদের।

আমাদের ছবির এই নিজস্ব রূপটাই ভারতীয় ছবির প্রাণ। একথা আমার মতো সকলেই বোঝেন। কিন্তু এই বোঝারও প্রভেদ আছে। অর্থাৎ 'ভালো গান চাই' কথাটা অনেকেই বলেন, কোনটা ভালো গান সে সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। ছবির সব প্রযোজকের মুখেই শুনি, ভালো গান দিতে হবে। ভালো গান বলতে ঠিক যা বোঝা যায় এ'রা যে তা বোঝেন না, এ'দের ছবির গান শুনলেই তা বোঝা যায়। তবে ভালো গান কি? ভালো গানে কি শুধু ভালো সুর থাকবে? শুধু কথা ভালো হবে গানের? না। উপরন্তু, ভালো গানে ভালো সুর বা ভালো কথা তো থাকবেই, আরো কিছু থাকতে হবে ভালো গানে। সে হচ্ছে এ দুইয়ের মিলন অর্থাৎ কথা ও সুরের সাযুয্য। মনে হবে না এ গানে সুর আছে কথা নেই: আবার শুধু ভালো কথা ভালো গানের একমাত্র লক্ষ্য হবে না। রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ মানতে পারি। আমাদের দেশের প্রযোজকরা এবিষয়ে এখনো যথেষ্ট সচেতন নন। ভালো গানের অর্থ এ'রা একেবারে আলাদা করে তৈরি করেছেন। কোনো গান হিট্ করল

কিনা সেইদিকে শুধু লক্ষ্য গেছে। গানটি আদৌ গান হল কিনা, এ প্রশ্নের বালাই নেই। যে গান হিট্ করল না তার দাম নেই। ফলে বেশির ভাগ শুধুই হিট্‌যোগ্য গান হচ্ছে। (মনে হয় একই কারণে, প্রায় প্রত্যেক স্টুডিওতে অনেক পোষা লোক আছেন যাঁরা এ'দের ফরমাসী গান লেখেন। একটুও দ্বিধা না করে তাঁরা এমনও লেখেন, যেমন—'মাধবী রাত, বকুল লগন', কিম্বা 'ফিক করে চাঁদ উঠল সই'। সুরও তৈরি আছে, লাগিয়ে দিলেই হল।) ফরমাসী লেখকের লেখা গানই একমাত্র ত্রুটি নয়। এই ত্রুটি থেকে মুক্তি পেতে হলে সঙ্গীত-পরিচালকের দায়িত্ববোধ জেগে ওঠা উচিত। অবাক লাগবে শুনলে, সঙ্গীত-পরিচালকও খুঁজে বার করা হয়, যাঁরা হিট্-যোগ্য সুর দিতে পারবেন।

সঙ্গীত-পরিচালকের কাজ শুধু কোনো একটি কি দুটি গানে ভালো সুর দিতে চেষ্টা করা নয়; আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করে তোলাই তাঁর দায়িত্ব। যে সুর ব্যঞ্জনা গোটা কাহিনীকে ধরে রাখবে পিছন দিক থেকে; কাহিনীর কাঠামোর কাজ করবে আবহসঙ্গীত। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনো সঙ্গীত-পরিচালকরা উদাসীন তো বটেই, কোনো প্রযোজকও এর মূল্য দেন না। তাই কোনো ছবিতে দেখি কাহিনীর কোনো সংযোগ না রেখেই হঠাৎ সানাই পোঁ পোঁ করে পূরবী বাজায়। অথবা ফোনটা বেজে ওঠে। কোন যন্ত্রে কেমন আওয়াজ, কোন যন্ত্রে কেমন রাগ ভালো শোনায় বা শোনায় না এদিকেও লক্ষ্য নেই। যেমন শ্রী রাগ সেতারে বাজানো বা বাঁশিতে তোলা কঠিন; সাধারণ হাতে এ রাগের রূপ আসে না। তাই সেতারে অথবা বাঁশিতে এ রাগ বাজানোর চেষ্টা হলে বেখাপ্পা শোনায়। আর তান, তান সারেঙ্গীতে খুব ভালো আসে। এগুলো একটু মনোযোগী কান বুঝতে পারবে। কিন্তু এই সাধারণ বিচার-গুলোকে যখন এ'রা ভুল করেন তখন বলার কথা থাকে না। শ্রুতিকটু কিছু সুর দিয়ে এ'রা ভাবেন আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। এ'দের একমাত্র উদ্দেশ্য গান, কোনো একটা কি দুটো গান নিয়ে মাথা ঘামান এ'রা। হয়তো কারো সুরে কোনো একটা গান বাজারে বেশ সাড়া ফেলেছে, তিনি রাতারাতি বড় সঙ্গীত-পরিচালকের শ্রেষ্ঠ আসনটি পেয়ে গেলেন। পাঞ্চোলী আর্টস-এর নাম করা সঙ্গীত-পরিচালক আবদুল হায়দারের 'তু কোন্ সে বাদিল মেরে' গানটি ভালো হয়েছিল, সে গান আজ অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু তাঁরই পরিচালিত আবহসঙ্গীত যে কত নিম্নশ্রেণীর হতে পারে, তা সত্যি ভাবা যায় না। এ দোষ প্রায় সব সঙ্গীত-পরিচালকের মধ্যেই আছে। 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' গানটির সুর দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। তাঁর নাম-ডাক আছে আমাদের দেশে, প্রবাসেও। গানটির সুর ভালো হয়েছিল, আশ্চর্য জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু তিনিও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। তাঁর আবহসঙ্গীত মূল কাহিনীকে অনেক বারই ধরে রাখতে পারেনি, বিচ্যুত হয়েছে সম্বন্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে মূল গল্পের।

জনপ্রিয় সঙ্গীত-পরিচালক আমাদের দেশে অনেকে আছেন; তাঁরা গানকে জন-

প্রিয় করে তুলতে হয়তো অনেক উপায়ই বেছে নেন। কোন উপায় বাছেন অবশ্য জানা নেই আমাদের। তবে তাঁদের কাজ থেকে এটুকু স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁরা অগণিত জনগণের পছন্দের দিকেই জোর দেন সবচেয়ে বেশি। কোন গান তারা পছন্দ করে, আগে কি ধরনের গান তাদের ভালো লেগেছে ইত্যাদি। অবশ্য, এই 'লোকে 'কোন গান চায়' কথাটা বিশেষভাবে তখনই কোনো সংগীত-পরিচালকের মনে প্রবল থাকে যখন তিনি চিত্রজগতে নতুন আসেন। কেননা তখনো তিনি দেশগত এই পছন্দের সঙ্গে একেবারে বিচ্যুত হতে পারেন না। প্রথম প্রচেষ্টায় তাই তাঁদের গান জনপ্রিয় না হলেও কিছুটা নিজস্ব ছাপ নিয়েই সাধারণের সামনে উপস্থিত হয়। আর যদি তাঁর কপালগুণে সে গান কোনো ভালো গলায় গাওয়ানো হয় তাহলেই সে গান হিট্ করে।

সিনেমায় এই সস্তা হাওয়ার আমদানি খুব বেশিদিনের নয়। কিছুদিন আগেও বিশুদ্ধ রাগ-রাগিনীর স্থান সিনেমাতেও ছিল। ছোট খেয়াল বা ঠুংরি গাওয়া হত। বম্বে টকিজ-এর সরস্বতীবাঈ গৌড় সারেঙ, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি তাঁদের ঘরওয়ানা ঢঙে ও কথায় গেয়ে গেছেন। 'দামিনী দমকে ডর মোহে লাগে', বা 'ঝুকি আই রে বাদরওয়া সাবন কি' ইত্যাদি গান তাঁরা কোনো সংগীত আসরে যেমন গান, তেমনি গেয়েছেন। ইদানিং কদরপিয়ার কিছু ঠুংরি মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। 'বাবুল মেরে ন্যাইহারে ছুট যা'-র মতো দামি ভৈরবী ঠুংরী সাইগলের গলায় আমরা পেয়েছি। এ গানগুলি বাজারে চলেছিল। এই সংগীত যেমন সিনেমায় এল, তেমনি ভজনের নামে, কীর্তনের নামে লোকসংগীতও এল সিনেমায়। লোক-সংগীতের জনপ্রিয়তা স্বভাবতই বেশি। কেননা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তার নিকটতম। ফলে রাগপ্রধান ও লোকসংগীতের মধ্যে ঘুরতে লাগল সিনেমার গান, আবার দুটো নানাভাবে মিশে একটু অদ্ভুত আকারও পেল।

তৃতীয় শ্রেণীর সংগীত-পরিচালকে আজ প্রায় সব স্টুডিও ভর্তি। এ'রা চতুর; লোকে কি চায় তারই উপর নির্ভর করে এ'দের সব নির্বাচন। কি চায় বলতে বোঝায়, চলতি ছবিগুলির ভিতর কেবল গান শোনবার জন্য লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় রোদে পুড়েছে, জলে ভিজেছে, কোন গান গলায় তুলতে গিয়ে সুখলাল এক হাজার পাঁচ শো বিড়ির জায়গায় মোটে পাঁচ শো বিড়ি বেঁধেছে। এই ধরনের গান সামনে ফেলে নতুন ছবির গান, শুধু গান কেন, প্রায় সমস্ত ছবিরই ছক কাটা হয়। তবু প্রথমে কয়েকটা ছবি উতরে গেলেও তার পর মুশকিল হয়। হয়েছেও তাই। আজকাল অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে ছবিগুলি, গানগুলিও। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রায় সব ছবিতেই দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ধৈর্য; একই গানের একটু অদল-বদল শুনে-শুনে মন পীড়াগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। একগানের একটা লাইনের সঙ্গে আর একটা গানের আর এক লাইন জুড়ে একটা অদ্ভুত খিচুড়ী

তৈরি করা হয়েছে। সুরও এটা থেকে ওটা থেকে নিয়ে বসানো হয়েছে। নতুন গান নতুন কথায় ও সুরে কোথাও শোনা যাচ্ছে না।

'অছ্যুত কন্যা'-র 'বনকে চিড়িয়া'-র মতো বাজে কথা ও সুরের গান আমাদের দেশে বেশ হিট্ করেছিল। আবার 'শেষ উত্তর'-এর 'এ চাঁদ বীত্ না যানা' গানটার সুর ও কথার দিকে তবু দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল বোঝা যায়। স্নেহপ্রভার 'নদী কিনারে হো তারে ভরি রাতরে তারে ভরি রাত' অথবা খুরশিদের 'কিথ্যে যাউরে মন ও মন' ইত্যাদি, লীলা চিটনিশের 'জল ভরনে চলি রি গুঁইয়া'—এ গানগুলো পর পর লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আমাদের দেশে মন ও রুচি এখনো তৈরি হয়নি। যদি হত তাহলে খারাপ ও ভালো দু'রকমের গানই এক সঙ্গে বাজারে প্রচলিত হত না। এরই ভিতর কোনো ছবিতে 'অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে নারিনু ঘরে'-এর মতো আশ্চর্য কথা ও সুর যখন শোনা যায়, তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা প্রশ্ন, এগান কারো ভালো লাগলে, 'জেরা জলদিসে তালা লাগালে'-র মতো গান কি করে কারো রুচিকে স্পর্শ করতে পারে? পারে তখনই, কারো কোনো রুচির বালাই যখন তৈরি হয়নি। তারপর বিদেশী গান থেকে কিছু নোংরামিও এসেছে। জায়গা হোক না হোক গানের কোথাও-না-কোথাও হো হো করে চেঁচিয়ে ওঠা চাই। দর্শকরা এতেও প্রতিবাদ জানাতে ভুলে যান একই কারণে।

গান আমরা ভালোবাসি, অক্লান্ত খাটুনির তিক্ততার ভিতরে আমরা জুড়িয়ে নিই গান গেয়ে; গান শুনতেই যাই সিনেমা; কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে ভালো গান আমরা সবচেয়ে কম শুনি। ভালো কি খারাপের তফাত বোধ নেই। আমাদের নিজস্ব ধারণা গঠন হয়নি। তার কারণ এখনো সঙ্গীত-পরিচালকেরা কেবল ফাঁকি দেন বলে। আবার দর্শকও প্রতিদিন বাড়ছে। কাজেই এই ফাঁকিগুলিকেই গ্রহণ করবার জন্য প্রতিদিনই নতুন লোক কিছু না কিছু আছেই। তারা একেই সুন্দর বলে মেনে নিচ্ছে। সকলের প্রত্যাখ্যান পাওয়ার আঘাত চট করে তাই আসছে না। কিন্তু এই ফাঁকিতে শুধুমাত্র দর্শককে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা নয়, আমাদের দেশের গানেরও গলা চেপে ধরা হচ্ছে। পুরোনো ছবিতে আমরা কিছু ভালো গান শুনেছি। আজও সেসব গান লোকের মনে আছে; সেই সুরে সম্পূর্ণ গানটাই লোকে গায়। কিন্তু আজকাল তাও পাওয়া যাচ্ছে না। আজকাল চলতি ছবির একটা-আধটা লাইন ছাড়া কেউ মনে রাখতে পারে না। কেউ গায় না। কারণ, শুধু ভালো গান যে হচ্ছে না তা নয়, সমস্ত গানেই আজে-বাজে বাজনার ভিড় থাকাতে গানের কোনো রূপই প্রকাশ পায় না।

ছবিতে গানের পরিস্থিতির কথা মনে হয় ভাবাই হয়নি। ধরা গলায় কোনো কথা বললে দর্শক ভাবেন প্রেম হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি গানও যে শুনবেন নায়ক

অথবা নায়িকার গলা থেকে এটাও তাঁরা আগে থেকেই জানেন। ঠিক এই পরিস্থিতির মতো গানের অন্য সব পরিস্থিতিগুলোও বাঁধা; তার বাইরে গান গাওয়ানো যায় না। কিন্তু এই বাঁধা পরিস্থিতি থেকে বার হতে না পারলে গানের ভবিষ্যৎ নেই। সে জন্য চাই ভালো কাহিনী। কাহিনী ভালো হলে, এই ধরা-বাঁধা পরিস্থিতিকে উৎরে গান যে কোনো স্থানেই স্থান পেতে পারে। এই প্রসঙ্গে, নবীন সেন গিরিশ বাবুকে একখানি ভালো চিঠি লিখেছিলেন। গিরিশবাবু তাঁর রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফার মুখে একটি গান জুড়ে দিয়েছিলেন। নবীন সেন তাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা করে লেখেন, 'তুমি সাহসের পরিচয় দিয়েছ...যা আমি পারিনি।' গানের সঙ্গে গল্পের সম্বন্ধ যে কি আশ্চর্য তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব এ কথা থেকে।

ধরা যাক, একটি ছেলে বা মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। সানাই শোনা যাচ্ছে। এখানে নাটকের প্রায় অনেকখানি বলা হল। সানাই শুনে, ছেলেটিকে বা মেয়েটিকে দেখে কেউ সহজেই ভাবতে পারেন প্রিয়জনের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এখানে মন কথা চায় না, চায় গান। গান সমস্ত ব্যথাকে তুলে ধরে। যদিও এদৃশ্য আমাদের পরিচিত, আমাদের পূর্বেও পরিচিত ছিল, তবু গান এই পরিচিত পরিস্থিতির ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, যে কোনো পরিস্থিতির বাইরের রূপ এক হলেও তার ভিতরের রূপ বদলায় কালে। ভিতরের এই রূপটি হচ্ছে আমাদের মন। আমাদের মন বদলাবে, বদলাচ্ছে। আমাদের চারপাশের যা কিছু তা আমরা প্রতিদিন নতুন করে দেখি। তাই একই পরিস্থিতির ভিতরে থাকে নতুন সমস্যা, যে সমস্যা সেই কালের। অর্থাৎ গল্প বা নাটক যদিও কোনো দেশীয় সমস্যাকে যে কালে বড় করে রূপ দেবে, হয়তো সে সমস্যা পূর্বেও ছিল, কিন্তু তার রূপ একান্ত সেই কালেরই। তাই প্রয়োজন দেশকে বোঝা, সম্যকরূপে বোঝা। দৃশ্য সুখের হোক দুঃখের হোক, গান সমস্ত গল্পকে জড়িয়ে সেই মুহূর্তের বেদনাকে জানাবে; কারো মনের অনেক কথার শিখণ্ডী হয়ে একা দাঁড়াবে। একদিকে সে আত্মার বৃত্তিকে বোঝাবে, অন্যদিকে গল্পের সূত্রকে ধরে রাখবে। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'শাপমুক্তি'-র 'একটি পয়সা দাও গো বাবু' অথবা 'শেষ উত্তর'-এর 'রুমঝুম নূপুর পায়ে বাজে গো বাজে' গানগুলির তবু পরিস্থিতির সঙ্গে মিল আছে। ভালো লাগে তাই শুনতে। কয়েকটি হিন্দী ছবির কয়েকটা গান এরকম ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তবু আমরা এখনো ধরা-বাঁধা পরিস্থিতিকে ডিঙোতে শিখিনি। ভিখারীর মুখে গান গাওয়ানো ছবিরও চলতি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো, বেশির ভাগ ছবিতে দেখা যায়, গল্পের পরিণতির আগেই গানে এসেছে পরিণতি। গান দেওয়ার ভিতরে যে খাটুনী আছে, অনেক পরিশ্রম ও চিন্তা আছে, এ বোঝা যায় না। দিতে হবে গান তাই দেওয়া। তাই দেখা যায় সাঁওতালী নাচে সাঁওতালী ঝুমুর নেই। অনেক ভালো গানকে এভাবেও নষ্ট করা হয়েছে।

আরো, বিদেশী ছবিকে শুধুই নকল করতে গিয়ে ভালো কিছু আমরা পাইনি। আমাদের মনে রাখা দরকার আমাদের রিয়্যালিটি আলাদা। কণ্ঠসংগীত ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমাদের গানের ট্র্যাডিশন সম্পূর্ণ ভিন্ন বিদেশীদের থেকে। ছবিতেও তাই আমাদের প্রধান অবলম্বন এই কণ্ঠসংগীত। এই অসুবিধা আছে, তাই, অর্কেস্ট্রার সঙ্গে আমাদের গান চাপা পড়ে; রূপ পায় না। আমাদের বাজনা থাকে গানের পিছনে, গানকে আঘাত না করে। রবীন্দ্রনাথ এর একমাত্র উদাহরণ। রবীন্দ্রসংগীতকে আমরা জীবনে উপলব্ধি করেছি তাই সে গান ভালো। তাঁর কথা গভীর সুরকে ছুটি দিয়ে, ছোট সুরকে ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তাঁর কথা ও সুরের এমন সঙ্গম আমরা আর কোথাও দেখি না। আমাদের দেশে যে রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি হয়েছিল একদা, রবীন্দ্রনাথ আরো দুটো রাগ বাড়িয়ে যাননি। বরং সেই রাগ-রাগিনীগুলিকেই নতুনভাবে মিশিয়েছেন তাঁর অনুভবের সঙ্গে। বেহাগের সঙ্গে বাউল মিশিয়ে বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করেছেন। তেমনি, সুরের সঙ্গে মিলিয়ে, রাগ-রাগিনীর রূপগুলিকে অনুভব করে, কথাও সৃষ্টি করতে হয়েছে তাঁকে। বেহাগ মধ্যরাতের সুর; অত্যন্ত বেদনার আভাস এই সুরে। একটি গানে তাঁর কথা হল, 'আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে, আসবে যদি শূন্য হাতে'। তাই তাঁর গানে দেখি কথা ও সুরের মাঝে শত্রুতা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মতো তারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। 'রবিছায়া'-র ভূমিকায় মিত্র মহাশয় ঠিকই লিখেছেন, 'ভালো গানের অভাব দূর হল'।

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের গানেরই সম্ভার বাড়ালো। বাঙলার সমস্ত গানের রেশই তাঁর গানে পরিষ্কার। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গমকের ব্যবহারও যে এমন অপূর্ব হতে পারে রবীন্দ্রনাথের আগে কে তা জানত! অথচ তিনি গ্রহণ করেছেন সব ক্ষেত্র থেকেই কিছু-না-কিছু, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই; বেশিকে সরিয়ে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়, অপ্রয়োজনীয় বলেই। রবীন্দ্রনাথ তাই একালের হয়েও সর্বকালের, সর্বজনের।

পুরোনোকে নতুন ছাঁচে ঢালবার এই উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ থেকেই আমরা পেয়েছি। 'বসন্ত' ছবিটির কতকগুলি গান জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেগুলো এদেশের একদা চলতি পুরোনো গান। কাজেই, সমস্ত গানকেই সময়ের অর্থাৎ বর্তমান কালের রূপ পেতে হবে। একালের অনুভবকেই সুরের ও কথার ভিতর দিয়ে তুলে ধরতে হবে। কবি জয়দেবের গান তাঁর নির্দেশ মতোই গাওয়া হত শুদ্ধ রাগ-রাগিনীতে। কালে তা বদলেছে; কীর্তনীয়ারা নিজেদের ঢঙে গেয়েছে। গানের রূপ তাই বদলাতে পারে। নিধুবাবু, গোপাল উড়ের টপ্পা, নানা ধরনের কীর্তন, মনোহরসাঁই, এগুলোকে ভেঙে আবার তৈরি করা প্রয়োজন। গানের রূপ না বদলালে গান ভাষা পাবে না কারো মনে। ছবির গান সম্পর্কেও এই কথা।
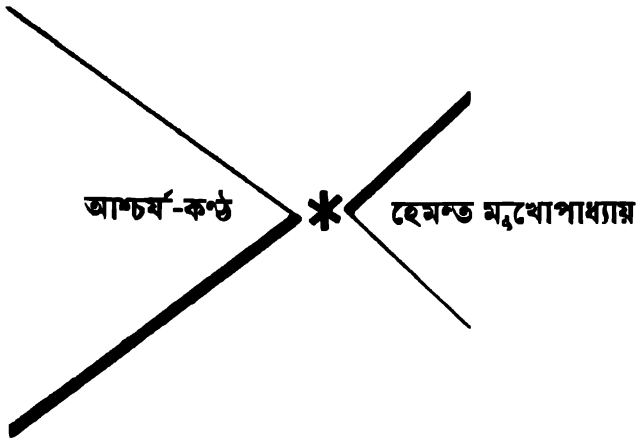
খ্যাতিই শিল্পীর সবচেয়ে বড় শাস্তি। এবিষয়ে পৃথিবীর মনোভাবটা অতি সরল : হয় শিল্পীর জীবদ্দশায় তাঁর নামও কেউ উচ্চারণ করবে না; আর না হলে রঙিন বেলুনের মতো তাঁকে নিয়ে এত বেশি লোফালুফি করবে যে তাঁর নিজের বলে কোনো সময় আলাদা করে রাখা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে যাতে তিনি তাঁর স্বোপার্জিত কীর্তি-খ্যাতির ভারি মুকুট নামিয়ে রেখে নিজের আসল কাজে আর মন বসাতে পারবেন না। তার উপরে আছে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে জীবন-ধারণের কঠিন সমস্যা। দিনের একটা প্রকাণ্ড বড় অংশ শুধু শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে কোনো দামে বিক্রি করে দিতেই হবে। খ্যাতি আর জীবিকার দ্বিবিধ বিড়ম্বনা কাটিয়ে তবু কোনো শিল্পীর পক্ষে নিজের আদর্শে স্থির থাকতে হলে যে কত জটিল চিত্তক্ষোভের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার প্রমাণ—কোনো এক আধুনিক লেখকের ভাষা ধার করে বলি —'আশ্চর্য-কণ্ঠ' হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তবু তো তিনি মুগ্ধ শ্রোতাদের চিঠিপত্রের কোনো জবাবই নিজের হাতে লেখেন না। সেসব স্তব, স্তুতি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার প্রাপ্তি স্বীকার করেন তাঁর হয়ে তাঁর বন্ধুরা, আর না হলে তাঁর স্ত্রী : বেলা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাহলেও দিনের কতটা অংশ তাঁকে জীবিকার জটিলতায় আর ভক্তদের তুষ্টিসাধনে ব্যয় করতে হয়—তাঁর কোনো সাধারণত-ব্যস্ত রবিবারের কথা শুনলেই সেটা আন্দাজ করা যাবে। কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানি গায়ক তৈরি করার জন্য কিছুদিন আগে একটি ক্লাশ খুলেছেন। মনে করুন কোনো একজন শিল্পীকে যদি এই গানের ইস্কুলে সকাল আটটা থেকে সাড়ে-ন'টা ছেলেদের, তারপরে পৌনে-এগারোটা অবধি মেয়েদের গান শিখিয়ে, বেলা এগারোটায় উত্তর কলকাতার, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই দূরে হাওড়ার দুই সিনেমাগৃহে পর পর দুটি বিভিন্ন চ্যারিটি শো উপলক্ষে গান গেয়ে পৌনে-একটায় ভবানীপুরে বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া করতে হয়, আর নাকেমুখে খেয়ে উঠেই ছুটতে হয় বেলা
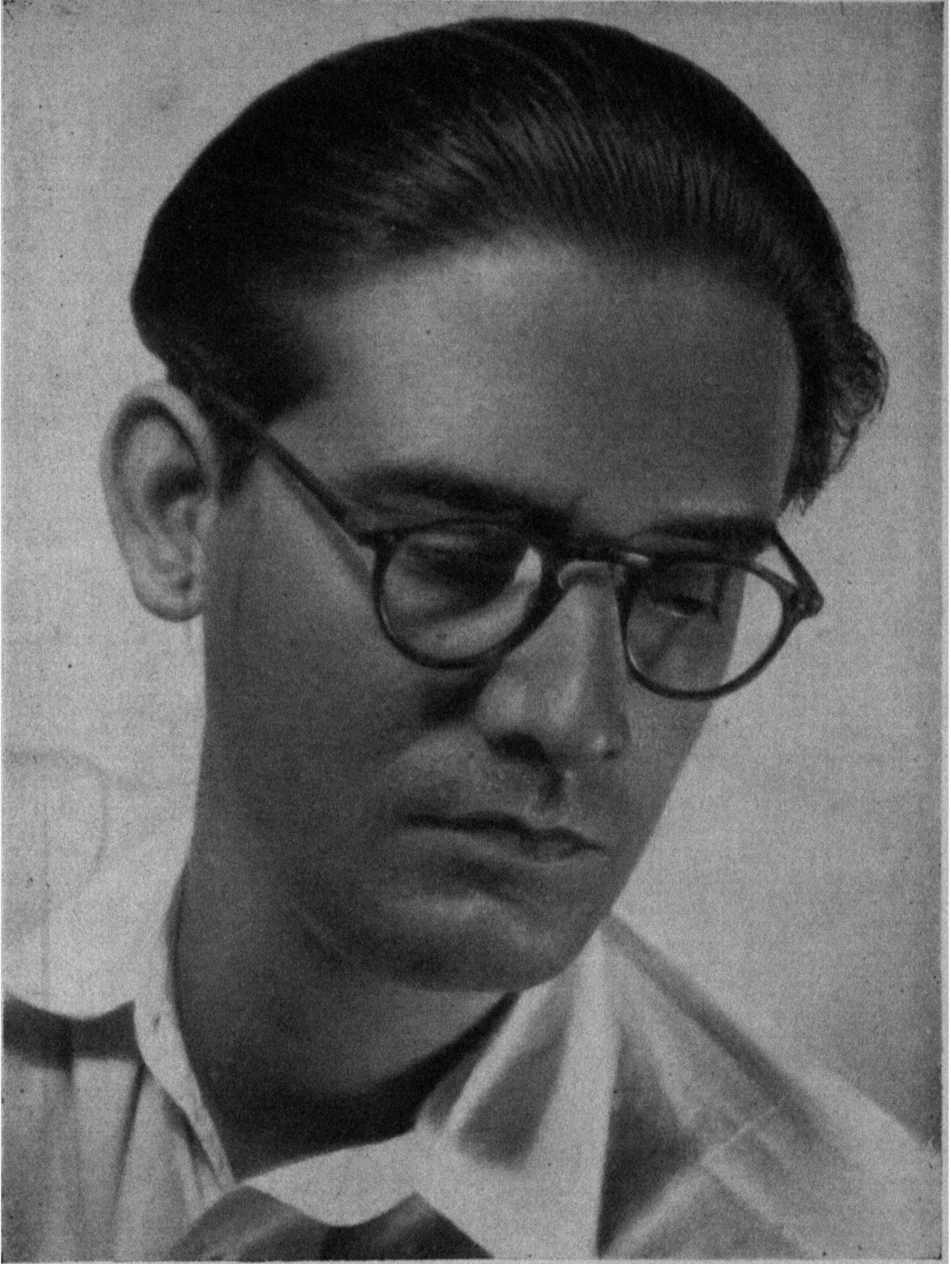
ফটো : গোপাল সান্যাল

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

দুটো থেকে পাঁচ, সাড়ে-পাঁচ এমনকি ছ'টা অবধি আবার কলম্বিয়ার ক্লাশে গান শেখাতে, তারপর গান শিখিয়ে উঠেই সোজা চলে যেতে হয় প্রেস ক্লাবের সাড়ে-ছ'টার জলসায়, আর জলসার লুব্ধ শ্রোতাদের উপরোধে দুখানার জায়গায় চার-পাঁচখানা গান শুনিয়ে রাত্রিতে বাড়ি ফেরার পথে বালিগঞ্জের আর এক পাড়ায় আর এক চ্যারিটি শোতে হাজিরা দিয়ে আসতে হয়—তাহলে ঘুম আর খাওয়ার সময় ছাড়া কতটুকু সময় বাকি থাকে তাঁর নিজের জন্য যখন তিনি একলা বসে গলা সাধতে পারেন, কিম্বা তাঁর সঙ্গীত সাধনার কোনো অঙ্গ অপূর্ণ থাকলে ইচ্ছামতো পূর্ণ করতে পারেন সেই ইচ্ছা!

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই বিপজ্জনক খ্যাতির মূলে আছে তাঁর দরদভরা গানের আশ্চর্য কণ্ঠ। গান তো অনেকেই গায়, সেসব গান শুনতেও ভালো লাগে। কিন্তু হেমন্তকুমার তাঁর গলার স্বরে যেমন জাদু করতে জানেন, পেঁাছিয়ে দিতে পারেন ভাষার পরপারে সুরের মর্মলোকে তেমনটা সকলে পারে না। সুর যেন রূপকথার রাজকন্যা, ঘুমের খাটে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে। গান দিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলার জাদু যে জানে তাকেই বলে গুণী। হেমন্তকুমার পারেন সেই সুরের ঘুম ভাঙাতে। গলায় যদি সুরের সরসতা না থাকে, গানে যদি সুস্নিগ্ধ আবেগ না থাকে, তাহলে নির্ভুল সুরে, গানের কঠিনতম ব্যাকরণ মেনে অবিকল গাইলেও সে গান যে বেশি লোকের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে না এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর প্রিয়তম গায়ক হচ্ছেন—আরো অনেকেই যেকথা স্বীকার করবেন—আবদুল করিম খাঁ আর কেশর বাঈ। কিন্তু সুরে শুধুমাত্র দরদ আর প্রাণে আমেজ থাকলেও গায়ক হওয়া যায় না (আজকাল যদিও হামেশাই যায়—যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ রেডিওর সাতমিশেলী চিৎকার, যে কলরব শুনে কান বধির হওয়ার দশা)। হেমন্তকুমার সেই ধরনের শিল্পী—জনপ্রিয় হয়েও সস্তায় মনোরঞ্জন করার জন্য যাঁর কোনোই আগ্রহ নেই। একালে বাঙলাদেশে গানের রুচি অবশ্য অদ্ভুত। শ্রোতাদের কথা ছেড়েই দিলাম, এমনকি গায়কদের মধ্যেও বিশুদ্ধ সুরের প্রতি ভালোবাসা আর সেই সুর আয়ত্ত করার জন্য নিরলস সাধনা নিতান্ত বিরল। সা-রে-গা-মা শিখেই উচ্চা-ভিলাষী হবু-গায়ক-গায়িকা খোঁজ নিতে আরম্ভ করেন কোন কোম্পানিতে কাকে ধরলে একখানা রেকর্ড করানো যায়, আর রেডিওতে ক'মিনিট গাইতে গেলে কত পারিশ্রমিক মেলে। এহেন গায়ক আর শ্রোতাদের কাছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'কথা কোয়ো নাকো' গানখানা 'ভীষণ' ভালো লাগারই কথা। গায়ক নিজে কিন্তু আজ পর্যন্ত বুঝতে পারেননি তাঁর নিজের অন্যান্য প্রিয় গানের তুলনায় এই নামগোত্রহীন গানখানির এত আদর হওয়ার রহস্য কি! কম পক্ষে দুশো গান তাঁর রেকর্ড হয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। রেকর্ডে গাওয়া এই সব গানের মধ্যে তাঁর নিজের প্রিয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাঙ্গনে মোর শিরীষ শাখায়' আর আধুনিকের মধ্যে 'সে এক গাঁয়ের বধূ'। কিন্তু বাঙালী শ্রোতা বেশি ভালোবাসেন

ঐ 'কথা কোয়ো নাকো', যে গানের কথা কোনোদিন না লেখা হলেও বাংলাভাষার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না।

কাজেই পাঁচমিশেলী সুরে, চমকপ্রদ ভঙ্গী এনে, যাকে বলে আসর মাত করে দেওয়া, তা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হত। কিন্তু ভৈরবীর উদার আমেজভরা তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মার্গসংগীতে এই গায়কের শিক্ষা না থেকেই পারে না। কেননা যে আধুনিক গানের জন্য তাঁর খ্যাতি সেই আধুনিক গানের মধ্যে বিশেষ কোনো বিশুদ্ধ সুরের জমি যদিও সাধারণত অনুপস্থিত — তবু গায়ক হতে হলে, সত্যিকারের শিল্পী মন নিয়ে গানের চর্চা করতে গেলে মার্গসংগীতে রুচি আর শিক্ষা না থাকলে তা অসম্ভব।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা কেটেছে বাঙলাদেশের বাইরে — কাশীতে। তিরিশ সালের সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় এদেশে গানের একটা বন্যা এসেছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে দু'চার পয়সা দামে কেনা হলদে মলাটের স্বদেশী গানের বই হাতে নিয়ে বালক হেমন্তকুমার গুনগুন করে সেসময় অসংখ্য গান নিজের মনে সুর লাগিয়ে গেয়েছেন। আর কোনো শিক্ষার সুযোগ না থাক, প্রাণে তখন গানের আবেগ জেগেছে। গঙ্গার বুকে সকাল বেলার রোদ পড়েছে এসে, ওদিকে বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়া উঠেছে আকাশের দিকে। ঘাটের সিঁড়িতে বসে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে আপন মনে গুনগুন করে যে সুর তার মনের তারে বেঁধে নিল — বিশ্বভরা উদার ভৈরবী ছাড়া তাকে আর কি দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব? অজান্তে ছেলেটি ভৈরবী সুরের প্রেমে পড়ে গেল।

তারপরে হেমন্তকুমার কলকাতায় পড়তে এলেন, বন্ধুর উপরোধে ভয়ে ভয়ে রেডিও অপিসে গিয়ে গানের মহড়া দিয়ে এলেন, বন্ধুর লেখা : 'আমার গানেতে এলে নবরূপে চিরন্তন' গানখানি গেয়েও এলেন রেডিওতে। ক্রমে বুঝলেন জীবনে তাঁর কাজ এঞ্জিনিয়ার হয়ে স্বর্ণসিদ্ধি লাভ করা নয়, তাঁর আসল কাজ হচ্ছে সুর-সরস্বতীর সাধনা। নিশ্চিত অর্থকরী পথ ছেড়ে গানের অনিশ্চিত দুর্গম পথে সর্বস্ব পণ করে পা বাড়ানো রীতিমতো দুঃসাহস। কেননা গান আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু শাদা রুটিতে একপোঁচ মাখন দেওয়ার সাধ্য তার যে আছেই একথা সব সময় নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাছাড়া এখন পর্যন্ত এদেশে সংগীত হচ্ছে সেই ধরনের শিল্প জীবনে যার প্রয়োজন এতোই স্বতঃসিদ্ধ যে তাকে আলাদা করে সম্মান দেওয়ার কথা কারো মনেই পড়ে না। এমন কি ছবি আঁকারও ইস্কুল আছে, পাশ করলে ডিগ্রী পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনো গানের প্রতিষ্ঠান নেই গায়ক যেখানে জীবিকার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সম্মানপত্র লাভ করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নির্ভর করতে হয় জনসাধারণের চলতি রুচির উপরে। মানুষকে আনন্দ দিতে পারছেন কিনা শিল্পী মাত্রেরই সেটাই অবশ্য প্রধান পরীক্ষা। কিন্তু জীবিকা হিসাবে এই ব্যবস্থা এতদূর নির্ভরের-অযোগ্য যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় তাঁর পুত্র

জয়ন্তকে গায়ক করে তুলতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। জয়ন্ত এখনো তিন বছরের শিশু। সে যখন বড় হবে তখনো কি গানের এই দশা থাকবে বাঙলাদেশে? বলা যায় না।

যাই হোক হেমন্তকুমার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়লেন, বদলে গেল জীবনের ছক। যাকে বলে রীতিমতো গান শেখা—সে বিষয়ে তিনি প্রথম পাঠ নিলেন বিখ্যাত বাদল খাঁর সুযোগ্য ছাত্র শ্রীশৈলেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত মশাইর কাছে। এদিকে শচীন দেব বর্মণ আর পঙ্কজ মল্লিকের তখন নতুন নতুন যত রেকর্ড বেরোচ্ছে সব তিনি মহা উৎসাহে গলায় তুলে নিচ্ছেন। তার পর মার্গসংগীতে রীতিমতো শিক্ষা আরম্ভ হল শ্রীফনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তানপুরায় সুর বেঁধে দু'বছর গলা সাধলেন। ভূপালি, টোড়ি, ইমন, দরবারী কানাড়া আর বিশেষ করে ভৈরোঁ, ভৈরবীর চর্চা চললো।

গানের রেওয়াজ করার পক্ষে দু'বছর সময় অবশ্য কিছুই নয়, ফলে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে আরো কত ইচ্ছাই তাঁর আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। এখনো তাঁর ইচ্ছা আছে মন দিয়ে একবার ধ্রুপদ অঙ্গের কীর্তন শিখে নেবেন। গায়কের পক্ষে তিরিশ বছর বয়স তো সবেমাত্র জীবনের আরম্ভ! উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন কীর্তনীয়া শ্রীহরিদাস করের কথা বলতে বলতে। বলেন, কীর্তনই হচ্ছে বাঙলাদেশের নিজস্ব মার্গ-সংগীতের রূপ। তাঁর নিজের দেওয়া সুরেও তাই প্রায়ই কীর্তনের ঢঙ দেখা যায়। সে যাই হোক, গানের জন্য নিজেকে তৈরি করার সময় ঐ মার্গসংগীতে সুর সাধার অভ্যাস পরবর্তীকালে তাঁর গলায় এমন একটা গভীর গম্ভীর আমেজ এনে দিয়েছে, যার জন্য আধুনিকদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ করে চোখে পড়ে। গান বিষয়ে সূক্ষ্ম বোধটাই যেন মরে গেছে দেশে। না হলে এরকম অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠের যিনি অধিকারী তাঁর গানের রেকর্ডে বেরসিক যন্ত্রসুরের এতদূর অত্যাচার সহ্য করা হচ্ছে কেন? খালি গলায় ভৈরবী ঢঙের পাঞ্জাবী হীর সংগীতের সুর নিয়ে তাঁর গাওয়া 'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়' গানখানি যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা যদি পাশা-পাশি 'গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে' গানখানি শোনেন, তাহলেই দেখবেন যন্ত্র-সংগীতের অকারণ অত্যাচার কিরকম যন্ত্রনা দেয়। গোধূলি লগনের সঙ্গে ডুম্ ডুম্ আওয়াজের কি সম্পর্ক আছে কে জানে!

রেকর্ডে, রেডিওতে, সিনেমায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দৈবকণ্ঠের আশ্চর্য গান শুনে লক্ষ লক্ষ লোক আজ মুগ্ধ। এমন সময় গেছে, বছরে যখন অন্তত একশো গান তাঁকে গাইতেই হত রেডিওতে। 'প্রাঙ্গনে মোর শিরীষ শাখায়' কিংবা আধুনিক 'রজনীগন্ধা ঘুমাও' ইত্যাদি বহু গান শ্রোতাদের অনুরোধে অসংখ্য বার তাঁকে রেডিওতে শোনাতে হয়েছে। আর তেমন তেমন উৎসাহী শ্রোতা পেলে হেমন্তকুমার অবিরল অজস্রভাবে যেরকম প্রাণখুলে গান গাইতে পারেন তা শুনে স্তম্ভিত হতে হয়। জব্বলপুর ল কলেজে সেবার শীতের সময় জলসার আয়োজন হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে চাঁদোয়া খাটিয়ে গানের আসর বসেছে। পায়ে হেঁটে, সাইকেল চেপে দূর দূর থেকে লোক এসেছে গান শুনতে। পনেরো কুড়ি মিনিটের বিরতি দিয়ে দিয়ে

এক এক খানা গান হচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে শুনছে সব লোক। হৈচৈ নেই, উসখুস করা নেই, ব্যস্ততা নেই। বিরতির সময়েও অত বড় আসর চুপ করে বসে আছে পরের গানের আশায়। শীত-রাত্রিতে সেই খোলা আকাশের নিচে বসে মুগ্ধ শ্রোতার প্রসন্ন পরিবেশে এমন তাঁর ভালো লেগে গেল যে সেই রাত্রিতে হেমন্তকুমার পরপর বিশ পঁচিশ খানা অন্তত গান শুনিয়ে এলেন।

কবিতা বলুন, ছবি বলুন, নৃত্য বলুন—গান যেমন এক মুহূর্তে মানুষকে জয় করে নিতে পারে, কান্নাহাসির দোলায় দুলিয়ে দিতে পারে তার মন—এমন আর কিছুতে পারে না। আর রেডিও কিম্বা রেকর্ডের যতই আমরা নিন্দা করি না কেন, রেডিও রেকর্ডের সাহায্য না পেলে কণ্ঠস্বরকে অসম্ভব দূরে দূরে পৌঁছিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রীতি জাগানো কি সম্ভব হত? হেমন্তকুমারের আশ্চর্য গলার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর এক ভক্ত সিন্ধী যুবক বহুদিন ধরে তাঁকে চিঠি লিখে আসছিলেন। এমনিতেই কারো চিঠির জবাব দেওয়া হেমন্তকুমারের স্বভাববিরুদ্ধ। তার উপরে এই সব চিঠিতে এতদূর মুগ্ধ উচ্ছ্বাস থাকত যে তিনি মনে করতেন নিশ্চয়ই ছেলের ছদ্মনামে কোনো মেয়ে লিখছেন এসব চিঠি। কাজেই চিঠির পর চিঠি আসতো, জবাব যেত না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল ছেলেটি সত্যিই ছেলে, দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। তার দিনরাত্রির একমাত্র সান্ত্বনা হচ্ছে একটি গ্রামোফোন আর হেমন্তকুমারের গানের সমস্ত রেকর্ড। দিল্লী রেডিওতে গান গাইতে গিযে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও এক ফাঁকে সময় করে হেমন্তকুমার দেখা করে এলেন ছেলেটির সঙ্গে। পরস্পর নির্বাক হয়ে কাটলো আধঘণ্টা সময়, এ ভালোবাসার যেন সীমা নেই। গান দিয়ে কার নিরানন্দ জীবনের অবশ প্রহরকে তিনি নিজে-না-জেনে ভরে দিয়েছেন ভেবে মনে বেদনা নিয়ে উঠে এলেন। কেননা নির্বোধ সময় মুমূর্ষুর মিনতিও শোনে না। কতদিন হল আর চিঠি আসে না ছেলেটির। হয়তো এতদিন সে যেখানে পৌঁছে গেছে গানের সুর ততদূর পৌঁছায় না।

গায়ক হয়েও হেমন্তকুমার আজ অর্থ সম্মান দুয়েরেই অধিকারী। রেডিওতে প্রথম যখন স্কুলের বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা গান গাইতে গেলেন তখন রেডিওতে গাইতে পারার আনন্দই ছিল একমাত্র পুরস্কার। এক বছর পরে তাঁর প্রতি গানেব মূল্য ঠিক হল পাঁচ টাকা। আজ যাঁরা রেডিওতে সবচেয়ে বেশি টাকা পাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে পঙ্কজকুমারের পরেই তাঁর স্থান। রেকর্ডের অবস্থাও ছিল ঐ রকম। রেকর্ড কোম্পানির দরজায় দরজায় একদিন ধর্ণা দিয়েও কোনো পাত্তা পাননি। কলম্বিয়ার সঙ্গীত পরিচালক শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্তের কাছে তাই তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কেননা শৈলেশবাবুর নির্ভুল কান এই গায়কের কণ্ঠের মর্যাদা সেদিন ঠিক ধরতে পেরেছিল। গায়ক নির্বাচন আর গায়ক তৈরি করায় এই নীরব কর্মীর কৃতিত্বের তুলনা মেলা ভার। শৈলেশবাবুই প্রথম হেমন্তকুমারকে দিয়ে কলম্বিয়ার জন্য দুখানি আধুনিক সুরের গান গাওয়ালেন, 'জানিতে যদি গো, তুমি,' আর 'বল গো মোরে'।

প্রতি গানের দক্ষিণা দশটাকা। এই রকমই দুর্দশা ছিল বাঙলাদেশের গায়কের—মাত্র বারো-তেরো বছর আগেও। বেশ কিছুদিন পরে তাঁর 'রজনীগন্ধা ঘুমাও' গানখানি যখন শ্রোতামহলে রীতিমতো সাড়া জাগাল তখন থেকে ঠিক হল রেকর্ডের জন্য হেমন্তকুমার রয়াল্‌টি পাবেন।

জীবিকার জন্য পরে তাঁকে চলচ্চিত্রেও বহু গান গাইতে হয়েছে। ফিল্মে গাওয়ার জন্য তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কবি অজয় ভট্টাচার্য। পরে চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনার কাজ পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গায়ক হিসাবে হেমন্তকুমারের যে সুখ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত, সংগীত পরিচালক হিসাবে সেই সুখ্যাতি তিনি এখনো পাননি। তার একটা কারণ অবশ্য স্পষ্টই চোখে পড়ে। তাঁর গান শুনে যাঁরা মুগ্ধ, তাঁর সংগীত পরিচালনায় ঠিক ততখানি মুগ্ধ হওয়ার প্রত্যাশাই তাঁরা করেছেন। কিন্তু যাঁদের হাতে বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের ভার তাঁদের না আছে রুচি, না আছে অর্থ। দশখানা বেহালা না হলে যেখানে ঠিক মতো সুরের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না, সেখানে তাঁরা দুটো বেহালা দিয়েই কোনো রকমে কাজ চালিয়ে নিতে বলেন। এ অবস্থার মধ্যে শক্তি থাকলেও তার যথাযথ রূপ দেওয়ার সাধ্য থাকে না। নিজে সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তবু তিনি '৪২' নামে ছবিখানায় তাঁর যথাসাধ্য সুরযোজনা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সে ছবিখানা আর শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারা গেল না। চলচ্চিত্রে অন্যের হয়ে গান গাওয়া কিম্বা সুরযোজনা করা ছাড়া তাঁকে দিয়ে কোনো গায়ক চরিত্রের অভিনয় করানোর চেষ্টাও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু এবিষয়ে সলজ্জ সংকুচিত হেমন্তকুমারের শিল্পীসুলভ অনিচ্ছা অতি প্রবল।

আধুনিক-গান গেয়েই তাঁর নাম হয়েছে বেশি। কিন্তু আধুনিক গানের হত-দরিদ্র ভাষা তাঁকে বরাবর পীড়া দিয়েছে। বিশুদ্ধ সংগীতে ভাষার দান অতি সামান্য, নিতান্তই ভাষার একটা অবলম্বন না পেলে কণ্ঠের সুর পাখা মেলতে পারে না বলেই যেন ঐ গদ্য জিনিসটাকে কোনোরকমে স্বীকার করা হয় মাত্র। কিন্তু বাংলা গানে কথা আর সুরের মিশ্রণ অত্যন্ত নিবিড়। কিন্নরকণ্ঠের সুর হলেও বাংলাগানের পংগু ভাষা তাকে লাঠি পেটা করে হত্যা করে। হেমন্তকুমারের মতো অনুভূতিশীল গায়কের পক্ষে তাই রবীন্দ্রসংগীতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মার্গ। আর তাঁর গলার এমন একটা অন্তরংগ গুণ আছে যে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গান, বিশেষত যার মধ্যে ভৈরবী সুরের আমেজ আছে—তা হেমন্তকুমারের গলায় আশ্চর্য খুলে যায়। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের সুরবৈচিত্র্যও তাঁকে বরাবর আকর্ষণ করে। কেননা সে সুরের মধ্যে প্রবাহ আছে, গতি আছে; আধুনিক সুরের মতো তা শতবার ভেঙে পড়ে না। সকলের গলায় মানায় না রবীন্দ্রনাথের গান। যাঁদের গলায় মানায় তাঁদেরও সব গান মানায় না। দুঃখের কথা হেমন্তের আশ্চর্য চিত্তস্পর্শী গলায় তাঁর মেজাজের উপযোগী আরো বেশি রবীন্দ্রসংগীত এখনো আমরা শুনতে পেলাম না।

হেমন্তকুমার আজ যশের অধিকারী। অর্থের জন্য এখন তাঁকে আর বাড়িতে বাড়িতে গানের মাস্টারী না করলেও চলে। রেকর্ড, রেডিও, ফিল্ম—সমস্ত দরজাই আজ খোলা তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি জানেন এই প্রতিষ্ঠালাভ করতে গিয়ে, গানের মতো অনর্থকরী বৃত্তি নিয়ে জীবিকার স্বন্দ্ব ঘুচাতে গিয়ে, তাঁকে সুর-সরস্বতীর যথার্থ সাধনা থেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে আনতে হয়েছে। আবার আজকাল তাই তিনি সুরসাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। আবার তানপুরা হাতে সুরের রেওয়াজ করছেন রোজ সকালে। দেশ ঘুরে লোকসংগীতের সুর সংগ্রহের আশা এখনো তিনি জাগিয়ে রেখেছেন মনে। কাজেই খ্যাতিই যদিও স্বল্পশক্তি শিল্পীর অপমৃত্যুর প্রথম লক্ষণ, গুণী-শিল্পী হেমন্তকুমারের মধ্যে সে লক্ষণ অনুপস্থিত। আশ্চর্য কণ্ঠের মহিমা, দেহের রূপের মতোই দৈবের দান। তাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই শিল্পীর শিল্পীত্ব। বিশ্বাস করি খ্যাতির বিড়ম্বনা সত্ত্বেও হেমন্তকুমার আমাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করবেন।

*

আধুনিক কন্যাকর্তা . আমার আর্বাত-মা জিগগেস করছেন কোন গান আপনারা শুনতে চান—ববসাত অথবা চান্দনি-বাত-এব কোনো গান কি—?

বরের বন্ধু মা-বাপ-কি-লাজ কিম্বা দিল্লাগীব কোনো গান জানা নেই?

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
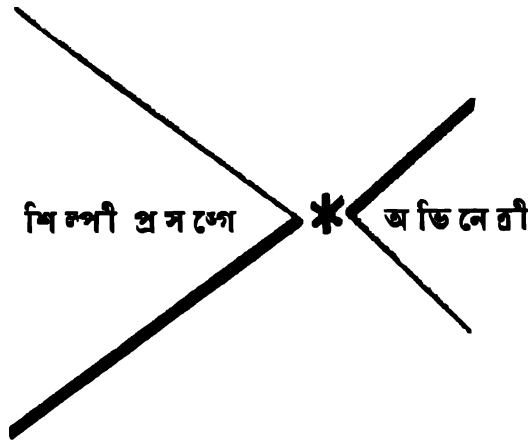
নন-কো-অপারেশনের যুগ। চাঁদপুরে নাবিক-ধর্মঘট উপলক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এসেছেন, তাঁর বক্তৃতা শুনছে বিরাট জনসভা। দেশবন্ধু হঠাৎ সঙ্গের একটি তরুণীকে বক্তৃতামঞ্চে আহ্বান করলেন, পরিচয় দিলেন, 'ইনি ভবিষ্যৎ সরোজিনী নাইডু।' উদগ্রীব জনতা উৎসুক হয়ে উঠল। আর মেয়েটি? বুক ঢিপঢিপ করছে তাঁর, দেশবন্ধু তাঁকে এত বড় সম্মান দিলেন? কি বলবেন তিনি এখানে! কি বলতে পারবেন?

সভায় সেদিন কি বলেছিলেন তিনি আজ আর তাঁর মনে নেই। রাজনীতি থেকে পরবর্তী জীবনে তিনি বহুদূর সরে এসেছেন। সেদিনের সেই দেশসেবিকা কলেজের মেয়েটি আজ চিত্রাভিনেত্রী সুপ্রভা মুখার্জী, ওরফে মিলি মুখার্জী। বাঙলার অভিনেত্রীকুলের মধ্যে এ'র স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে অনেক বিষয়ে। ইনি চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছেন ২৭ বছর বয়সে, যে-বয়সে নায়িকার ভূমিকা সচরাচর কপালে জোটে না। বিশেষত এদেশে। দ্বিতীয়ত এই কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক জাঁ রেনোয়া বিদেশ থেকে বাঙলাদেশে এসে 'দি রিভার' নামে যে ছবি তুলে নিয়ে গেলেন সেই ছবিতে ইনি সসম্মানে এবং সহজে স্থান পেয়েছেন অনেক প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে। তাছাড়া মোটা খদ্দরের শাড়ি পরে দেশবন্ধু দাসের পাশে দাঁড়িয়ে জনসভায় বক্তৃতা করেছেন আমাদের আর কোন অভিনেত্রী?

প্রথম থেকেই আরম্ভ করি। যে-পরিবারে সুপ্রভার জন্ম সেখানে শৈশব থেকেই স্বদেশীভাবাপন্ন রাজনৈতিক আলোচনা শুনতে তিনি অভ্যস্ত। প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী জে. এল. ব্যানার্জী ছিলেন তাঁর কাকা। তাছাড়া তাঁর নিজের স্বভাবটিও ছিল বড়ই আবেগপ্রবণ। ডায়োসেসন থেকে বি. এ. উপাধি নিয়েই পড়া ছেড়ে দিলেন; ভিতর

থেকে যে তাগিদ এসেছে বাবাও বাধা দিলেন না, মিলি মুখাজী রাজনীতিতে ঝাঁপ দিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উচ্ছ্বসিত স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ক্রমে হীরালাল গান্ধী, সি. এফ. এ্যাণ্ড্রুজ, মহাদেব দেশাই, সি. আর. দাস প্রভৃতি দেশনেতাদের সংস্পর্শে এলেন তিনি। দেশাইয়ের কাছে চরখা কাটা শিখলেন, দেশবন্ধুর এক নারী-প্রতিষ্ঠানের ভার এল তাঁর হাতে।

তারপর এক সময়ে আবার রাজনীতি উৎসাহে ভাঁটা পড়ল, যেমন অনেকেরই পড়ে। কেবলমাত্র সভা-সমিতি আর সংগঠনের ব্যস্ততার মধ্যে এল ক্লান্তি, দুর্নিবার উচ্ছ্বাস আপনা থেকেই শুকিয়ে গেল। এর সঙ্গে আসতে পারত শূন্যতার বেদনা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁকে রক্ষা করল আর এক সত্যিকারের আকর্ষণ — তাঁর অভিনয়-প্রীতি। তিনি নিজের পথ খুঁজে পেলেন।

অভিনয় তিনি আগেও করেছেন, তবে সে শুধুমাত্র কলেজের মঞ্চে, কলেজ নাট্য-সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন মিলি। কিন্তু এখন তাঁর বৃহত্তর ক্ষেত্র চাই যেখানে তাঁর প্রতিভার পরীক্ষা হতে পারে। এর মধ্যে পরিচয় হল হিমাংশু রায়ের সঙ্গে (তখনো 'বম্বে টকিজ' সৃষ্টি হয়নি), মিলি মায়ের কাছে নিজের আর্জি পেশ করলেন। মা আপত্তি করেছিলেন প্রথমে, শেষে মেয়ের কাতর অনুনয়ে তাঁর মন টলল; কিন্তু এক সর্তে : শুধু একটিমাত্র নাটকে অভিনয়ের অনুমতি দিলেন তিনি, তাও নিজে সর্বদা সঙ্গে থাকবেন মেয়ের। এমন সময় অকস্মাৎ আরো বাধা এল দিদির তরফ থেকে — দিদির মন আর নরম হল না। বাধ্য হয়ে আশা ছেড়ে দিতে হল।

তারপরে বিয়ের পর অভিভাবকের পরিবর্তন হল বটে, কিন্তু সেখানেও বিশেষ উৎসাহ পাওয়া গেল না। তবে আপত্তিও নিশ্চয় খুব ঘোরতর ছিল না কারণ অবশেষে সাধনা বসুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'আলিবাবা'তে অভিনয়ে সম্মতি দিলেন স্বামী। তারও সর্ত ছিল যে এই এক নাটকেই সুপ্রভাকে অভিনয়-নেশা চিরকালের মতো চরিতার্থ করতে হবে। সর্ত অবশ্য সর্তই থেকেছে! ফলে 'আলিবাবা'র ফতিমা পরে হলেন 'চোখের বালি'র বিনোদিনী। তারপর আজ পর্যন্ত 'প্রতিশ্রুতি', 'কৃষ্ণলীলা', 'স্বামিজী', 'অভিনয় নয়', 'ভুলি নাই', 'শোধবোধ' এবং আরো অনেক বাংলা ও হিন্দী ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে — কখনো কখনো প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে; 'দি রিভার' ছবিতেও আমরা শিগগিরই তাঁকে দেখব অন্য এক অভিনব রূপে — ইংরেজ গৃহে আয়ার ভূমিকায়।

সুপ্রভা মুখাজীর নিজের মতে 'ভুলি নাই' আর 'চোখের বালি' হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি, কিন্তু উপরোক্ত ঐ বিদেশী ছবিটিতে কাজ করে যে-আনন্দ তিনি পেয়েছেন এমন আর কোনো ছবিতে নয়। এই প্রসঙ্গের আলোচনায় আমাদের ফিল্ম-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের যে পরিচয় পাওয়া গেল তা হয়তো সমর্থন

করবেন আরো অনেকেই। 'দি রিভার' ছবির গল্প লিখেছেন এক ইংরেজ মহিলা আমাদের বাঙলা দেশের নদীকে কেন্দ্র করে। ছবি তুলতে এসেছেন বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী পরিচালক জাঁ রেনোয়া আর তাঁর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, অভিনয় করেছেন নানা দেশের লোক। অথচ এই ছবি তোলার সময় আরো অনেকের মতো সুপ্রভা মুখার্জীও অনুভব করেছেন দলের একজন হয়ে একযোগে কাজ করার আশ্চর্য আনন্দ। তাঁর মতে এটা সম্ভব হয়েছে রেনোয়া-র ব্যক্তিগত ক্ষমতার গুণে; তিনি শুধু-মাত্র অভিনেতাদের উপর হুকুম চালিয়ে ছবি তোলেন না। প্রথমত, তিনি কার কি রকমের চরিত্র, কাহিনীর সঙ্গে যোগ কোথায় ইত্যাদি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন; দ্বিতীয়ত, অভিনয়ের বিষয়ে কারো মাথায় যদি কোনো বুদ্ধি খেলে তবে তা মন দিয়ে শোনেন এবং ভালো লাগলে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন।...আমাদের দেশে ক্যামেরার সামনে আসার আগে পর্যন্ত অভিনেতা নাকি অনেক সময়ে জানতেই পারেন না কাহিনীটা কি এবং তাঁকে কি কি করতে বা বলতে হবে।

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে আছে অনেক দুর্ব্যবস্থা ও অব্যবস্থা, সত্যিকারের শিল্পীকে নিরুৎসাহ করবার মতো নানাবিধ বাধাবিপত্তি, তবু এরই মধ্যে যে অনেকে অভিনয় শক্তির যথার্থ পরিচয় দিতে পেরেছেন, সুপ্রভা মুখার্জীর মতে এ অত্যন্ত আশ্চর্য ঘটনা। চন্দ্রাবতী, মলিনা, কানন, পাহাড়ী, জহর, ছবি বিশ্বাস—এ'দের খ্যাতি এ'দের সহজাত অভিনয়-প্রতিভার গুণেই, কোনো অভিনয়-শিক্ষার স্কুলে শিক্ষানবিশী করার সুযোগ নেই এখানে বিদেশের মতো। এই চিন্তা সুপ্রভাকে অনেকবার চঞ্চল করেছে, অনেকবার তাঁর মনে হয়েছে বিদেশের মতো এখানেও একটি অভিনয়-শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে বেশ হত।

সে-সুযোগ হয়নি, হয়তো হবেও না, কিন্তু সুপ্রভার মন এখনো শিক্ষালুব্ধ। প্রতি সপ্তাহে তিনি ছবি দেখতে যান এবং কোন ছবি দেখবেন তা সযত্নে বাছাই করেন। সম্প্রতি যেসব ছবি দেখেছেন তার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছে 'ম্যাডনেস অভ দি হার্ট', 'দি এয়ারেস', 'স্ট্রমবোলি'; কিন্তু আজ পর্যন্ত বিদেশী ছবির মধ্যে তাঁকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে 'লা বেল্ এ লা বেইত্'। পরিচালকদের মধ্যে জাঁ রেনোয়া, রেনে ক্লেয়ার, রুবেন মামুলিয়ান তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র; অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে গ্রীয়ার গার্সন, গ্রেটা গার্বো, ইনগ্রিড বার্গম্যান, চার্লস বোয়ার, পল মুনি, ওয়ালটার পিজান। গ্রীয়ার গার্সন তাঁর নিজের অভিনয় প্রভাবান্বিত করেছেন একথা তিনি স্বীকার করেন। বাংলা ও হিন্দী ভাষার যত ছবি তিনি এপর্যন্ত দেখেছেন তার মধ্যে তাঁর সব চেয়ে ভালো লেগেছে বাংলা 'ভুলি নাই' আর হিন্দী 'পড়োশী'।

রুচির এই পরিচয় থেকে অনেকখানি বোঝা যায় সুপ্রভা মুখার্জী কি ধরনের শিল্পী। উনি নিজে বলেন এমন ভূমিকা তাঁর পছন্দ যাতে চরিত্র অঙ্কনই প্রধান। কিন্তু হয়তো এই উক্তির মধ্যে একটুখানি অভিমান, একটুখানি ব্যর্থতা প্রচ্ছন্ন আছে। বহুদিন থেকে তাঁর মনে ইচ্ছা ছিল শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর চরিত্রে অভিনয় করবেন

তিনি। ছবিটি যখন তোলা হয় তখন একবার সেরকম কথাও উঠেছিল, কিন্তু পরিচালক তাঁকে জানিয়ে দিলেন বয়স তাঁর পেরিয়ে গেছে। কিরণময়ীর ভূমিকায় বয়সের মিলের চেয়েও আরো বেশি জরুরী জিনিস ছিল এবং সে বিচারে সুপ্রভা হয়তো অনেক কনিষ্ঠাকে হার মানাতেন।

চলচ্চিত্রের পর্দার চেয়ে রঙ্গমঞ্চ তাঁকে বরাবরই বেশি আকর্ষণ করে, অনেকগুলি কারণে। মুখোমুখি দর্শককে মুগ্ধ করার সুযোগ থাকলে অভিনয়ে প্রাণ জাগে সহজে। মঞ্চের অভিনয় চলচ্চিত্রের মতো ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অংশে খণ্ডিত নয় বলে সেই উদ্দীপনার সঙ্গতিও রক্ষা করতে হয় অভিনেতাকে। তাছাড়া কাহিনীর সবখানি জানা থাকে, নিজের চরিত্র সম্বন্ধে ভাববার সুযোগ পাওয়া যায় বেশি, এবং চলচ্চিত্রের তুলনায় পরিচালকের প্রভাব থেকে অনেকখানি বেশি মুক্ত হওয়া যায়। অথচ সাধনা বসুর ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এর দু'তিনটি নাটকে অভিনয়ের পরে তিনি ইচ্ছে করেই মঞ্চ থেকে সরে এসেছেন—যে-স্বাধীনতা ও সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন বোধহয় তা পাওয়া যায়নি বলেই।

রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর ভালো লাগে। 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে' অথবা 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে' গুনগুন করে গাইতে ভালোবাসেন; যদিও নিজে বলেন স্নানঘরের বাইরে গাইতে বড় একটা সাহস হয় না তাঁর। কিন্তু ইংরেজী সঙ্গীত যত্ন করে বিদেশী শিক্ষকের কাছে শেখেন; প্রধানত বিদেশী হালকা সঙ্গীতেরই তিনি পক্ষপাতী, ক্ল্যাসিকালের দিকেও ইচ্ছা যায়। নাচের রুচিও অনেকটা সেই রকম—দেশী নাচ জানেন না, কিন্তু বিদেশী নৃত্যে সুখ্যাতি আছে, বিশেষ করে ট্যাঙ্গো তাঁর পছন্দ। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে দেশে উদয়শঙ্কর ও রুক্মিনী দেবী, বিদেশে ফ্রেড এ্যাসটেয়ার ও জিন্‌জার রজারস্‌ তাঁর প্রিয়।

অবসর বিনোদনে বই আর রান্নাও সাহায্য করে। পাঠ্যের মধ্যে নাটক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মিলির পছন্দ। রান্নাঘরে কারো কাছে হার মানতে রাজী নন, বহুবিধ দেশী ও বিলাতী রান্নায় হাত তাঁর পাকা।

বাঙলাদেশে আরো অনেক অভিনেত্রী আছেন এখনো যাঁরা যৌবনের প্রথম কোঠায় এবং যাঁদের অভিনয়-জীবনের এই শুরু। এ'দের যথার্থ বিচারের সময় এখনো আসেনি। সুপ্রভা মুখার্জী স্বতন্ত্র শ্রেণীর। প্রথমত তিনি অন্য যুগের থেকে এবং অনেকটা অন্য জগতের থেকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে এসেছেন। সাধনা বসু, দেবিকারানী প্রমুখ যাঁরা অভিনয়বৃত্তি গ্রহণ করে প্রথম ভদ্রঘরের মেয়েদের পথ প্রদর্শন করেন ইনি তাঁদেরই একজন। তাছাড়া আজ তিনি চল্লিশের কাছাকাছি, চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর পনেরো বছরের বেশি। ইতিমধ্যে যাঁরা তাঁকে ভালো করে লক্ষ্য করেছেন এবং যাঁদের চোখে ছবির নায়ক-নায়িকাই একমাত্র দ্রষ্টব্য নয়, তাঁরা বোধহয় স্বীকার করবেন যে বাঙলা দেশের চিত্রাকাশে বহুদিন ধরে এই তারকা যে স্থির দীপ্তি বিকিরণ করেছেন তার তুলনা খুব বেশি নেই।

শোভা সেন

হলুদমাখা শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন লক্ষ্মী-শ্রী-সম্পন্না মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বৌ। চিনতে অবশ্য কষ্ট হল না, যদিও পর্দার গায়ে এ'কে যা দেখেছি তাতে যেন ধারণা হয়েছিল বয়সে আরো বড়। চোখে বুদ্ধির আভাস, চশমা পরাতে একটা অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের ভাবও এসেছে।

ঈষৎ বিব্রতভাবে মাথার কাপড়টা অল্প একটু টেনে দিলেন শোভা সেন। নমস্কার বিনিময়ের পরে বসতে বলে জিগগেস করলেন, 'আপনি সেই সিগনেট প্রেস থেকে আসছেন, না?'

শান্ত মিষ্টি গলা। আবার জানতে চাইলেন তাঁর স্বামীকে ডেকে দিলে আমাদের কাজ চলতে পারে কিনা, কারণ কি বলতে কি বলে ফেলবেন এই তাঁর ভয়।

কিন্তু ও ব্যবস্থায় আমাদের চলে না। পর্দার গায়ে জনসাধারণের যেটুকু পরিচয় তাঁর সঙ্গে, তার চেয়ে বেশি ভালো করে জানতে ও জানাতে চাই বলে আজ এমন করে তাঁর ঘরোয়া জীবনে হানা দিয়েছি—হয়তো তাঁর সঙ্কোচ ও অস্বস্তির কারণ হয়েও। তাঁর অভিনয় ভালো কি মন্দ, তাঁর শিল্পপ্রতিভার প্রকৃত দাম কতখানি, এসব প্রশ্ন আপাতত অবান্তর; পাঠকরা অনায়াসে সেটা নিজের ক্ষমতায় বিচার করতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষটির বিশেষ পরিচয় যে ব্যক্তিত্ব সেইটে আবিষ্কার করা—এতে হয়তো তাঁর শিল্পের ধারা বোঝাও সহজ হবে, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যাবে।

এই যে উনি নিষ্কৃতি না পেয়ে হতাশার ভঙ্গিতে কোলে হাত রেখে বসে পড়েছেন এর মধ্যেও যেন আছে তাঁর চরিত্রের স্বাক্ষর এবং যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উনি গড়ে উঠেছেন তার ছায়া। ঢাকা শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ছাব্বিশ বছর আগে এ'র জন্ম, বাবা ডাক্তার। ঐ রকম আর দশজনের মতোই তিনি বড় হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পাস করেছেন। বিয়ে হয়েছে ভালো, স্বামী চার্টার্ড্ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একটি ছেলেও আছে বছর তিনেকের। স্বামী-পুত্র নিয়ে তাঁর সংসার এখনো আর দশজনেরই মতো। কিন্তু শোভা সেনের ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—অভিনয়ের আকর্ষণ তাঁকে চিরদিনই মুগ্ধ করেছে।

এদেশের মঞ্চ ও পর্দার শোচনীয় অবস্থার কথা আমরা সবাই জানি। আমাদের অভিনেত্রীদের ঘিরে আছে যে কলঙ্কের কানাকানি, ঐ শোচনীয়তার তা একটা মস্ত বড় অংশ। এর মধ্যে সুখের কথা এই যে, সম্প্রতি সবাইকে ঐ দলে ফেলা যায় না। অনেকে আছেন যাঁরা এসেছেন নেহাতই জীবিকার তাগিদে—আপিসের বা স্কুলের কাজে যদি যথেষ্ট রোজগার করা যেত এ'রা তাহলে হয়তো সেদিকেই যেতেন।

শোভা সেন কিন্তু এই শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত নন। টাকার অভাবে নয়, একমাত্র অভিনয়ের আকর্ষণে তিনি হয়েছেন অভিনেত্রী। এই কারণে আমাদের দেশে তিনি বিশেষ করে লক্ষ্যণীয়।

এমন একজন অভিনেত্রী কি করে ক্রমশ আজকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন তা রোমাঞ্চকর কাহিনী। ছবিতে অবশ্য ইনি যোগ দিয়েছেন মাত্র বছরখানেক হল, কিন্তু অভিনয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর অনেকদিনের। ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানে তো ছিলেনই, তারপর রেডিওতে বছরের পর বছর নিয়মিত অংশ নিয়েছেন সবশুদ্ধ প্রায় শ' পাঁচেক নাটকে। তাছাড়া মঞ্চে অ্যামেচার সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'নবান্ন', 'পূর্ণগ্রাস', 'তরঙ্গ' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছেন বাঙলাদেশের বহু জায়গায়। ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে নিশ্চয় অনেকেরই মনে আছে। চিত্রজগতে আসবার ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকেই। হঠাৎ সুযোগ এল গত বছর : উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে লেখা 'ছিন্নমূল' বইয়ের চিত্ররূপের পরিকল্পনা চলছে, এমন সময়ে প্রধান স্ত্রী-ভূমিকার প্রস্তাব নিয়ে এলেন ডিরেক্টার-ফোটোগ্রাফার নিমাই ঘোষ। স্বামী শুনে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যেতে বললেন। এর থেকে শুরু, তারপর শোভা সেনকে আমরা 'পরিবর্তন', 'বামুনের মেয়ে' ও 'তথাপি' ছবিতে দেখেছি এবং সম্প্রতি উনি আরো গোটা সাতেক ছবিতে ব্যস্ত আছেন।

চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ার নামে আত্মীয় বা বন্ধু নিশ্চয় আপত্তি তুলেছিলেন? এর জবাবে শোভা সেন হাতের চুড়িগুলির দিকে চেয়ে উল্টো আমাকেই প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁ, সে 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ের সময়েও করেছিলেন, কিন্তু সে বাধা কি মানা উচিত, বলুন তো?"

বলা বোধহয় বাহুল্য কি শ্রেণীর ভূমিকা শোভা সেনের পছন্দ। এযাবৎ যে ক'টি ছবি করেছেন তার মধ্যে 'ছিন্নমূল' এবং ঐ নাটকে তাঁর নিজের অংশটি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে। জীবনের সঙ্গে যাদের সত্যিকারের যোগ আছে বা যারা নির্যাতিত—এমন চরিত্র উনি চান, যদিও তাঁর মতে তেমন বই বেশি নেই আমাদের দেশে। 'বিপ্রদাস'-এর বন্দনা ও 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীকে মূর্তি দেওয়া এঁর চিরকালের উচ্চতম আকাঙ্খা। তাছাড়া দেশী ও বিদেশী চিত্রজগতের বিবিধ ক্ষেত্র সম্বন্ধে যা মতামত তিনি প্রকাশ করলেন তাতেও এই রুচিরই সমর্থন। বিদেশী অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনগ্রিড বার্গম্যান, অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যান্ড, লুইস রেইনার তাঁর আদর্শ; এদেশে মলিনা, চন্দ্রাবতী ও প্রভাকে তিনি পছন্দ করেন।

আর পুরুষদের মধ্যে?

এদেশে কোনো চিত্রাভিনেতাই তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, বিদেশে চার্লি সর্বাগ্রে, তারপর পল মুনি, লরেন্স অলিভিয়ার, ফ্রেড্‌রিক মার্চ। পরিচালক : ওদের ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপরা, উইলিয়াম ডীটের্লে, জন ফোর্ড, আলেক্‌জান্দ্রভ্‌; আমাদের সুন্দরম্‌, সোরাব মোদি, বিমল রায়, দেবকী বসু। অদ্যাবধি যেসব ছবি তাঁর মনে সবচেয়ে গভীর দাগ কেটেছে তা হল : 'রোড টু লাইফ', 'হ্যামলেট', 'পরিবর্তন', 'ভরত-মিলাপ', 'অছুৎকন্যা', 'সিকান্দার'। সাম্প্রতিক ছবির মধ্যে : 'হ্যামলেট', 'জনি বেলিন্ডা', 'স্নেক পিট', 'স্টোন ফ্লাওয়ার', 'পরিবর্তন', 'কবি', 'ভুলি নাই'। রুশীয়

ছবি যা দু'একটা দেখা যায় তা তাঁকে মুগ্ধ করে। ফুলের মধ্যে রজনীগন্ধা, আর রঙের মধ্যে শাদা যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এও যেন মিলে যায় সব কিছুর সঙ্গে।

ইতিমধ্যে একবার 'একটু আসি' বলে শোভা সেন উঠে গেলেন ভিতরে। হয়তো তাঁর অসমাপ্ত রান্নার ব্যাঘাত ঘটছে কিন্তু আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। শিল্পীর পরিচয় কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু মানুষটিকে আরো ভালো করে আবিষ্কার করা দরকার, যদিও জানি, সে অনুসন্ধান হবে কঠিনতর। মনে মনে আলাপের খসড়াটা গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময়ে দেখি চায়ের পাত্র আর খাবারের থালা উনি সাজিয়ে দিচ্ছেন সামনে।

সূচনাটি ভালোই। ঘরের হাওয়ায় জড়তা খানিকটা কেটে গেল এবং আরো নিঃসঙ্কোচে আলাপের সূত্র জোড়া লাগানো গেল। আরম্ভ করলাম একটি মামুলী প্রশ্ন দিয়ে : 'আপনি কি প্রায়ই ছবি দেখতে যান?'

'তা সপ্তাহে একটা হয়ে যায়।'

'কোনো ছবি খুব খারাপ লাগেনি?'

'নিশ্চয়, উঠে আসতে হয়, এমন ছবি বহু দেখেছি। বাংলা ছবি প্রায় সব ক'টাই কি তাই নয়?'

এই ধরনের মতে অনেকেরই হয়তো সমর্থন আছে, তবু ছবির জগতেরই একজনের মুখ থেকে শুনে একটু অবাক লাগে। আমাদের সিনেমা যে রুগ্ন এও অবশ্য তার লক্ষণ মাত্র।

'আর হিন্দী?'

'অসহ্য লাগে, তবে বাংলার চেয়ে খারাপ নয়। আমি অবশ্য বেশ কিছুদিন হিন্দী শিখছি ছবিতে কাজ করার জন্য।'

বর্তমান যুগের সিনেমা-প্রিয় সভ্য শহরবাসীর ব্যক্তিগত জীবনে বোধহয় চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেকখানি—চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি প্রণয়ের রীতিতে পর্যন্ত। নিজের জীবনে এই ধরনের প্রভাব কাজ করেছে কতখানি, এই প্রশ্নে শোভা সেন প্রথমে ঘোরতর আপত্তি জানালেন, তারপর বললেন—'মোটেই না।'

'কোনো ফিল্ম স্বপ্নে দেখেছেন কখনো?'

'না, এবং দেখবও না আশা করি ঈশ্বরের দয়ায়।'

উত্তরটা আশ্চর্য, কারণ ছবি দেখে উনি বহুবার মুগ্ধ হয়েছেন এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখেন; তাঁর মতে শেখার একমাত্র পথ ভালো ছবি দেখা। অবশ্য শেখানোর উদ্দেশ্যেই বন্ধুরা অনেকে সম্প্রতি উঠে পড়ে লেগেছেন বই পড়াবেন বলে, কিন্তু—

'বলতে খুবই খুশি হচ্ছি যে, আমার আলসেমির কাছে তাঁরা একেবারেই হার মেনেছেন,' নিঃসঙ্কোচে জানালেন তিনি; 'পড়ব কি, বই হাতে নিলেই ঘুম পায়।'

বই যে তিনি একেবারে পড়েন না, তা নয়। জানা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক ইত্যাদির গল্প-উপন্যাস তাঁর নিয়মিত পাঠ্য। এমনকি আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গেও কিছু পরিচয় আছে; যদিও বলেন কবিতা 'বুঝি না,' নাম করলেন সুকান্ত ও বিমল ঘোষের।

ক্রমে অন্যান্য শিল্প-প্রসঙ্গ এসে গেল আলোচনায়। এসব ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ মোটামুটি পরোক্ষ। চিত্রকলার দিকে ঝোঁক নেই। গান জানেন না, তবে ক্ল্যাসিকাল ও লোকসঙ্গীত পছন্দ করেন; গায়কদের মধ্যে দিলীপ রায়, গায়িকাদের মধ্যে দীপালি তালুকদার, শুভলক্ষ্মী, সুচিত্রার ইনি ভক্ত। পাশ্চাত্য সঙ্গীত পছন্দ করেন না, এবং হিন্দী ও বাংলা সিনেমা-সঙ্গীত সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় যা মত প্রকাশ করলেন তা শুনে বোধহয় আমাদের সঙ্গীত পরিচালকরা খুব খুশি হবেন না।

ছবিতে যেমন গানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই শোভা সেনের, তেমনি নাচের ভূমিকা নিতেও তিনি নারাজ। বলেন, 'নাচ ভালোবাসি—তবে নাচতে নয়, নাচ দেখতে।' ভারতনাট্যম, মণিপুরী সব নাচই ভালো লাগে। উদয়শঙ্কর ও বালাসরস্বতী তাঁর প্রিয়।

দেশভ্রমণের উৎসাহে তিনি আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী এমনকি কাশ্মীর পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। এছাড়া খেয়াল বা 'হবি' বিশেষ কিছু নেই।

রান্না ও সেলাইয়ের প্রসঙ্গ তুলতে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, অনর্গল মুখ খুলে গেল : "রান্না করতে ভালোবাসি কিনা, কি ভালো রাঁধতে পারি—মাংস না শুক্তো, এসবের সঙ্গে আমার অভিনয়ের যোগ কোথায়? আমাকে তো অনেক প্রশ্ন করলেন এবার আমার এ প্রশ্নের জবাব দিন। ভেবেছিলাম যেসব পত্রিকা অসহ্য ভাষা আর ততোধিক অসহ্য বিষয়বস্তু দিয়ে পাতা ভরায়, আপনাদের রুচি ঠিক তাদের মতো নয়। আজেবাজে কথা না সাজিয়ে ভাববার খোরাক দিতে পারেন না? সস্তা মার্কিনী ঢঙ আমাদের ছবিগুলিকে যেমন ন্যক্কারজনক করে তুলেছে, তেমনি আমাদের কাগজগুলিতেও মার্কিন অনুকরণের নিকৃষ্ট প্রচেষ্টা। খালি বাইরের চটকের স্তব-স্তুতি। কেন, আমাদের কি অন্য কোনো চেহারা নেই! আমরা 'গ্ল্যামার গার্লস্' নই, রঙিন পুতুল নই, গ্রেটা গার্বো-র দুরূহ বিকৃত মনের রহস্য নেই আমাদের ঘিরে। অভিনয় একটা শিল্প, অন্যান্য শিল্পের মতোই এর সাধনাও শিক্ষাসাপেক্ষ, পরিশ্রমপূর্ণ। এদিক থেকে দেখে যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শ্রদ্ধা করা যায় সেটা লোককে বোঝাতে পারেন না? আমরা শিক্ষার্থী—হয়তো ভুলত্রুটিতে ভরা, কিন্তু তবু শ্রদ্ধার সঙ্গে শিখতে এসেছি। আমাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা একজন বড় চিত্রকর বা অধ্যাপকের মতোই সম্মানের অধিকারী। আমাদের মধ্যে যারা সব দায়িত্ব উপেক্ষা করে নিজেদের এক মিথ্যা মায়ায় মুড়ে রাখতে চায়, স্পষ্টই বোঝা যায় তারা সেটা করে স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু আপনারা তা সহ্য করবেন কেন, আপনারা শুধু প্রকৃত সৃষ্টিকে, সত্যিকারের ক্ষমতাকে দাম দেবেন, 'গ্ল্যামার'-এর ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে দিন একেবারে।"

এই কথাগর্নলি নিশ্চয় অনেকদিন থেকে ওঁর মধ্যে চাপা বাষ্পের মতো নিষ্কৃতির পথ খর্নজছিল, বলতে পেরে ভালোই লাগছে। আমাদের অনর্সন্ধানও সহজ হয়েছে মানর্ষটির এই অনাড়ম্বর, স্বাভাবিক মর্তির সাক্ষাতে। হাজারটা প্রশ্নের উত্তরে যা হয়তো জানা যেত না, দেখা গেল তার সাবলীল আত্মপ্রকাশ। কথাগর্নলির মধ্যে যে জবালা আছে তার হেতু আমাদের সিনেমার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজের যে ভ্রূকুটিশাসিত কোণে আমাদের ফিল্ম-শিল্পীদের বাস, শিক্ষিত মার্জিত প্রকৃত সাধনাসন্ধানী মন সেখানে অবমানিত হয়ে পড়ে; মেকী চটকের ছলনায় তারা পায় না সে লজ্জার ক্ষতিপর্রণ।

শোভা সেন নিঃসন্দেহে এই নতুন দলের একজন। তাঁর আছে শিক্ষা এবং বিশ্লেষণ করে ভাববার ক্ষমতা। একাধারে একটি বিশেষ রসবোধ ও বিচারবর্দ্ধির পরিচয় পেয়েছি এ'র কথাবার্তায়, মতামত প্রকাশের ভঙ্গিতে। এ'র শিল্পীজীবন গড়ে উঠছে যোগ্য ও খাঁটি ভিতের উপর। ইতিমধ্যেই ক্ষমতার পরিচয় ইনি দিয়েছেন, ভবিষ্যতে হয়তো দেখব প্রতিভার বিকাশ। সবচেয়ে আশার কথা এই যে, এ'র মধ্যে আছে উদ্দীপনা ও সাধনার নিষ্ঠা।

সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে, সঙ্গীতে যেমন আমাদের লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নেই, একদিন চলচ্চিত্রেও তা থাকবে না। যাঁরা এই দর্রূহ বিপ্লবকে সফল করতে পারেন এমন লোককে খোঁজা দরকার, জানা দরকার। শোভা সেনকে এই কারণেই আমরা খর্নজেছি এবং এই এক ঘণ্টার আলাপে যে-পরিচয় তাঁর পেলাম তাতে বর্ঝেছি আমাদের ভুল হয়নি।

বিদায়ের সময়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন সর্রে বললেন, 'অনেক জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে ফেলেছি, কিছর মনে করলেন না তো?'

এই উক্তি এবং ভঙ্গির সঙ্গে অভিনেত্রী শোভা সেনের কোনো যোগ নেই, যেমন ছিল না তাঁর যত্ন করে চা খাওয়ানোর মধ্যে। তবর এগর্নলি নিশ্চয় সম্পর্ণ অবান্তর মনে হয়নি তাঁর। তেমনি আমাদের যেসব জিজ্ঞাসা তাঁর কানে 'মেয়ে-দেখা' গোছের প্রশ্নের মতো অর্থহীন ঠেকেছে তার মধ্য দিয়েও তিনি নিজের পরিচয় সম্পর্ণ করেছেন হয়তো। এমনকি শোভা সেন যে দৈর্ঘ্যে ৫ ফর্ট ২ ইঞ্চি, ওজনে ১ মন ১৫ সের, যোগ্য বিশেষজ্ঞের দর্ষ্টিতে এ-তথ্যেরও তাৎপর্য থাকতে পারে।

'এই লাও, কি বলছ বল।'

অনর্ভা গর্প্তা

'কবি' চিত্রে ঠাকুরঝির ভূমিকা যিনি করবেন, পরিচালক দেবকী বসর্র পরীক্ষা ছিল এই কথাটি ঠিক ঠিক তাঁকে বলতে হবে। শেষে অনর্ভা গর্প্তার বলার ধরনটি তাঁর ভালো লাগল। যোগাযোগটি

হয়েছিল ভালোই, কারণ তারাশঙ্করের এই বইখানি অনুভা এর আগেই পড়েছেন এবং তখন থেকেই ঐ ভূমিকাটির প্রতি লোভ ছিল। বোধহয় সেই কারণেই এই ছবিতে অভিনয় তাঁর এত ভালো হয়েছিল যে অকস্মাৎ তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, অধিকাংশ দর্শকই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে 'কবি' চিত্রই অনুভার শ্রেষ্ঠ। এ অবশ্য তাঁর প্রথম ছবি নয়। এর পরেও তাঁকে 'আভিজাত্য', 'ইন্দ্রনাথ', 'মানদণ্ড' প্রভৃতি অনেক ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাঁর প্রথম ছবি 'সমর্পণ'। কিন্তু 'কবি'র পরবর্তী ছবিগুলিতে অনুভা গুপ্তার অভিনয় কেন সে রকম দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এ-প্রশ্ন ক্রমশ অনেকের মনেই জেগেছে।

অভিনেত্রীর অন্তরালে যারা মানুষটিকে জানবার কিছু সুযোগ পেয়েছেন, তদুপরি স্টুডিওতে ছবি তুলবার সময়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিচালকদের লক্ষ্য করবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাদের এমন কথা মনে হয় যে দেশী ফিল্ম তোলার প্রচলিত রীতিতে অনুভার স্বকীয় ক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সুযোগ পায় না। বাংলা চলচ্চিত্রে এ রীতি বহুকালের যে নট নটীরা জড় পদার্থের মতো অভিনয় করে যাবে, থেমে থেমে এমন সুরে কথা বলবে যা অতিশয় অস্বাভাবিক এবং সেই কারণে বিশেষ শ্রুতি-কটু। অনুভার স্বাভাবিক ধাত অন্যরকম, তাঁর অভিনয় শুধু কথায় নয়, অভিনয় করেন তিনি চোখে মুখে, হাতের ইশারায়। অথচ পরিচালক তাঁকে বারবার বলেন হস্ত সঞ্চালন বন্ধ করতে!!

'আমার মনে হয় এমন করে কথাটা বললে বেশ ভালো হয়—এমন করেই তো বলে,' সসঙ্কোচে হয়তো বললেন অনুভা।

পরিচালক বলেন, 'তা ঠিক, কিন্তু ওভাবে কপাল চুলকালে মুখ ঢাকা পড়ে যাবে, ক্যামেরায় আসবে না।'

বাঁধা নিয়ম বা ফর্মালিটির কাছে স্বাভাবিকতা হার মানে। সুতরাং ক্যামেরার সামনে ডাক পড়লেই অনুভা আজকাল আড়ষ্ট হয়ে পড়েন।

একবার এক ড্রয়িংরুমের দৃশ্যে অনুভাকে চা পান করতে করতে কথা বলতে হবে। ক্যামেরা ঘুরতে আরম্ভ করল। হঠাৎ পরিচালক 'কাট্ কাট্' বলে চিৎকার করে উঠলেন। প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'কতবার বলেছি চায়ের কাপটা শুধু ধরে বসে থাকুন, মুখ পর্যন্ত তুলবেন না, তুললে নাক কেটে যাবে।'

অনুভা হেসে বললেন, 'নাক কাটতে আর বাকি আছে নাকি?'

এভাবে অভিনয় করতে গেলে যা পরিণাম হয় তাতো আমরা হামেশা দেখছি।

আসলে কাঠের পুতুলের মতো তিনি অভিনয় করতে পারেন না, সেখানেই আমাদের সিনেমার ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর স্বভাবের বিরোধ। হাসিতে, চলাফেরায়, রসিকতায় সর্বদাই চঞ্চল সক্রিয় ভাব তাঁর। তাছাড়া এও হতে পারে যে, যে ধরনের ভূমিকা সাধারণত তাঁকে দেওয়া হয় তা তাঁকে সাজে না। তাঁর নিজের ইচ্ছা গরিব বা মধ্যবিত্ত

সমাজকে তিনি রূপ দেবেন। কেন না, তাঁর মতে সেখানে প্রাণ আছে বেশি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরেই তিনি মানুষ। সে জীবন তাই তাঁর জানা। তা বলে কোনো এক বিশেষ ধরনের চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকার ইচ্ছাও তাঁর নেই। নিজের ক্ষমতার উপর ততখানি বিশ্বাস তাঁর আছে। তিনি সন্ধান করেন সর্বদা সেই সব চরিত্র যার মধ্যে একাধারে বাচনভঙ্গির ও অনুভূতির বিকাশের সুযোগ আছে। আমাদের গতানুগতিক সিনেমায় নতুন কিছু তিনি দেবেন—এই তাঁর সবচেয়ে বড় উচ্চাশা।

ষোলো বছর বয়সে শিশির মল্লিক ও খগেন চ্যাটার্জির সাহায্যে তিনি ছায়াচিত্রে প্রবেশ করেন, ডি-লুক্স পিকচার্স-এর 'সমর্পণ' ছবিতে ললিতা সখির ভূমিকায়। রঙ্গমঞ্চে একবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'চিরকুমার সভা'য় নীরবালার অংশে, কিন্তু মাত্রই একবার। মঞ্চ সম্বন্ধে তা না হলে তিনি মোটামুটি অনভিজ্ঞ। রাধা ফিল্মস-এর এক হিন্দী ছবিতেও তিনি অংশ নিয়েছেন এবং এখনো হিন্দী শিখছেন আরো হিন্দী ছবিতে নামার আশায়।

দেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অনুভার যা মতামত তা থেকে মানুষটিকে অনেকখানি বোঝা যায়। সম্প্রতি যেসব ইংরেজি ছবি দেখেছেন তার মধ্যে তাঁর ভালো লেগেছে 'ফিয়েস্টা', 'এয়ারেস্', 'ম্যাডাম বভারি'। রুশীয় ছবি 'স্টোন ফ্লাওয়ার' দেখেছেন বটে, কিন্তু ফরাসী ছবি 'লা বেল্ এ লা বেইত্' দেখা হয়নি, কারণ বিজ্ঞাপনে ঐ ভয়ঙ্কর দানবীয় চেহারাটা দেখেই তো মূর্চ্ছা যেতে হয়! 'জনি বেলিন্ডা'-র বিচার-দৃশ্যটি তাঁকে সবিশেষ মুগ্ধ করেছে, প্রায়ই মনে ভেসে ওঠে। একটি ছবির কথা বলতে গিয়ে অনুভা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, সেটি হচ্ছে 'এয়ারেস্'। এমন অদ্ভুত ছবি এদেশে কবে হবে এই কথা ভেবে ছবি দেখতে দেখতে চোখে নাকি জল এসে গিয়েছিল।

এদেশে ছবি মাত্রেই কেবলই ছাইপাঁশ, ঘ্যানঘেনে ভালোবাসার ছবি, একটু ভাববার শিখবার খোরাক নেই কোথাও, এই তাঁর দুঃখ। আর দুঃখ পাশ্চাত্যের তুলনায় সে রকম নাটক কেন লেখা হয় না এদেশে? অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থের কথা আলাদা। ঐসব মহাকাব্যের মধ্যে বহু সুদৃঢ় সংযত চরিত্র আছে যা তাঁর মন আকর্ষণ করে, যেসব চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে লোভ হয়। সম্প্রতি তাঁর নতুনতম ছবিতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। হয়তো এ ছবিতে যথার্থই নিজেকে তাঁর ব্যক্ত করবার সুযোগ হবে।

দেশী বিদেশী অনেকের অভিনয় তাঁর ভালো লাগে; কিন্তু সচেতন ভাবে কারো অনুকরণ করার ইচ্ছা তাঁর হয় না। অনুকরণ করার চেয়ে নিজেকে প্রকাশ করার আকাঙ্খা নিশ্চয়ই অনেক ভালো। আমাদের দেশী ছবিতে সে সুযোগ কবে হবে? আর সিনেমার বাইরে? বিদেশী অভিনেত্রীর জৌলুষ সেখানে অনেকটা অনুপস্থিত।

আর দশজনের মতো তিনিও নানা রকম খেয়াল-খুশির বশবর্তী। বন্ধুবান্ধবদের

সঙ্গে হৈচৈ গল্পগুজব, খেলাধুলো এবং সম্প্রতি গাড়ি চালানো শেখার মধ্যে তাঁর অনেকখানি সময় কাটে। তাছাড়া বই পড়তে ভালো লাগে তাঁর, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা মুখস্থ। সেটা স্বাভাবিক, কেন না তিনি লেখাপড়া শিখেছেন শান্তিনিকেতনে। এবং তাঁর মা কবিতা লেখেন। ছবি, গান, নাচ সব কিছুতেই তাঁর উৎসাহ। শিল্পী নন্দলাল বসুর ছবি এবং তাঁর বর্ণমাধুর্য নাকি তাঁর 'চিত্ত জয় করেছে,' 'যদিও, (সসঙ্কোচে বলেন) অনেক ভালো ছবিরই অর্থ বুঝতে পারি না।'

গুনগুন করে চব্বিশ ঘণ্টা গান করা তাঁর বাতিক বিশেষ; যত্ন করে গান শিখেছেন। সুরের মধ্যে ভজন এবং গাইয়ের মধ্যে হেমন্ত মুখার্জি ও সন্ধ্যা মুখার্জি তাঁর প্রিয়। এমন কি হিন্দী ছবির গান, এমন কি বিদেশী গানের সুর।

নিজে নাচ শিখছেন; গোপাল ব্রজবাসী, যমুনাপ্রসাদ পাণ্ডে ইত্যাদি শিক্ষকের কাছে তাঁর হাতেখড়ি। নাচের মধ্যে বিশেষ পছন্দ কথাকলি নাচ। ইচ্ছা আছে কোনো নাচের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তবে একটা কথা : পোশাকটি হতে হবে ভদ্রোচিত; তাঁর ধারণা আজকাল নর্তকীদের সাজ ক্রমেই অশোভন হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য হলিউডের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে।

কিন্তু শুধু নাচে গানে, অভিনয়ে দিন কাটালে তিনি আর বাঙালী মেয়ে কিসে? তাই সূচীশিল্প তাঁর 'মগজে না ঢুকলেও,' রান্নায় প্রচণ্ড উৎসাহ। তাঁর চ্যাঁড়স চচ্চড়ি খাইয়ে একবার নাকি অনেকের কাছ থেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করেছিলেন। সেটা একটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। রাঁধতে যিনি জানেন তিনি চ্যাঁড়স বেঁধেও মন ভোলাতে পারেন। অভিনয়েও সেই সহজ দক্ষতা তিনি দেখাবেন — এই অনেকের আশা।

স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

ভালো মুরগির রোস্ট রান্না করতে পারেন স্মৃতিরেখা বিশ্বাস। 'পহ্‌লে আদমী', 'অভিমান', 'জিপ্‌সী মেয়ে' ইত্যাদি নানা দিশী ছবিতে আপনারা তাঁকে গত চার বছর ধরে দেখছেন, এক একটি 'দুষ্টু মেয়ের' ভূমিকায়। সে মেয়ে চঞ্চল, উচ্ছ্বাসী। লোককে হঠাৎ অপ্রস্তুত করে সে মজা পায়। সহসা তার মন খারাপ হয় না, হলে অভিমানে তার দুচোখ যেদিকে যায় বেরিয়ে পড়ে। চলায় ফেরায় তার নাচের ভঙ্গি। মানে সেই 'দুষ্টু মেয়ের'। সেই ভঙ্গি, সেই ভঙ্গিমা কখন পুরোপুরি দ্রুতলয়ের কোনো বাজনার সঙ্গে হালকা চালের নৃত্যে এঁকে বেঁকে যাবে সেজন্য তার সাগ্রহ অপেক্ষা। তাঁর ধারণা এই 'দুষ্টু মেয়ের' অভিনয় করতেই সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর। তিনি রান্না করেন — তাঁর মতে — (ঐ যে বললাম) মুরগির ভালো রোস্ট। আর খেতে ডাকলে লোককে খাওয়াতে ভালোবাসেন ইরানী

চপ সহ স্ট্রবেরি আইসক্রীম। স্ট্রবেরি কেন? বাঃ! রঙটা? আর আইসক্রীম? বাঃ! তাঁর বয়েস?

দ্বিধায় ভরা কুড়ি বছরের অভিনেত্রীর চঞ্চল মনের একটি চমৎকার উদাহরণ। সত্যি, মন তাঁর চঞ্চল, উচ্ছ্বাসী। সব কিছুতেই উচ্ছ্বাস, সব কিছুতেই উৎসাহ। যা কিছু ভালো তাই তাঁর ভালো লাগে। নাচ কেমন লাগে? খুব ভালো লাগে। উল বুনতে জানেন? নিশ্চয়ই। আঁকা-ছবি তাঁর ভালো লাগে, ছবি-আঁকাও ভালো লাগে! বই পড়তে ভালো লাগে, দেশ ঘুরতেও ভালো লাগে। ভালো লাগে স্প্যানিশ গীটার, ভালো লাগে রোমান্টিক নভেল। নন্দলালের ছবি ভালো, কুলু ভ্যালির বিকেল ভালো। ক্যামেরার ক্লোজ-আপ ভালো, অলিভিয়ারের 'হ্যামলেট' ভালো। ভালো নতুন ছাঁদের পোশাক আর রাইচাঁদ বড়ালের সুর, উদয়শঙ্কর, রুক্মিনী দেবী, ভারতনাট্যম, ইরানী চপ, লস্ট হরাইজন, বেটি ডেভিস, লাল গোলাপ আর রজনীগন্ধা, আর রবীন্দ্রনাথ, আর সর্বোপরি সাধের সেই স্ট্রবেরি আইসক্রীম। সব ভালো। সব ভালো। কেবল একটু কম ভালো বাংলা ছবির গান। বিশ বছর বয়সের অভিনেত্রী-জীবনে রবীন্দ্রনাথকে ভালো লাগা? রীতিমতো অপ্রত্যাশিত। বিশেষত কবি রবীন্দ্রনাথকে— এক্ষুনি যাঁর কোনো গান মনে করতে বললে স্মৃতিরেখা বিশ্বাসের মনে পড়ে 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' ভালো লাগাকে প্রকাশ করতে আবার মনে তাঁর দ্বিধা সঙ্কোচের লেশ মাত্র নেই। 'খুব', 'চমৎকার', 'নিশ্চয়ই'—কোনো কিছুতে পক্ষপাত দেখাতে হলে এই সমস্ত প্রবল শব্দ সবেগে এবং সাবেগে প্রয়োগ করাই তাঁর স্বভাব। রেখে ঢেকে সতর্ক হয়ে, সাবধান হয়ে, ওজন করে কথা কওয়ায় তাঁর মেজাজ নেই।

এ স্বভাব তাঁর চরিত্রের, না বয়সের? তিনি নিজে মনে করেন চরিত্রের। আমরা মনে করি অন্যরকম। আমরা মনে করি এ স্বভাব তাঁর সেই রোমাঞ্চিত বিশ বছর বয়সের যখন সকলের চোখেই পৃথিবীটা একবার আশ্চর্য মজার বলে লাগে। তাঁর নিজের চোখে নিশ্চয়ই আরো মজার। কেননা জীবিকার সঙ্গে এযুগে জীবনকে মেলাতে পারেন খুব কম লোক। অথচ তিনি পেরেছেন। তিনি পেরেছেন সেই কাজকেই তাঁর পেশা করতে যে কাজ তাঁর নেশাও। গুরুগম্ভীর হতে তাঁর ভালো লাগে না। রাত দুপুরে চাঁদের আলোয় বাগানের বেড়ায় চড়ে কচকচ করে পেয়ারা চিবানো তাঁর শখ। তিনি দেখেছেন ছবিতে তাঁর চটুল নৃত্যের সময় এলে মনমরা দেশী দর্শকেরা একটুখানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, তাঁর চঞ্চলতায় খুশি হয়, বাচালতায় আমোদ পায়। বিশ বছর বয়সের সব-ভালো-লাগা উচ্ছ্বাস নিয়ে দুষ্টু মেয়ের ভূমিকায়, কাজেই চট্‌পট লোকের মন জয় করতেই যে তাঁর লোভ যাবে—এতো স্বাভাবিক।

কিন্তু বিশ বছর বেশি দিন বাঁচে না। এমন কি আইসক্রীম সেবী চঞ্চল নায়িকার জীবনেও না। বিশ যেদিন পঁচিশ হবে—স্মৃতিরেখা বিশ্বাসেরও হবে—সেদিন তিনি 'দুষ্টু মেয়ের চরিত্র' ধার করতে যাবেন কোন লেখকের জানালায়? ভেবে

দেখলেই দেখা যায় গল্পে কাহিনীতে 'দুষ্টু মেয়ের' সুযোগ কত কম। ধনী পিতার আদুরে মেয়ে, মা-হারা সংসারে স্নেহশীলা দিদি কি ভাই-এর বোন, আজগুবী জিপ্‌সী পরিবারের যুবতী কন্যা আর কলেজে-পড়া ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী, ক্বচিৎ কখনো যুবক স্বামীর চঞ্চল বধূ—নানা বয়সী দুষ্টু মেয়ের দৌড় বাংলা ছবিতে এই পর্যন্ত। এ নিয়ে তিনি কতভাবে কত রকম অভিনয় করবেন? সহজ অভিনয় একদিন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাবে। তার মতো দুর্ভাগ্য আর কিছুতে না।

অথচ অভিনয় যাঁর ভালো লাগে, অভিনয় যিনি ভালো পারেন তাঁকে পুরোপুরি আস্ত একটি জীবন্ত চরিত্রের রূপে দেখতেই আশা করি আমরা। চটুল নাচ আর সব কিছুতে মজা-পাওয়া চোখের ভঙ্গি কত দেখা যায়? কিন্তু স্মৃতিরেখা বিশ্বাস আজও জানেন না আর কি তিনি পারেন। জানেন না, কিন্তু জানতে কি চান? হয়তো চান। পল মুনি তাঁর প্রিয় অভিনেতা। তাঁর ভালো লাগে রোনাল্ড কোলম্যান, ইনগ্রিড বার্গম্যান, বেটি ডেভিস। তাঁর ভালো লাগে ডিরেক্টার অলিভিয়ের, ডিরেক্টার ফ্র্যাঙ্ক কাপ্‌রা, ডিরেক্টার হিচকক্‌। এই সব ভালো লাগার পরিণতিতে কি হঠাৎ আবির্ভাব, হঠাৎ অন্তর্ধান করা চপল, চটুল মেয়ের অপ্রধান ভূমিকার অভিনয় শুধু? হয়তো তিনি আরো কিছু চান, আরো কিছু পারেন। কিন্তু সে চাওয়া তাঁর এত ভীরু—যেন আছে কি নেই।

অবশ্য সব নির্ভর করবে তেমন তেমন ডিরেক্টারের যোগ্যতার উপরে। তিনি এসে হয়তো তাঁর উচ্ছ্বাসী চঞ্চলতার মধ্যেই গভীরতার রঙ ধরাতে পারবেন। তখন যেন তিনি আর একবার গাইতে পারেন—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' এখনো তার সম্ভাবনা আছে। তার আগে তিনি আরো বেশি স্ট্রবেরি আইসক্রীম খান, পদ্মফুল আর রাজহাঁসের ছবি আঁকুন আর শরৎচন্দ্র পড়ুন।

'সময় পেলেই ভালোবাসি পড়তে : কিন্তু সময় পাই না যে।'

*

পাঠকদের প্রতি

'চলচ্চিত্র' যদি নিয়মিত পড়তে চান, দয়া করে আপনার নাম আর ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দেবেন। বছরে আরো কয়েকবার 'চলচ্চিত্র' প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের আছে। নতুন কোনো খণ্ড প্রকাশিত হলেই আপনাকে আমরা চিঠিতে জানাবো।
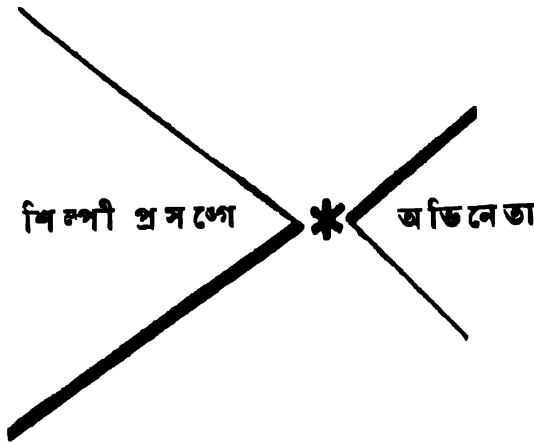
কমল মিত্র

এখনো আমাদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যাঁদের দৃঢ় ধারণা ছবির ব্যবসাটা একটা ফলাও করা বেহায়াপনা ছাড়া কিছুই নয়। তাঁদের মতে স্টুডিও জায়গাটা হচ্ছে অনেকটা ঘোড়দৌড়-মাঠের মতো, যত বদলোকের ভিড় সেখানে। আর অভিনেতাদের তো কথাই নেই, বারমুখো, ফেরেরবাজ আর বাপ-খেদানোরা ছাড়া কেউ 'বায়স্কোপ করে না।'

ধারণার যে একেবারেই কোনো ভিত্তি নেই তা বলা হয়তো ভুল হবে। কারণ এদেশে সিনেমা-শিল্প পত্তনের গোড়ায় গোড়ায় এমন লোকেরাই স্টুডিওগুলিতে বেশি ভিড় করেছে যাদের আর কোথাও কিছু হয়নি বা হবার কোনো আশাও ছিল না। একথাটা এখন আর সোজাসুজি বলা চলে না কিন্তু ভূতের বোঝার মতো বদনামটা ছবির লোকেদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আজকের অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই দু-তিনটে পাশ দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের কাজ জানেন ও বোঝেন। আর নিজেদের কাজকর্ম ছাড়া স্টুডিওর অপ্রাসঙ্গিক পাঁচটা ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

এমন লোকেদের মধ্যে যাঁদের নাম আগে মনে আসে তাঁদের মধ্যে শ্রীকমল মিত্র একজন। কমলবাবু সেই ধাতের লোক যিনি অপ্রিয় হলেও সত্যিকথা বলতে কসুর করেন না। নিজের গুণপণা জাহির করবার মতো লোক তিনি মোটেই নন। তবুও তাঁর সঙ্গে কথা কইলে মনে হয় যে, নিজের সম্বন্ধে যদি কোনো কথা একান্তই বলতে হয় তাহলে তিনি চান লোকে জানুক যে তিনি স্পষ্ট বক্তা। এর জন্য স্টুডিও-মহলে অনেকেই তাঁকে দাম্ভিক বলে ভুল করে।

আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসা আর স্টুডিওগুলিতে কি কি অব্যবস্থা রয়েছে, কি কি দোষত্রুটি চলচ্চিত্রের উন্নতিতে পদে পদে বাধা দিচ্ছে সে বিষয়ে কমলবাবু অনেক ভেবেছেন। কমলবাবুর মতে 'যার কাজ তাকে সাজে' কথাটা উপেক্ষা করে অনেকেই আজ স্টুডিওগুলিতে ভিড় করে আছেন। ছেলেমেয়েরা হামেশা কমলবাবুকে

মুরুব্বি পাকড়িয়ে চিঠি লেখে, চলচ্চিত্রে অভিনয় করার একটু বন্দোবস্ত তিনি যেন তাদের করে দেন। তাদের প্রত্যেককে কমলবাবু নিজের হাতে জবাব দেন। কিন্তু ছবিতে যারা ঢুকতে চায় তাদের মধ্যে, কমলবাবু দেখেছেন যে, বেশির ভাগের বিদ্যে ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা অবধি। তিনি এদের সাফ জবাব দেন, লেখাপড়া না শিখলেই যে দিগগজ অভিনেতা হবার এক্তিয়ার আসে একথাটা সব সময়ে ঠিক নয়। এ সম্পর্কে কমলবাবু শিশির ভাদুড়ী মশাইয়ের একটা গল্প প্রায়ই বলেন। বালী থেকে একবার এক ফোর্থ-ক্লাশ অবধি পড়া ছোকরা শিশিরবাবুর কাছে এসে থিয়েটারে ঢুকতে চেয়েছিল। হঠাৎ তার এ শখ কেন হল জিগগেস করাতে সে বলল, 'স্যর, মাথার তেল বার করেছিলাম একটা কিন্তু তাতে পাকা চুল কাঁচা না হয়ে বরং উল্টোটা হতে শুরু করল। ফলে তেলের ব্যবসা তুলে দিতে হয়েছে, আর কিছু করবারও নেই, তাই এখন থিয়েটার করব ঠিক করেছি।' শিশিরবাবু শুনে তাকে বললেন, 'ওটা কোনো কাজের কথা নয় হে, বাড়ি ফিরে ভালো করে আবার মাথার তেল তৈরি করগে, যাতে লোকের পাকা চুল সত্যি সত্যি কাঁচা হয়।'

কমলবাবু বলছিলেন নিজে তিনি কি ভাবে অভিনয়ের দিকে ঝোঁকেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর থিয়েটারের খুব শখ ছিল। তাঁদের তিন-পুরুষের বাস বর্ধমানে। ঠাকুরদা ছিলেন সেখানকার নামকরা ডাক্তার। বাবা তখনকার দিনের এম্-এ পাশ পশারওয়ালা উকিল, শেষে বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। বছর কুড়ি-পঁচিশ আগের কথা। ছোকরা কমল তখন তাদের মহাজনটুলীর বাড়ির বৈঠকখানায় বই হাতে করে বঙ্গে-বর্গীর মুস্তফার পার্ট প্রচণ্ড বীররস দিয়ে পায়চারি করে আবৃত্তি করছিল। তখনকার বাঙলা বা বাঙলার বাইরের বাঙালীপাড়ায় এ ধরনের দৃশ্য হামেশাই চোখে পড়ত। তখন রেডিও, বায়স্কোপ ছিল না, কিন্তু বাঙলার থিয়েটারের হাট ছিল জমজমাট। শিশিরবাবু তখন বাঙলার মঞ্চাকাশে জ্বলজ্বল করছেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো, তাঁর চারপাশে বড় বড় মহারথী : দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি, রাধিকানন্দ ইত্যাদি আরো অনেকে। 'আলমগীর', 'সীতা', 'সাজাহান', 'বঙ্গে বর্গী', 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'কর্ণার্জুন'-এর সে যুগ।

ছোকরা কমল যখন মুস্তফার পার্ট থেকে প্রাণপণে বীররস টেনে নিঙড়ে বার করবার চেষ্টা করছে, তখন ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক—তার পিতৃবন্ধু শ্রীপ্রমদীলাল ধোন। ভদ্রলোক এককালে কোটিপতি ছিলেন, তখন ফকীর অবস্থা। এক থিয়েটারের নেশাতেই তিনি লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়-দীক্ষা হয়েছিল অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফির কাছে। প্রমদীবাবু কমলবাবুকে বোঝালেন যে গলা কাঁপিয়ে সব কথা টেনে টেনে ঠেস দিয়ে চেঁচানোর নামই অভিনয় নয়। অভিনয়ের প্রাথমিক কথাগুলি ভালোভাবে বুঝিয়ে তিনি কমলবাবুকে বিলিতি বইয়ের একটা ফিরিস্তি ছকে সেগুলি আনিয়ে মন দিয়ে পড়তে শুনতে বলেন।

আর ছেলেটির মধ্যে চেষ্টা আর ক্ষমতা দুই আছে দেখে নিজে তাকে হাতে-কলমে শেখাতে শুরু করেন। প্রমদাবাবুর তালিমের গুণ যে কতখানি তার প্রমাণ আজকের কমলবাবুর মঞ্চ আর ছবির অভিনয়। এক কথায় তাঁর অভিনয় সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে এ একেবারে পরিশ্রম করে শেখা জিনিস।

কমলবাবু এখন মঞ্চ আর চলচ্চিত্রের একজন বড় অভিনেতা। কি জানি কেন আমার ধারণা ছিল তিনি এ লাইনে পুরোনো লোক। এ কথাটা খেয়াল হওয়ার পরে আরো অনেককে জিগগেস করে দেখেছি, তাঁদের ধারণাও তাই। এর একটা কারণ বোধহয় তাঁর পাকা অভিনয়, যা সাধারণত বহুদিনের সাধনার ফল। অথচ কমলবাবু মাত্র সাত-আট বছর আগেও বর্ধমানে কলেক্টারি অফিসে কেরানীগিরি করেছেন। বাজে চাকরি, মাইনে কম, এদিকে জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বাড়তির দিকে। চাকরিতে মন আর বসছিল না। অথচ থিয়েটারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে, শখের থিয়েটারে অভিনয় করে বর্ধমান শহরে খানিকটা নাম-ডাকও হয়েছে। তাই ঠিক করলেন চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে অভিনয় করবেন। এই ইচ্ছে পূরণের জন্য প্রায়ই তিনি পয়সা খরচ করে কলকাতায় এসে থিয়েটার আর স্টুডিওগুলির দরজায় দরজায় ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কমলবাবুর মুখ থেকে তাঁর এই উমেদারী-পর্বের গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগে। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর পর ৪৩ সালের গোড়াতে তিনি প্রথম সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেলেন। শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ইস্টার্ন টকিজের হয়ে শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসটির ছবি তুলছিলেন। সেই ছবিতে পরিচালক মশাই কমলবাবুকে বিনা মজুরীতে মিস্টার তপেশ বোস বলে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতে দেন। এর কিছুদিন পরে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্টার থিয়েটারে 'কেদার রায়' নাটকে মুকুট রায়ের ভূমিকায় প্রথম পেশাদার মঞ্চে নামলেন। বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা। যাই হোক তাতেই কলকাতায় পাকাপাকি বাসের বন্দোবস্ত হল। তার পর আজ অবধি কমলবাবু 'স্টার', 'মিনার্ভা' ও 'শ্রীরঙ্গম'-এ গোটা কুড়ি নাটকে, তাছাড়া নানা প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রায় গোটা চল্লিশেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

মঞ্চ আর ছবিতে অভিনয়ের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কমলবাবু মঞ্চাভিনয় বেশি পছন্দ করেন। এর প্রধান কারণ, তাঁর মতে, অভিনেতা আর দর্শকের সম্বন্ধটা রঙ্গমঞ্চে খুব নিবিড় আর নিকট। তিনি বলেন, 'স্বীকার করুন আর না করুন প্রত্যেক অভিনেতাই দর্শকের কৃপাপ্রার্থী। ভালো অভিনয় হলে অমনি হাতে হাতে দর্শকের তারিফ পেলে মনটা যে কি খুশিতে ভরে ওঠে বলা যায় না। ছবির অভিনয়ে অভিনেতা এই খাঁটি আনন্দটি কখনোই পান না। তাছাড়া মঞ্চে অভিনেতার সুযোগ ঢের বেশি, অনেক সহজ ও স্বাধীনভাবে অভিনয় করা যায়। ক্যামেরার সামনে অভিনয়ে এখনো আমাদের দেশে এত কড়াক্কড়ি, এত বাঁধন রয়েছে যে অভিনয়ের সহজ ভাবটাই নষ্ট হয়ে যায়, অভিনয় করে আনন্দ হয় না।'

এই অন্যান্য নানা কারণ ছাড়া চলচ্চিত্রের অভিনয়ে কমলবাবুর বীতরাগ হওয়ার একটা প্রধান কারণ কথায় কথায় বোঝা গেল। তাঁর কাছে শোনা গেল যে কিছুদিন আগে এক সঙ্গে তাঁকে ছ'টা ছবিতে কাজ করতে হচ্ছিল। সেই ছ'টা ছবিতেই তাঁকে ভিলেন সাজতে হয়। কবে কোন এক পরিচালকের প্রথম খেয়াল হয় যে দুর্দান্ত, ফন্দিবাজ বা নির্দয় লোকের চরিত্র অভিনয়ে তাঁকে ভালো মানাবে আর তিনি তা অভিনয়ে প্রমাণও করেন। তার পর সে চক্র থেকে আজও তিনি পার পাচ্ছেন না এই তাঁর মস্ত আক্ষেপ। পার যে আর পাবেন সে আশাও কম। কারণ আজকাল অনেক প্রযোজকই কাস্টিং-এর একটা সোজা উপায় বের করে ফেলেছেন। গল্পে কোনো খারাপ লোক থাকলেই তার জন্য রয়েছেন কমল মিত্তির, গেঁয়ো লোক বা তড়বড় করে কথা-কওয়া লোক হলেই জহর গাঙ্গুলি, ইংরিজি বুকনী-নবীশ বা কেতাদুরস্ত হলেই ছবি বিশ্বাস আর স্নেহপ্রবণ বাবা বা সেই জাতীয় কিছু একটা থাকলেই অহীন্দ্র চৌধুরী।

কমলবাবুর কিন্তু খুব ইচ্ছে সিরিও-কমিক ভূমিকায় অভিনয় কবেন। কিন্তু আপাতত তার কোনো আশাই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বলেন রোম্যান্টিক চরিত্র অভিনয়টা তাঁর ধাতে সয় না, তাঁর চেহারা আর গলার স্বর নাকি প্রেমিকেব উপযুক্ত নয়। আজ অবধি তিনি যত অভিনয় করেছেন তার মধ্যে তলোয়ারকারের ভূমিকাই তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। এই বলিষ্ঠ, তেজোদীপ্ত মানুষের চরিত্রকে মূর্ত করতেই তাঁর সত্যিকার আনন্দ লাগে। এ জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংগতি আছে বলেই হয়তো।

ব্যক্তিগত জীবনের কথায় কমলবাবু বলেন যে আর পাঁচজনের মতোই তিনিও সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। শিকার আর বেড়ানোর তাঁর খুব শখ, কিন্তু বাড়িতে অন্ধ বাবা, বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও কন্যাটিকে ফেলে বেবোবার উপায় নেই, বাপ-মা'র একমাত্র ছেলে বলে এই অসুবিধায় পড়তে হয়। তবে, আগে শিকারে বেরোতে তাঁব কোনো কষ্ট ছিল না। এখনো মাঝে মাঝে বেবোন। তাঁর প্রিয় জায়গা হচ্ছে হাজারিবাগের কাছাকাছি লেপোর জঙ্গলে। হাবা-বংশী বীরেব মতো এক সময় তিনি হরিণ আর পাখি শিকার করে বেড়াতেন। তার পর নিজের হাতে মাংস রেঁধে লোকজনকে খাওয়াতেন। মাংস রান্নায় নাকি মুসলমান বাবুর্চিকেও টেক্কা দিতে পারেন কমলবাবু। মশলার ভাগ আর মাংস কষবাব ঠিক সময়টির তাঁর কখনো ভুল হয় না বলেই মাংস রান্না তাঁর হাতে অমন চমৎকার খোলে। বড় জানোয়ারের মধ্যে এখনো বাঘ শিকার করবার তাঁর সৌভাগ্য হয়নি—বুনো শুয়োর আর ভাল্লুক দু'চারবার মেরেছেন। তবে চেহারাটা তাঁর বাঘ-শিকারীর মতোই। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, খোলা তরোয়ালের মতো খাড়া, সোজা, শক্ত গড়ন—এক ফোঁটা চর্বি নেই শরীরে। আর তাঁর চেহারার সঙ্গে খাপ খায় তাঁর অদ্ভুত উদ্যম আর কাজের ক্ষমতা।

আমাদের দেশের আরো অনেক বড় অভিনেতা অভিনেত্রীর মতো কমলবাবুকেও একই সঙ্গে অনেকগুলি ছবিতে নামতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালে একবার তাঁকে এক নাগাড়ে তিনদিন, তিনরাত ছবির কাজ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারেরও। এতটুকু বিশ্রাম বা এক ফোঁটা ঘুম সে কদিন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। কমলবাবু বলছিলেন যে এখন বোধহয় আর অত খাটতে পারবেন না। আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না।

কমলবাবুর ব্যক্তিত্বের মূল কথাটা আমাদের মনে হয় তাঁর সংযত, গোছালো মন। শিল্পী, বিশেষত চলচ্চিত্রের অভিনেতা বলতেই আমরা একটি ঝোড়ো মানুষ কল্পনা করে নিই—যার বেশভূষায় আর চুলে বিদ্রোহ, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, যার বেপরোয়া মন প্রেমের জন্য হাহাকার করছে। কমলবাবু ঠিক এর উল্টো লোক। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, দৈনন্দিন জীবন একটি ধীর খাতে চলে। এই স্থিরচিত্ততা, এই সংযমই বোধহয় তাঁর সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ।

তাঁর বেশভূষা সাদাসিধে কিন্তু পরিপাটি। কথায় বার্তায় উচ্ছ্বাস নেই, আধিক্য নেই, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলার চেষ্টা নেই। অথচ কথা বলার এমন একটা ঢঙ আছে, কথায় এমন একটা রঙ আছে, তাঁর টিপ্পনী এমন ঝাঁজাল যে শুনলে রীতিমতো মজা লাগে। আর তাঁর এই বলবার ভঙ্গিটি আরো ভালো খোলে তাঁর চমৎকার দরাজ গলার গুণে। মনে হয় মজলিস জমানোর তিনি বুঝি খাঁটি লোক একটি।

মজলিস জমানোর ইচ্ছাটা খুব প্রবল না হলেও, আরো নানা ব্যাপারে কমলবাবুর মনমেজাজ বেশ সেকেলে। আজকাল লোকের হাতে হাতে ঘড়ি উঠলেও, সময়-জ্ঞান অধিকাংশ লোকেরই যৎসামান্য। কমলবাবু এ ব্যাপারে কিন্তু কথার এতটুকু নড়চড় করেন না। স্টুডিওতে পাঁচটায় স্যুটিং থাকলে তিনি হাজির হন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। লোকের সঙ্গে দেখা করবেন কথা দিলে নির্ধারিত সময়ের এতটুকু দেরি হয় না। সময় সম্বন্ধে এতখানি সচেতনতা পুরনো দিনের সাহেব-সুবোর কথা মনে করিয়ে দেয়।

চা খাওয়ায় তাঁর বিন্দুমাত্র রুচি নেই, যদিও ধূমপান তাঁর প্রিয় নেশা। আমরা শুনে খুব অবাক হলুম যে কমলবাবু জীবনে আমাদের এ যুগের জলসা-ঘর হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোয় ঢোকেননি। একটা বড় হোটেলে ঢুকলে, তিনি বলেন হয়তো বেরিয়ে আসার রাস্তাই তিনি খুঁজে পাবেন না। তাশ, পাশা, আড্ডা এসবও তাঁর পছন্দ না। বলেন যে দেশী, বিলিতি ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের রস থেকে তিনি বঞ্চিত, কারণ ওদিকটা চর্চার তাঁর সুযোগ হয়নি। নাচেরও তিনি সমজদার নন। ছেলেবয়সে ছবি আঁকার শখ ছিল, রঙিন ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি এঁকে হাত মক্স করেছেন। আজকাল আর ছবি আঁকেন না বটে, তবে বড় শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখার শখ আছে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, দেবীপ্রসাদ তাঁর প্রিয় শিল্পী। বাড়িতে সময় কাটানোর জন্য বই পড়া অভ্যাসটা তাঁর আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,

শরৎবাব, আর [illegible] মধ্যে নজরুল ও তারাশঙ্করের লেখার তিনি বিশেষ ভক্ত। কাজকর্মের পর তাঁর অভ্যাস হাওয়া-খেতে বেরুনো। প্রায়ই তিনি সপরিবারে গঙ্গার ধারে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে, ফরাস পেতে গড়গড়া নিয়ে বসে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসেন।

থিয়েটার বায়স্কোপের কথা উঠতে কমলবাবু বললেন দর্শক হিসাবে ও দুটি জায়গায় তাঁর যাতায়াত খুব ঘনঘন নয়। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে আলমগীরের ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয় তিনি প্রথম দেখেছেন মাত্র মাস কয়েক আগে যখন শিশিরবাবুর সঙ্গে 'গেস্ট স্টার' হয়ে অভিনয় করছিলেন। চলচ্চিত্রের মধ্যে দেশী বিদেশী দুই-ই দেখেন। বিদেশী পরিচালকদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপরা, ভিক্টর স্যাভিল, জন ফোর্ডকে তাঁব পছন্দ, অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে পল মুনি, রোনাল্ড কোলম্যান, ফ্রেডরিক মার্চ, গ্রেটা গার্বো, গ্রিয়ার গার্সন আর ইনগ্রিড বার্গম্যানকে ভালো লাগে। আমাদের পরিচালকদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধা আছে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া, শ্রীদেবকীকুমার বসু ও শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের ওপরে। সহযোগীদের মধ্যে তাঁর কাছে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল আর বিকাশ রায়ের অভিনয় খুব ভালো লাগে, আর অভিনেত্রীদের মধ্যে তাঁর মতে শ্রীমতী মলিনা, শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ও শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

কমলবাবুর বয়স এখন মাত্র আটত্রিশ। মানুষের কর্মজীবনের এটা শুরু বললে ভুল হয় না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিগগেস করাতে কমলবাবু বলেন যে পরের হয়ে অভিনয় করা ছাড়া নিজে একটা থিয়েটার চালানো আর ছবি তোলায় তাঁর আগ্রহ আছে। নিজে যদি কখনো ছবি তৈরি করবার সুযোগ পান তা হলে এমন-ভাবে বেঁধে ছেঁধে নামবেন যাতে তা সার্থক হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি এমন গল্পে হাত দেবেন যাতে নূতনত্ব আছে। এ ব্যাপাবে অঙ্ক কষে কিছু বলাটা ভুল হতে পারে জেনে তিনি বলেন যে তাঁর গল্পে মোটামুটি থাকবে তিনভাগ অ্যাকসন আর একভাগ কথা। তাঁর মতে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা থাকাই আজকের বাংলা ছবিতে একটা বড় দোষ। এত কথা থাকার ফলে ছবির প্রাণ আর গতি জিনিসটা এমন শ্লথ হয়ে পড়ে যে তার রস বাংলা ভাষী ছাড়া আর কেউ পান না। কমলবাবু যে ছবি তুলতে চান তা ভাষান্তর না করেই অবাঙালীদের দেখানো চলবে। নিজে অভিনেতা বলে ছবি তোলার ব্যাপারে কমলবাবু এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করতে চান যাতে অভিনেতা অভিনেত্রীদের আজকের সাধারণ অসুবিধেগুলি দূর হতে পারে। তাঁর মতে প্রথমত তাঁদের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয়ত ছবির গল্প, আর যার যার চরিত্র, অভিনয়ের আগেই পরিষ্কার ভাবে বোঝবার সুযোগ দেওয়া দরকার। তা ছাড়া দরকার ছবি তোলার আগে একটা শট ভাগ-করা পুরো স্ক্রিপ্ট থাকা। এভাবে তৈরি হয়ে স্টুডিও আর বাইরের বাস্তব

পরিবেশ মিলিয়ে ছবি তুলতে পারলে তার সাফল্যের আশা অনেক বেশি তা নিঃসন্দেহ।

এই সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে কমলবাবু শেষে বললেন যে এগুলি তাঁর কাছে এখনো স্বপ্নের মতো। তবে অভিনয়-জীবন যখন বেছে নিয়েছেন এই পথ ধরেই তাঁকে চলতে হবে আর তাঁর যথাশক্তি চেষ্টা করবেন তিনি সেই অভিনয়-জীবনের মর্যাদা রক্ষা করতে। অভিনেতার জীবন একদিক দিয়ে বড় ট্র্যাজিক। একটা লোক সারা জীবন ধরে রঙ্গমঞ্চে আবুহোসেনী করে মৃত্যুর পর দেখা যায় তাকে পোড়াবার পর্যন্ত পয়সা নেই। তাই কমলবাবু চান যে জীবনে যেন তিনি ইহকালের এই সংস্থানটুকু করে যেতে পারেন।

কথাটা কমলবাবু এমন করুণ করে বললেও তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে তাঁর আশা আকাশ-কুসুম মাত্র নয়। তাঁর নিজের জীবনই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর অভিনয়-জীবনের এই তো প্রথম পর্ব। তাঁর উদ্যম আছে, সততা আছে, উপরন্তু ক্ষমতা আছে। আমাদের তাই দৃঢ় বিশ্বাস কমলবাবুর পক্ষে লক্ষ্মী ও কলা-লক্ষ্মী—দুই দেবীরই প্রসাদ-লাভ অনিবার্য।

বিকাশ রায়

বছর তিনেক আগে বিকাশ রায় যখন চলচ্চিত্রে যোগ দেন তখন কিন্তু আর পাঁচজনের মতো তাঁকে আত্মীয়স্বজনের কাছে বাধা পেতে হয়নি। বরং পিতা যুগলকিশোর রায় আর বিকাশবাবুর স্ত্রী দুজনেই তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের 'স্বাধীনতা দিবসে' যুগলকিশোরবাবু হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে মারা যান। পুত্রের নাম যশ তিনি দেখে যেতে পারেননি কিন্তু বিকাশবাবু তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। এত অল্পদিনে তাঁর মতো প্রতিষ্ঠা লাভ খুব কম অভিনেতার ভাগ্যেই সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যেই দর্শক আর সমালোচকেরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, ছবির ব্যবসায়ীরা তাঁকে চুক্তিবদ্ধ করতে উৎসুক।

এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে আছে বিকাশবাবুর ব্যক্তিত্ব আর তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিকাশবাবুর সহপাঠী বন্ধুরা তাঁর কথা উঠলে বলেন লেখাপড়ায় তিনি চিরকালই চোখা ছিলেন, গ্রন্থকীট না হয়েও সসম্মানে পরীক্ষা পাশ করতে তাঁর কোনো কালে বেগ পেতে হত না। লেখাপড়ার বাইরেও নানা ব্যাপারে তিনি বরাবরই চটপটে ও উৎসাহী ছিলেন। বি. এ. পাশ করে বিকাশবাবু আইনের ডিগ্রী নেন, কিন্তু শামলা এঁটে আদালতে বেরোননি কখনো। তবে ওকালতি করলেও পসার জমাতে কষ্ট হত না। কেন না বিকাশবাবু যখনই যাতে হাত দিয়েছেন প্রায় সব সময়েই তা ভালোভাবে করতে পেরেছেন।

ভালোভাবে করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে ধৈর্য ধরে লেগে থাকা, মন বসিয়ে কাজ করা — এ তাঁর ধাতে নেই। কর্মজীবনের প্রথম দিকে বিকাশবাবু বিখ্যাত এক বিলিতি বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে চাকরি নেন। কাজকর্ম দেখে অফিসের বড়কর্তারা খুব খুশি। সহকর্মীরা বুঝলেন যে তাঁর উন্নতি অনিবার্য কিন্তু বিকাশবাবু কাজ ছেড়ে দিলেন, ঢুকলেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। সেই সময়ে লোকে প্রথম বিকাশবাবুর নাম শুনল। বাঁধা কাজ ছাড়া বিকাশবাবু প্রায়ই বেতার নাটক বিভাগে নাটক লিখতেন, প্রযোজনা, অভিনয়ও করতেন। সুন্দর কণ্ঠস্বর, সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি আর অভিনয় ক্ষমতার গুণে বিকাশবাবু ক্রমে রেডিওর একজন প্রিয় অভিনেতা হয়ে দাঁড়ালেন। বেশ চলছিল। হঠাৎ তিনি রেডিওর চাকরিও ছেড়ে দিলেন। বেতার নাটকের অভিনেতা, প্রযোজক, আর লেখক হিসেবে রেডিওর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র এখনো একেবারে ছিন্ন হয়নি বটে, কিন্তু সে বাইরে থেকে। আবার কিছুদিন আর একটা বিজ্ঞাপন কোম্পানি। আবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের রেট জানা, ব্লকের স্ক্রীন ঠিক করা, তেলের গুণকীর্তন, টনিকের স্লোগান আর পাখার জয়গান। এ পর্বও বেশিদিন চলল না। চাকরিতে ঢোকবার আগে এক ফাঁকে বিকাশবাবু একবার ব্যবসাতেও নেমেছিলেন। বাড়িতে কল বসল, কারিগর এল, তৈরি হল রাশ রাশ শোলার টুপি। কাগজ কলমের প্ল্যানে কোনো ফাঁক ছিল না। কত লোক টুপির ব্যবসা করে ঘরবাড়ি তুলেছেন কিন্তু বিকাশবাবুর ভাগ্যে টুপি বেচে টাকার মুখ দেখা হল না, বাড়িতে জমে উঠল পাহাড়প্রমাণ শোলার টুপি। বহুটাকা গচ্চা দিয়ে কারবার তুলে দিতে হল।

শেষে ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে নতুন করে বেকার হলেন বিকাশ রায়। কিছু-দিন পরে আবার যখন কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হঠাৎ একদিন দেখা জ্যোতির্ময় রায় মহাশয়ের সঙ্গে। এর পরই বিকাশবাবুকে 'অভিযাত্রী' ছবিতে চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসাবে প্রথম দেখা গেল। 'অভিযাত্রী'তে একটা ছোট্ট ভূমিকায় বিকাশবাবুর অভিনয় দেখে এক অখ্যাত কাগজের ছদ্মনামী সমালোচক লিখেছিলেন যে নায়িকার মেজদার ভূমিকায় নবাগত বিকাশ রায়ের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আশা ব্যর্থ হয়নি। 'অভিযাত্রী'র পর বিকাশবাবুর অভিনীত আরো দশখানা ছবি দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ছবিতেই বিকাশবাবুর অভিনয় দর্শক ও সমালোচকদের তারিফ পেয়েছে। এখনকার নতুন অভিনেতাদের মধ্যে বিকাশবাবু নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী, অভিজ্ঞ অভিনেতাদের সঙ্গেও তাঁর অভিনয়ের অনায়াসে তুলনা চলে।

অথচ অনেক বিখ্যাত চিত্রাভিনেতার মতো বিকাশ রায় কখনো মঞ্চে অভিনয় করেননি, কোনো নাট্যগুরুর কাছেও তাঁর শিক্ষানবিসীর সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর অভিনয়ে হাতে খড়ি হয়েছে বেতারে, যেখানে অভিনয় শুধু কথার উপর নির্ভর করে, যার সঙ্গে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সবচেয়ে বোধহয় কম সাদৃশ্য আছে।

মঞ্চে কখনো নামেননি বলেই হয়তো বিকাশবাবুর অভিনয় এত সহজ, স্বাভাবিক; কারো কাছে শিক্ষানবিসী করেননি বলেই বোধহয় তাঁর অভিনয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এত সুস্পষ্ট; বেতার নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন বলেই নিশ্চয় তাঁর বাচন-ভঙ্গি এমন শ্রুতিমধুর।

তা ছাড়া একটা প্রধান কথা হল এই যে অভিনয়ে সফলতা অর্জন করতে হলে, কোনো চরিত্রকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে, অভিনেতার পক্ষে সেই চরিত্রকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। কি করছি ও কেন করছি পরিষ্কারভাবে না জানলে অতি কুশলী ব্যক্তির পক্ষেও একটা চরিত্রকে প্রাণ দেওয়া সম্ভব নয়। বিকাশবাবুর, ঠিক এই চেষ্টাই আছে—আছে জানবার আগ্রহ, বোঝবার বুদ্ধি, ফলে করবার ক্ষমতা। তাই 'মায়াজাল'-এর ব্যর্থ প্রেমিকের অভিনয় এত প্রস্ফুট; 'ভুলি নাই'-এ ভেঙে-পড়া বিশ্বাসঘাতক সন্ত্রাসবাদীর অভিনয় এত ব্যথাতুর, এত মর্মান্তিক; 'দিনের পর দিনে'র দুস্থ দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিজীবীরূপে তিনি এত জোরালো এত প্রাণবন্ত।

বিকাশবাবুর মতে এ যাবৎ যত বাংলা ছবি তৈরি হয়েছে 'ভুলি নাই'-এর স্থান তার মধ্যে সর্বোচ্চে। তিনি নিজে এই ছবিতে অভিনয় করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছিলেন এবং তাঁর মতে এতে তাঁর অভিনয় হয়েছিল সবচেয়ে ভালো। বহু দর্শক ও সমালোচকই একথায় সায় দেবেন।

চলচ্চিত্রে বিকাশবাবুকে প্রেমিকের ভূমিকায় নামতে হয়েছে একাধিকবার। প্রেমিকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন: প্রেমিকের ভূমিকায় বিকাশবাবুর অভিনয় করা বৃথা, কেন না তাঁর মতো চেহারার লোকের সঙ্গে কোনো মেয়েই প্রেমে পড়তে পারে না। ঘটনাচক্রে বিকাশবাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়। শোনা যায় বিকাশবাবু তাঁর ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছিলেন এই বলে যে জীবনে অন্তত আড়াইশো মেয়ে নাকি তাঁর প্রেমে পড়েছে, প্রয়োজন বোধ করলে সমালোচক খোঁজ নিতে পারেন, তিনি ঠিকানা দেবেন।

সে যাই হোক, সাধারণভাবে দেখলে তাঁর চেহারা হয়তো সুন্দর নয়। তাঁর রঙ ফ্যাকাশের উল্টো, শরীরে মেদ নেই, মুখে আদুরে দুলালের ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে চোখে মুখে তাঁর যে বুদ্ধির ছাপ আছে তা মোটেই বারোয়ারি নয়। আর তাঁর মার্জিত মনের পরিচয় তাঁর সুচারু বেশে, তাঁর পরিমিত ঝকঝকে কথাবার্তায়, তাঁর আচার-ব্যবহারে।

বিকাশবাবুকে যাঁরা ভালোভাবে চেনেন তাঁরা জানেন যে বিকাশবাবু শুধু ভদ্র নন, বুদ্ধিমানও। তার চেয়ে বড় কথা হল তিনি কল্পনাপ্রবণ, খেয়ালী। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আজও তিনি নিয়মিত আড্ডা দেন। ছেলেবয়েসে যে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছেন, কৈশোরে যাঁদের উপহার দিয়েছেন বই আর চকোলেটের বাক্স, আজও তাঁরা তাঁর প্রিয় বান্ধবী। সবকিছু মিলিয়ে বিকাশবাবুর মধ্যে এমন একটা

আকর্ষণী ক্ষমতা আছে যে, একবার যে তাঁর পরিচয় পেয়েছে, তাঁকে জেনেছে, তাঁরা তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেনি।

বিকাশবাবু যে জাতের, যে রুচির, যে মহলের লোক আজকের বাংলা চিত্র জগতে তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। মনের দিক থেকে তিনি একেবারে আধুনিক। স্কুল-কলেজে কবিতা লিখেছেন। পরবর্তী জীবনে কবিতা না লিখলেও লেখার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। নাটক আর কাব্য তাঁর প্রিয় পাঠ্য হলেও, গ্রন্থে তিনি সর্বভুক। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর প্রিয় লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর টেবিলে আধুনিক বাংলা কবিতা, এলিয়ট এমন কি এজরা পাউন্ড-এরও সাদরে স্থান হয়। তাঁর লাইব্রেরির তাকে আরো পঁচিশ রকম ভারী মোটা গুরুগম্ভীর বইয়ের পাশে পাবেন লুইস্ ক্যারল-এর 'অ্যালিস্ ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' আর 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস', সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' আর 'আবোল তাবোল'। স্বীকার করতেই হবে পরিণত বুদ্ধি আর সুরুচির এর চেয়ে ভালো সার্টিফিকেট হয় না।

বই কেনা আর বই পড়ার নেশার মতো ছবি দেখারও নিয়মিত অভ্যাস আছে তাঁর। বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর যেমন নেই অহেতুক বৈরিতা, তেমনই নেই অকারণ আগ্রহ। বাংলা ছবির ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতন হলেও তিনি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন। ইংরিজি ছবিও ঘন ঘন দেখার অভ্যাস। আর ইংরিজি ছবির মধ্যে 'টার্জান' সম্পর্কে, তাঁর নিজের কথায়, 'বিশেষ দৌর্বল্য' আছে। কিন্তু তাঁর মনে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করেছে অরসন ওয়েলস-এর 'সিটিজেন কেন' ছবিখানা। নিজে তিনি 'সিটিজেন কেন'-এর নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন— এই স্বপ্ন তিনি নাকি প্রায়ই দেখে থাকেন।

বিকাশবাবুর এই কথার মধ্যে কেউ হয়তো আত্মম্ভরিতার ছাপ দেখবেন। কারণ 'সিটিজেন কেন' হচ্ছে সেই ধরনের দুর্মদ লোক যাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজের সত্যিকারের প্রতীক, অর্থ ও শক্তির জন্য সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে সমাজের শীর্ষ-স্থান যাঁরা অধিকার করে আছেন। আত্মম্ভরিতা বিকাশবাবুর আছে কিনা বলা শক্ত তবে আত্মপ্রত্যয় আছে তাঁর যথেষ্টই। 'সিটিজেন কেন' ছবি তাঁর যে এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে যেসব মার্কিন ছবি বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার মধ্যে 'সিটিজেন কেন' অন্যতম। ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের বড় বড় চিত্রপরিচালকেরা বার বার স্বীকার করেছেন যে তাঁরা নিজেরা গভীরভাবে এই ছবি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, অরসন ওয়েলস তাঁদের সাহায্য করেছেন নতুন রসের উৎসের, নতুন পথের সন্ধান দিতে।

বর্তমান পৃথিবীতে কোনো দেশের পক্ষেই কোনো ব্যাপারেই বহির্জগতের প্রভাব কাটিয়ে নিঃসম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, চলচ্চিত্রের পক্ষে একথা আরো সত্য। আমাদের দেশে যাঁরা অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে ইঙ্গ-মার্কিন ছবির খারাপ দিকগুলোর অন্ধ অনুকরণ করেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অভিনবত্বের ধুয়ো ধরে চিৎকার করেন। বিকাশ-

বাবুর মতে তাই বাইরের প্রভাব যখন আসবেই, তখন অজ্ঞানে না এসে সজ্ঞানে, মন্দ না এসে ভালো জিনিসটুকু আসাই ভালো। বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুর-ধরার মধ্যে বিকাশবাবু বিচক্ষণতা দেখেন না।

বিকাশবাবুর এই কথাগুলো ভেবে দেখার মতো। বাইরের জগৎ থেকে যন্ত্রগত কৌশল, চলচ্চিত্রের আঙ্গিক, শিল্পসৃষ্টির উপায়গুলো যদি আমরা চোখ মেলে দেখেশুনে নিতে পারি তা হলে তাই দিয়েই আমাদের নিজেদের দিশি ছবির বিশিষ্ট ভাষা গড়তে পারব, নিজেদের জাতীয় জীবনের সত্তাকে যথার্থ রূপ দিতে পারব, সগৌরবে তুলে ধরতে পারব পৃথিবীর সামনে। এবিষয়ে নতুন পথের সন্ধান যাঁরা দিতে পারবেন, আমরা আশা করি বিকাশ রায় তাঁদের মধ্যে একজন।

অভি ভট্টাচার্য

প্রাথমিক পরিচয় আর নমস্কার বিনিময়ের পর দুজনে একটুকাল চুপ করে রইলাম। তারপর অভিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, বললেন—'খুব শক্ত প্রশ্ন করবেন না যেন, ঘাবড়ে যাব।'

অবশ্য ঘাবড়ে যাওয়ার মতো চেহারা অভিবাবুর মোটেই নয়। ঋজু দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান দেহ, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

হেসে বললাম, 'আমি প্রশ্ন করতে আসিনি, আলাপ করতে এসেছি। তবু আপনি একটু ঘাবড়ে গেলেই আমার সুবিধা হয়।'

অভিবাবু হাসলেন, 'তাই নাকি? কেন বলুন তো?'

বললাম, 'নেতারা আর অভিনেতারা ঘাবড়ে না গেলে সত্যকথা বলেন না।'

অভিবাবু এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর সিগারেটের কৌটোটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে গম্ভীর মুখে বললেন, 'তাহলে আপনি নিজেই এতক্ষণ মিথ্যাকথা বলছিলেন। আপনি আলাপ করতেও আসেননি, গল্প করতেও আসেননি। এসেছেন তথ্য সংগ্রহ করে নিতে। বেশ, বের করুন আপনার নোট বুক, লিখুন আমার নাম – শ্রীঅভি ভট্টাচার্য, পিতার নাম সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, সাকিন রাজসাহী, বয়স তিরিশ। হ্যাভ্ ইউ ফিনিশড্?'

আমি সকৌতুকে অভিবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ফুটবল আর ক্রিকেটে তাঁর আসক্তি আছে শুনেছি, কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎকারীর সঙ্গেও যে তিনি খেলায় মেতে উঠতে পারেন তা চাক্ষুষ দেখলাম।

অভিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'ওকি, আপনি এখনো নোটবুক বার করেননি যে?'

বললাম, 'আমার নোটবুকের দরকার হয় না।'

অভিবাবু বললেন, 'বলেন কি! মনে মনে সব মুখস্ত করে নেবেন? কিন্তু যদি ভুল হয়?'

বললাম, 'হয় তো হল। খাঁটি তথ্যের ওপর আপনার তো অনুরাগ নেই।'

অভিবাবু বললেন, 'সর্বনাশ। তাই বলে সেই বিরাগটা কি আমার নিজের ওপরই চালাতে বলেন নাকি আপনি। ধরুন, আমি উ'চু পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি, ওজন এক মন চৌত্রিশ সের, মনের ভুলে আপনি ফিগারে এমন গোলমাল করে দিলেন যে, যারা আমার ছবি দেখেনি তারা আমাকে একটি বে'টে, মোটা, গদাই গণেশ বলে ভেবে রাখল। ডিরেক্টাররাও যদি তাই ভাবেন তাহলেই হয়েছে আর কি!'

হেসে বললাম, 'তবেই দেখুন। তথ্যকে যতখানি অকিঞ্চিৎকর বলে ভেবেছিলেন আসলে তা ততখানি অকিঞ্চিৎকর নয়। পান থেকে চুন খসলে কোনো কোনো সময় বিশ্বব্রহ্মান্ডই খসে পড়ে। সংসারে রিপোর্টারেরও প্রয়োজন আছে, তার নোট-বুকটাকেও একেবারে অদরকারী বলে ফেলে দিতে পারেন না।'

অভিবাবু আপত্তি করে উঠলেন, 'কে ফেলে দিতে চাইছে? কে বলছে অদরকারী? আমি আগের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি মশাই, ঘাট স্বীকার করছি। বের করুন আপনার নোটবুক। আমি শান্ত বালকের মতো বলে যাই, আপনি সুবোধ রিপোর্টারের মতো লিখুন।'

অভিবাবু সিগারেট ধরিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শরীরের ভঙ্গিতে একটু শিথিলতা আনলেন।

মাথা নেড়ে বললাম, 'দেখুন ঠিক তাতে আমার কাজ হবে না। তাছাড়া রিপোর্টারের পক্ষে যতই ওকালতি করি না কেন, জাত রিপোর্টার আমি নই। তার চেয়ে আপনি বরং আপনার জীবনের গল্প বলুন।'

অভিবাবু সোজা হয়ে বসলেন, 'এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই আপনি আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছেন। যখন তখন ফরমায়েস করলেই বুঝি গল্প বলা যায়? তা যায় না। নিজের জীবনেরও না, পরের জীবনেরও না, তার চেয়ে রিপোর্টারকে তথ্য যোগানো বরং অনেক সহজ।'

চাকর ভিতর থেকে চা নিয়ে এল। পাওয়ামাত্র আমি চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। অভিবাবু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চায়ে চুমুক দিলেন না। খেলাচ্ছলে কাপটাকে একটু একটু ঘোরাতে লাগলেন প্লেটের উপর। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'কি গল্প শুনতে চান। অভিনয়ের গল্প? তাহলে তো সেই ছেলেবেলা থেকে শুরু করতে হয়।'

'বেশ তো তাই করুন না।'

অভিবাবু এতক্ষণে চায়ে চুমুক দিলেন, 'আপনার কি অত সময় আছে? অর্থাৎ ধৈর্য?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

অভিনয় ছেলেবেলা থেকেই শুরু করেছিলেন অভিবাবু। কোনো পেশাদার যাত্রা থিয়েটারে নয়, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে নিজেই দল বেঁধেছিলেন। গরমের ছুটিতে, পুজোর ছুটিতে তার মহড়া চলত। তখনকার দিনের সেই উত্তেজনা আর আনন্দের তুলনা হয় না। সেসব নাটকের অভিবাবু নিজেই ছিলেন ডিরেক্টার, নিজেই প্রধান অভিনেতা। বই নির্বাচনের ভারও সঙ্গীরা তাঁর উপরই ছেড়ে দিতেন। বেছে বেছে নাটক বার করতেন অভিবাবু, রবীন্দ্রনাথের মুকুট, ডাকঘর। সঙ্গীদের খুব যে মনঃপূত হত তা নয়। তারা চাইত আরো রঙচঙ, রাজ রাজড়ার প্রাচুর্য, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি। কিন্তু গোড়া থেকেই বালক অভির রবীন্দ্রনাথকে ভালো লাগত। তাঁর কবিতা তাঁর নাটক ছাড়া বড় কিছু একটা মনে ধরত না। এই রবীন্দ্রানুরাগ অভিবাবুর আজও অক্ষুণ্ন আছে।

অবশ্য আরো একটু বড় হয়ে কলেজী থিয়েটারে বা পাড়ার শৌখিন রঙ্গমঞ্চে অন্য সব নাট্যকারদের বইতেও নেমেছেন অভিবাবু। নেমেছেন 'কারাগার', 'পি ডবলিউ ডি', 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এ। কিন্তু তাঁর এখনো ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের উপর। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি, 'রাজারাণী' কি 'তপতী'র বিক্রমাদিত্যের মতো গভীর, জটিল চরিত্রকে রূপায়িত করবার প্রবল ইচ্ছা আজও তাঁর রয়েছে।

'কিন্তু সে সুযোগ শিগগির আসবে বলে মনে হয় না', অভিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন, 'আমাদের দেশ রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েছে, গান নিয়েছে কিন্তু নাটক এখনো বুঝতে শেখেনি।'

বললাম, 'বোঝাবার চেষ্টাই কি তেমন করে হয়েছে? যাহোক, আপনার ক্ষেত্রে যোগাযোগটা কিন্তু বেশ মিলেছে। স্ক্রীনে নৌকাডুবিই বোধহয় আপনার প্রথম বই?'

'হ্যাঁ,' অভিবাবু মৃদু হাসলেন, 'রবীন্দ্রনাথেই শুরু। সে হিসাবে নিজেকে ভাগ্যবান বলতে হয়। অবশ্য মূল নৌকাডুবি আসলে নাটকই নয়; রবীন্দ্রনাথের পাকা হাতের উপন্যাসও নয়, তবু রমেশের চরিত্রে যেটুকু জটিলতা আছে—'

বললাম, 'বাইরে দেখে আপনাকে তো খুব সহজ সরল বলেই মনে হয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেখছি খুব জটিলতার ভক্ত।'

অভিবাবু মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

বললাম, 'নৌকাডুবিতে কাজ করে তাহলে আপনি খুব আনন্দ পেয়েছেন?'

অভিবাবু বললেন, 'তা পেয়েছি। সহকর্মীরাও বেশ ছিলেন, দিলীপকুমার, মীরা সরকার। এঁদের টিম ওয়ার্ক-এ আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তাছাড়া প্রথম বইতেই মনোমত ডিরেক্টার পেয়েছিলাম।'

'নৌকাডুবির ডিরেক্টার কে ছিলেন? নীতিন বসুই তো?'

অভিবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। দেশী ফিল্ম ডিরেক্টারদের মধ্যে ওঁকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।'

'আর বিদেশীদের মধ্যে?'

অভিবাবু একটু হাসলেন। 'এইবার আপনার ভিতর থেকে খাঁটি রিপোর্টারি উঁকি দিচ্ছে। বিদেশীদের মধ্যে ভিক্টর ফ্লেমিং, জন ফোর্ড, ভিক্টর স্যাভিল-এর ডিরেকসন আমার ভালো লেগেছে।'

'আর অভিনয়? এখনকার বিদেশী অ্যাক্টর, অ্যাকট্রেসদের মধ্যে কাদের আপনার পছন্দ—এ কৌতূহল কি খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে?'

অভিবাবু হাসলেন, 'অত ভদ্রতা করছেন কেন? আপনাদের কাছে কিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তবু তো ভালো আপনি জিগগেস করেননি কোন রঙের ফুল আমি ভালোবাসি, কোন সেলুনের চুল ছাঁটাই আমার পছন্দ। খুব খ্যাতিমান না হলে বোধহয় এসব ডিটেল্ দেওয়ার সুযোগ পাব না, কি বলেন?'

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই অভিবাবু অ্যাক্টার, অ্যাকট্রেসদের কথায় ফিরে গেলেন। বললেন এখনকার বিদেশী ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের মধ্যে ইনগ্রিড বার্গম্যানকেই তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। আর পুরুষদের মধ্যে ভালো লাগে জেমস স্টুয়ার্ট, চার্লস বয়ার, রনাল্ড কোলম্যান-এর অভিনয়। জিগগেস করলাম, 'খুব সিনেমা দেখার অভ্যাস আছে নাকি?'

অভিবাবু বললেন, 'মোটেই না। ময়রায় কি সন্দেশ খায়?' তারপর একটু হাসলেন, 'সিনেমায় খুব কমই যাওয়া হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু'—একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'অভিনয় করতে তো আপনি ভালোবাসেন।'

অভিবাবু বললেন, 'তা বাসি বই কি। অভিনয় তো কেবল আমার পেশা নয়, আমার নেশা, আমার শখ।'

হঠাৎ বলে বসলাম, 'এ শখটাকে আপনার পরিবারের সবাই কিভাবে নিয়েছেন?'

অভিবাবু আবার একটু গম্ভীর হলেন, 'এবার আপনার কৌতূহল বৈঠকখানা থেকে অন্তঃপুরে ঢুকতে যাচ্ছে।'

'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—'

'আপত্তির বিশেষ কিছু নেই। আর সবাই যেমন, তেমন বাবা এই ফিল্মে নামাটাকে বিশেষ ভালোর চোখে দেখেননি। খুবই আপত্তি করেছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ, রাশ-ভারি জমিদার। ফিল্ম-জগতের আবহাওয়া সম্বন্ধে যেসব কথা তাঁর কানে গেছে তাতে ছেলেকে এর মধ্যে ছেড়ে দিতে তাঁর মন সরেনি। তাঁর মত ছিল না।'

অভিবাবু ফের গম্ভীর হলেন।

পিতাপুত্রের সংঘাতটা কতখানি তীব্র হয়েছিল সে প্রশ্নটা চেপে গিয়ে বললাম, 'আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে এসম্বন্ধে আপনি কি কারও সাহায্য, কারও সমর্থনই পাননি?'

অভিবাবুর মুখের ভাব ফের স্নিগ্ধ হয়ে এল, বললেন, 'তা পেয়েছি। হিতেনদা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। ফিল্মে ঢুকিয়েছেনও আমাকে তিনিই।'

'তিনি কে?'

'হিতেন চৌধুরী, আমার আত্মীয়। বহুদিন থেকে ফিল্মের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

তারপর বললাম, 'আচ্ছা, অভিনয় ছাড়া শিল্পকলার আর কোন কোন দিক আপনার পছন্দ। যেমন ধরুন গান?'

অভিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, গান আমি ভালোবাসি।'

'নিজে গান তো?'

'তা গাই বইকি।'

'জলসা টলসায়—'

অভিবাবু বললেন, 'না, ঠিক জলসাঘরে না, তবে জলঘরে বলতে পারেন। বাথরুমে।'

হেসে বললাম 'বাথরুমে গান তো আমরা সকলেই করি। আচ্ছা, আপনার বেশি ভালো লাগে কোন শ্রেণীর গান?'

অভিবাবু জবাব দিলেন, 'সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিশেষ করে তাঁর ক্ল্যাসিকল্ ঢঙের আগেকার সুরগুলি।'

বললাম, 'আঁকা ছবি সম্বন্ধে আপনার উৎসাহ আছে?'

'অনেকের ছবিই ভালো লাগে তার মধ্যে মনীষী দে, দেবীপ্রসাদের নাম করা যায়।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনার বিশেষ ধরনের হবি নেই কিছু?'

অভিবাবু হেসে উঠলেন, 'ছবির পরেই বুঝি হবি? আপনি নিশ্চয়ই কবি-টবি কেউ হবেন। না হলে এমন মিল দিয়ে দিয়ে কথা বলছেন! না, টিকেট জমানো কি ঘুড়ি ওড়ানো ধরনের কোনো হবি আমার নেই। তবে ঘুরে বেড়ানোটাকে যদি হবি বলেন তা কিছু কিছু আছে।'

বললাম, 'বাইরে কোথাও গেছেন নাকি?'

অভিবাবু মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। তারপরে ক্রমে অনেক কথাই বেরিয়ে পড়ল, মানে অনেক দেশের কথা। ঘুরে বেড়ানো একটা মস্ত বড় বাতিক অভিবাবুর। ট্রেনে চাপবার সুযোগ তিনি বড় একটা হাতছাড়া করেন না। উত্তর-পূর্ব বঙ্গের ময়মনসিং, পাবনা, কুচবিহার থেকে শুরু করে বিহার, উত্তর প্রদেশ, সমুদ্র উপ-কূলের বোম্বাই, করাচি অনেক জায়গাতেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভারতের বাইরেও গেছেন কয়েকবার, ইরাক, ইরান পর্যন্ত।

দেশের নামগুলিই কেবল শুনলাম। ভ্রমণের গল্প আর শোনা হল না। তত সময় ছিল না। কিন্তু যে দুটি একটি কথা অভিবাবু বললেন তাতেই বুঝতে পারলাম তাঁর ঘুরে বেড়ানোটা বিবাগী কি বৈরাগীর না, পরম অনুরাগীর। দু চোখ খোলা

রেখে তিনি বেড়িয়েছেন। পাহাড় আর সমুদ্র দুই-ই তাঁকে বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। জিগগেস করলাম, 'আবার শিগগির বেরুবেন নাকি?'

অভিবাবু হাসলেন, 'ইচ্ছা থাকলেও এখন আর উপায় নেই।'

'কেন?'

অভিবাবু বললেন, 'আপাতত চলচ্চিত্রই তো অচল করে রেখেছে। কতকগুলো কনট্রাক্টে বাঁধা পড়ে গেছি। নড়বার জো নেই।'

'নৌকাডুবি'র পরে আরো অনেক বইয়ে কাজ করেছেন অভিবাবু। 'দেবদূত', 'মায়ের ডাক', 'অশ্রু', 'বিষের ধোঁয়া', 'চিতা বহ্নিমান', 'ভৈরব মন্ত্র'। কোনো কোনোটির কাজ শেষ হয়েছে, কোনো কোনোটির স্যুটিং চলছে এখনো।

চাকর এসে তাড়া দিল, 'চান করবেন না বাবু, কত বেলা হয়ে গেল।'

অভিবাবু হেসে বললেন, 'হোক, তুই অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন।'

কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবার আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, বললাম, 'এবার চলি। অনেক সময় নিলাম আপনার; হয়তো অনেকক্ষণ ধরে বিরক্তও করলাম।'

'পৃথিবীতে ফর্মালিটি ছাড়া আর কিছুতেই আমি বিরক্ত হইনে।' স্মিতমুখে বিদায় নমস্কার জানিয়ে অভিবাবু জোড় হাত কপালে ছোঁয়ালেন।

*

অভিনেতা হতে চান?

জে-আর্থার-র‍্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠানে অভিনয়ের জন্য লোক নির্বাচনের ভার ডেভিড হেনলির উপর। প্রতি সপ্তাহে শতশত মেয়ে পুরুষ অভিনেতা হওয়ার বাসনা জানিয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। এ'দের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করা কঠিন কাজ। হেনলি খুঁজে ফেরেন দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতেও যাঁদের ব্যক্তিত্ব আর অভিনয়-প্রতিভা সুস্পষ্ট। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রশ্নাবলী তৈরি করেছেন। প্রত্যেক অভিনয়-অভিলাষীকেই এই প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে হয়। মেয়ে পুরুষের জন্য একত্র যে দশটি প্রশ্ন হেনলি ঠিক করেছেন তা হচ্ছে এই :

১] দৈহিক শ্রী-র চাইতেও যেটা বেশি প্রয়োজন সেই আসল অভিনয়ের প্রতিভা কি আছে আপনার?

২] অভিনেতা হওয়ার জন্য খুব কি চেষ্টা করেছেন? শখের অভিনেতা-সম্প্রদায়ে অভিনয় করে অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু?

৩] আপনার বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিত্ব আছে তো? না অন্য কোনো নামকরা অভিনেতার আপনি প্রতিচ্ছায়া? (অন্য অভিনেতার প্রতিচ্ছায়া হলে প্রয়োজন নেই।)

৪] কণ্ঠস্বরে আবেগ আছে? আকর্ষণ আছে?

৫] উচ্চারণ সুস্পষ্ট, যথাযথ? কথায় কোনো টান নেই তো?

৬] বিশেষ কোনো ঢং-এ কথা বলার ঝোঁক নেই তো?

৭] আপনি জানেন 'বাইরে থেকে ঘরে আসা' আর 'হঠাৎ এসে প্রবেশ করার' মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৮] চলতে ফিরতে, হাঁটতে বসতে সর্বদা সুস্থির ভাব রাখতে পারেন তো?

৯] ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক রুচি-সঙ্গত পোশাক পরেন তো?

১০] ধরুন আপনি নির্বাচিত হলেন, দুবছর কঠোর পরিশ্রম করে অভিনয়ও করলেন। তার পরেও অভিনয়-বিশারদ যদি বলেন—'পরিশ্রম করলে এ'র হতে পারে' —তা হলে তাঁর কথা মানবেন তো?

সিনেমা নিয়ে সভা-সমিতি করা ব্যাপারটা এখনো আমাদের দেশে প্রায় অপরিচিত। কালে ভদ্রে যা হয় তা নিতান্তই ব্যবসা-ঘটিত ব্যাপার, যেমন কাঁচা ফিল্মের ঘাটতি, চলচ্চিত্র জগতে ছাঁটাই সমস্যা কিংবা বোম্বাই আগত জাঁদরেল পরিচালকদের সম্মানের জন্য চা-সম্মেলনে বক্তৃতা। সাহিত্য বা চিত্রকলা নিয়ে যেমন আলোচনা চলে, সম্মেলন হয়, বৈঠক বসে, গুরুত্বপূর্ণ বই, প্রবন্ধ পত্রিকাদি বেরোয়, সিনেমার ক্ষেত্রেও যে তা হতে পারে এটা নাক-উঁচু শিক্ষিত মহলে হাস্যকর, ছাপোষা বাঙালীর কাছে অবিশ্বাস্য, সিনেমা-মহলের কাছে নিষ্কর্মা যুবকদের খামখেয়াল।

এক বছর আগেকার কথা বলি। সোসাইটির কাজে ক'দিন ধরে জনৈক সরকারি কর্মচারীর অফিসে হাঁটাহাঁটি করছি। দু'তিনবার যাতায়াতের পর সাক্ষাতের সৌভাগ্য হল। উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত তদুপরি সরকারি কর্মচারী। যে কাজে তাঁর স্বারস্থ হয়েছিলাম তা সম্পন্ন করতে হলে আমাকে প্রমাণ করতে হয় যে সিনেমা জিনিসটা শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা কি সংস্কৃতির কোনো না কোনো কোঠায় পড়ে। নানা নজির দেখিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করলাম। একটু আশান্বিত হয়ে উঠছি, এমন সময় তিনি বললেন : 'দেখুন মশায়, সে হয় না। সিনেমার সঙ্গে আর্ট বা সায়ান্স, শিক্ষা বা কালচারের কোনো সম্পর্ক নেই। সস্তা এণ্টারটেইনমেণ্ট ছাড়া সিনেমার মধ্যে আর কি আছে বলুন?'

আরেকটা ঘটনা বলি। জনৈক সভ্যের বাড়িতে তেতালার ঘরে সোসাইটির আলোচনা-সভা বসেছে। একজন সভ্য দেরিতে এসেছেন, ঠিক কোথায় সভা হচ্ছে জানেন না, ভাবছেন কাকে জিগগেস করে নেওয়া যায়। এমন সময় দুই হাতে দুই জলের বালতি নিয়ে সিঁড়ির মুখে দেখা দিলেন এক ভদ্রমহিলা।

ভদ্রলোক : 'দেখুন, এখানে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মীটিং হচ্ছে?'

মহিলা : 'কিসের মীটিং? ফিলিমের? ওসব ফিলিম-টিলিম এখানে হয় না।'

ভদ্রলোক : 'কিন্তু আমাকে তো এই ঠিকানাই দেওয়া হয়েছে—দেখুন তো এই বাড়িই কিনা!'

মহিলা : 'নম্বর তো এই বাড়িরই দেখছি।'

ভদ্রমহিলার ভুরু কুঁচকে উঠল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ওপরে কিছু লোকের জটলা দেখে এসেছেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে আমাদের সভায় বোমা ফেটে পড়ল যেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মহিলা কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন : 'এসব ফিলিম-টিলিম এখানে চলবে না বলে দিচ্ছি। যত সব ইয়ে এসে জুটেছে—'

এই রকম নানা গণ্ডগোল দেখে বহু চেষ্টায় বালিগঞ্জ পাড়াতে একটি ঘর ভাড়া করা হল। সেই ঘরে যাতায়াতের পক্ষে যে পথটা সুবিধের সেটা আবার মূল বাড়ি-ওয়ালারও পথ। একদিন সভা যখন মাঝপথে পৌঁছেছে তখন ঘরে হঠাৎ মূল বাড়িওয়ালার আবির্ভাব। তিনি শুনেছেন আমরা নাকি ফিলিমের লোক। আমাদের দেখে এমনি বেশ ভদ্রই মনে হচ্ছে কিন্তু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি বাস করেন, ফিলিম-টিলিম তো এখানে চলবে না। বিশেষত যাতায়াতের পথ যখন একই। 'ধরুন, আপনারা ঢুকছেন, আর আমার স্ত্রী ওপর থেকে নামছেন, তখন যদি ক্ল্যাশ্ করে তা হলে কি হবে?' এ বাড়িরও পাট চুকল। ছবি দেখেন এ বাড়ির সকলেই, মায় বুড়ো কর্তাটি পর্যন্ত। কিন্তু যাঁরা ছবি বানায় তাঁদের সংস্পর্শে আসা এঁদের পক্ষে মানহানিকর।

এমন কি সিনেমাকারদের নিয়েও নানা ঝঞ্ঝাট আছে। তাঁদের অনেকে মনে করেন ফিল্ম সোসাইটিটা কোনো এক রকমের ব্যবসা, বিশেষত সিনেমাগৃহের মালিকদের এ সন্দেহটা বেশি। অন্যেরা তাচ্ছিল্য করেন, বলেন : 'ওসব ক্লাব-ট্যাব করে কিছু হবে না।' যাঁরা কিছুটা বোঝেন তাঁরাও বলতে ছাড়েন না : 'বই-পড়া বিদ্যে আমরা ঢের দেখেছি। থিয়োরিতে সবই হয়।' থিয়োরির চর্চা করা, ভালো ছবিকে বিশ্লেষণের চোখে দেখা, সিনেমা সম্বন্ধে বই পড়া, সে বিষয়ে লেখা কিংবা আলোচনা করার প্রয়োজন যাঁরা বোঝেন তাঁদের সংখ্যা এখনো অতিশয় কম।

উচ্চশিক্ষিত সরকারি চাকুরে, মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলা, বয়স্ক বাড়িওয়ালা, ফিল্ম-নির্মাতা-মহল—সিনেমা বিষয়ে মতামত মোটামুটি সকলেরই এক রকম। দৃষ্টান্ত-গুলিতে হয়তো বাড়াবাড়ি আছে মনে হতে পারে—সত্যি হলেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা সব সময় পুরো সত্যির হদিস দেয় না—সকলের মনোভাব হয়তো ফিল্ম সোসাইটির প্রতি এতটা বিরূপ নয়। কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী, মধ্যবিত্ত বাঙালী ও সিনেমাকার কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সভ্য আছেন। তবু সব মিলিয়ে ফিল্ম-এব সামাজিক প্রতিষ্ঠা এখনো সামান্যই, বাগানবাড়ির বৈঠকের আমেজটা এখনো লোপ পায়নি। সিনেমার গুরুত্ব স্বীকার করার লোক এখনো নিতান্ত বিরল।

কিছুকাল পূর্বে চার্লস হার্ভে নামক এক ইংরেজ লেখক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সম্প্রতি-লুপ্ত বিখ্যাত 'হরাইজন্' পত্রিকায় তাঁর যে ভ্রমণবৃত্তান্ত বেরোয় তাতে

তিনি লিখেছিলেন : 'ক্যালকাটা ইজ এ সিটি হোয়্যার দেয়ার ইজ নো ফিল্ম সোসাইটি।' দুঃখ করেই লিখেছিলেন। কেননা শিক্ষিত ইংরেজের দৃষ্টিতে ফিল্ম সোসাইটি ছাড়া আধুনিক শহরের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ লাগে না। ইংলন্ডে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকায় অসংখ্য ফিল্ম সোসাইটি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাদেরই সমর্থন আর সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে 'বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিট্যুট', 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অভ ফিল্ম সোসাইটিস', 'বৃটিশ ফিল্ম একাডেমী'-র মতো বিরাট প্রতিষ্ঠান; প্রকাশিত হচ্ছে 'পেঙ্গুইন ফিল্ম রিভিউ' (অধুনা বাৎসরিক), 'সিকোয়েন্স', 'সাইট এন্ড সাউন্ড' ইত্যাদি পত্রিকা যাদের মূল্য নানা দেশের ফিল্ম মহলে বিপুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সব ফিল্ম সোসাইটির চেষ্টাতেই সিনেমা বিষয়ে অসংখ্য বই আর পত্রিকাদির কাটতি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সিনেমার ভবিষ্যৎ বনিয়াদ। সিনেমা সম্বন্ধে অগ্রগামী চিন্তার সব চেয়ে বড় ক্ষেত্র হচ্ছে ফিল্ম সোসাইটি।

অপরপক্ষে ১৯৪৭ সালের ৫ই অক্টোবর (চার্লস হার্ভে এর আগে এসেছিলেন বলেই মনে হয়) কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি পত্তন করার পর থেকে আমাদের পথে-ঘাটে চলাই বিপদ হযে দাঁড়িয়েছে। 'হ্যাঁ মশায়, আপনাদের ফিলিম সোসাইটিটা কি ব্যাপার? ফিলিমের আবার সোসাইটি কিসের?' আজ প্রায় তিন বছর ধরে এই একই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি আমি আর সত্যজিৎ রায়। হয়তো অবহেলার সুরে বলি : 'এই ছবি-টবি দেখি, বইপত্র পড়ি, আলোচনা করি। আর বলেন কেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' উৎসাহী লোক দেখলে আরো বিপদ হয়, অফিস পৌঁছতে বারোটা বেজে যায়, বাড়ি পৌঁছতে রাত্তির। সারা পৃথিবীতে সিনেমার যত কিছু সমস্যা আছে সে সমস্ত কিছুর সমাধান করে পকেট থেকে সভ্য হবার কাগজপত্র বার করি, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই হয়তো দেয়ালে ঠেস দিয়ে লেখাজোখা হয। সঙ্গে সঙ্গে যদি চাঁদাটা আদায় হয়ে যায় তা হলে আরেকজন সভ্য বাড়ে। নইলে অনেক সময় ছ' মাসের মধ্যে এই উৎসাহী ব্যক্তির চাঁদা বা চেহারা কোনোটাই নজরে পড়ে না।

গত প্রায় তিন বছরে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির খানিকটা নামডাক হয়েছে, অন্তত আমাদের অস্তিত্বটা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এখনো আমাদের উদ্দেশ্য বা ক্রিয়াকান্ড সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকের নেই। কাজেই সংক্ষেপে এই সোসাইটির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প আর সামাজিক শক্তি হিসেবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে লোককে সচেতন করে তোলা এবং তার মধ্য দিয়ে উন্নততর চলচ্চিত্র সৃষ্টিকে সাহায্য করা। সিনেমা যে বাগানবাড়ির ব্যাপার নয়, তেল নুনের ব্যবসার মতো আরেকটা ব্যবসাও নয়, আজকের দিনে সব চেয়ে ব্যাপক এবং সমাজজীবনে রীতিমতো প্রভাবশালী একটি শিল্প, কাজেই শিক্ষিত লোকের

কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য ছবি ও আলোচনা

কাহিনীচিত্র বা ফীচার

ফরাসী : ১) 'ল্য কাজ ও রাঁসিনিয়ল' (জাঁ দ্রেভী)। ২) 'রেমর্ক' (জাঁ গ্রেমিয়')॥ **মেক্সিকান** : ১) 'মারিয়া কাণ্ডেলারিয়া' (ফার্নাণ্ডেজ)॥ **সুইস** . ১) 'মারি লুইজ' (লিণ্টবার্গ)॥ **রুশ** : ১) 'চাইল্ডহুড অভ ম্যাক্সিম গোর্কী' (ডনস্কয়)। ২) 'ব্যাটল্‌শিপ পোটেমকিন' (আইসেন্‌স্টাইন)॥ **ইংরেজী** : ১) 'দি ওয়ে অ্যাহেড' (ক্যারল রীড)। ২) 'ব্রীফ এনকাউণ্টার' (ডেভিড লীন)॥ **চেক** : ১) 'সাইলেণ্ট ব্যারিকেড' (ওটাকার ভাভ্‌রা)॥ **মার্কিন** : ১) 'দিস্‌ ল্যাণ্ড ইজ মাইন' (জাঁ রেনোয়া)। ২) 'কাউণ্টার-অ্যাটাক' (জল্‌টান কর্ডা)। ৩) 'স্টেজকোচ' (জন ফোর্ড)। ৪) 'লং ভয়েজ হোম' (জন ফোর্ড)। ৫) চার্লি চ্যাপলিন-এর ১৯১৪-১৮তে তোলা এক বা দুই রীলেব নানাবিধ চিত্র॥ **ভারতীয়** · ১) 'রামশাস্ত্রী' (জায়গীরদার)॥

অবিকলচিত্র বা ডকুমেণ্টারি

ইংরেজী : ১) 'নাইট মেইল' (হ্যারি ওয়াট ও বেসিল রাইট)। ২) 'স্টীল' (বৃটিশ কাউন্সিল)। ৩) 'ইনস্‌ট্রুমেণ্টস অভ দি অর্কেস্ট্রা'। ৪) 'স্টেপ্‌স অভ দি ব্যালে'॥ **মার্কিন** : ১) 'নানুক অভ দি নর্থ' (রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি)। ২) 'ন্যাশনাল গ্যালারি অভ আর্ট'॥ **ফরাসী** : ১) 'রদাঁ'॥ **ভারতীয়** · ১) 'ধানের ক্ষেত' (নেকা ফিল্মস্‌)। ২) 'ভারতের আদিবাসী' : পাঁচটি ছবি, রঙিন (ভেরিয়ার এলউইন)। ৩) 'মাদার' (পল জিল্‌স্‌)। ৪) 'চাইল্ড' (পল জিল্‌স্‌)। ৫) 'কমিউনিটি' (পল জিল্‌স্‌)। ৬) 'চিলকা লেক' (হরিসাধন দাশগুপ্ত)। ৭) 'শান্তিনিকেতনে গান্ধিজী' (শম্ভু সাহা)। ৮) 'আসামের লোকনৃত্য', রঙিন (টোর হকান্‌সন্‌)॥ **সুইডীশ** · ১) 'শ্যাডোজ্‌ অন দি স্নো' (আর্ন সুক্সডর্ফ)। ২) 'উইণ্ড ফ্রম দি ওয়েস্ট' (আর্ন সুক্সডর্ফ)। ৩) 'পিপ্‌ল ইন দি সিটি' (আর্ন সুক্সডর্ফ)। ৪) 'কো-অপারেটিভ্‌স্‌'। ৫) 'ল্যাম্পস্‌'। ৬) 'পটারী'॥ **চেক** · ১) 'লাইফ ফ্রম আউট অভ দি রুইন্‌স্‌'। ২) 'গিল্ডহল্ড'। ৩) 'মেটাল ওয়ার্কার্স'। ৪) 'প্রাগ বারোক্‌'॥

আলোচনা

(১) সিনেমা — **জাঁ রেনোয়া** (২) সিনেমার সাজসজ্জা ('লং নাইট' ছবির সাহায্যে) — **ইউজিন লুরিয়ে** (৩) চিত্রনাট্য — **জ্যোতির্ময় রায়** (৪) ডকুমেণ্টারি — **পিটার হপকিনসন** (৫) ডকুমেণ্টারি — **পল জিল্‌স্‌** (৬) আদিবাসীদের ছবি তোলা — **ভেরিয়ার এলউইন** (৭) ক্যামেরাম্যানের ডায়েরি — **নিমাই ঘোষ** (৮) সিনেমার আঙ্গিক — **চিদানন্দ দাশগুপ্ত**।

সমবেত আলোচনা

(১) চার্লি চ্যাপলিন-এর **'মঁসিয়ে ভার্দু'** (২) লরেন্স অলিভিয়ার-এর **'হ্যামলেট'** (৩) উদয়শংকরের **'কল্পনা'**।

চর্চার যোগ্য—এটা জোর গলায় প্রচার করা ও প্রমাণ করা কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম কাজ। সিনেমার কান্তিতত্ত্ব, আঙ্গিক, তার উপরে সামাজিক প্রভাব, বিভিন্ন দেশে সিনেমার প্রকৃতি, বিশেষত অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সিনেমার শোচনীয় অবস্থা নিয়ে শিক্ষিত সমাজকে ভাবিয়ে তুলতে পারলে শেষ পর্যন্ত এদেশী সিনেমার উপরেও তার প্রভাব পড়বে এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু চর্চা ছাড়া নিছক প্রচারে সার্থকতা নেই, তাই সাধারণ সিনেমায় যা দেখতে পাওয়া যায় না সেই ধরনের নানা দেশীয় উৎকৃষ্ট কাহিনীচিত্র ও অবিকল্পচিত্র (ডকুমেণ্টারি) দেখানোর ব্যবস্থা এখানে করা হয়। তা ছাড়া সিনেমা সম্পর্কে বই ও সাময়িকপত্রের লাইব্রেরি আছে, আলোচনা-সভা, লেখা ইত্যাদির সাহায্যে উন্নত-স্তরে সিনেমার চর্চাকে ব্যাপক করে তোলার নানা প্রচেষ্টা আছে। গত আড়াই বৎসরের কার্যক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাবনিকাশ করলে এই প্রচেষ্টা কতদূর এগিয়েছে তা বোঝা যাবে।

স্থানাভাবে কেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি ও আলোচনা সম্বন্ধেই বলা হল। কলকাতা শহর সম্বন্ধে সোসাইটির উদ্যোগে একটি চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল, অর্থাভাবে ছবি তোলা হয়নি। বর্তমানে ১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটি অ্যামেচার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠানের চেষ্টা চলছে। সোসাইটির সভ্যসংখ্যা এখন পঁচাত্তর। চিঠিপত্রের ঠিকানা ২৮নং পণ্ডিতিয়া প্লেস।—**চিদানন্দ দাশগুপ্ত (যুগ্ম-কর্মসচিব)**

আগামী দিনের চলচ্চিত্র

ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র যে সম্পূর্ণ অন্যরকমের হবে সেটা প্রায় নিশ্চিত। প্রতি নিয়তই চলচ্চিত্রে এটাওটার একটুআধটু পরিবর্তন হয়ে চলেছে—যার ফলে দর্শকদের আনন্দ অজ্ঞাতসারে বাড়ছে।

ধরুন অ-বাক যুগের বিখ্যাত ছবি 'ইফ উইণ্টর কাম্‌স্‌'-এর সবাক সংস্করণ। ছবিখানা দেখার সময় তার আলোক্ষেপণ পদ্ধতি বিশেষ করে লক্ষ্য করবেন। ক্যামেরাম্যান জর্জ ফল্‌সে প্রচলিত নিয়মে আলোর সহায়তা না নিয়ে আগাগোড়া ছবিখানা তুলেছেন প্রতিফলিত আলোর সাহায্যে। ফলে ছবির দৃশ্যে আর চরিত্রে একটা নিটোল গভীরতার গুণ ফুটে উঠেছে। আলো প্রতিফলিত হয়েছে শাদা রেশমী চাদর কিংবা শাদা দেয়াল থেকে। ছবি আঁকার সময় শিল্পীরা যেমন উত্তর আকাশের স্থির আলোয় কাজ করেন, চলচ্চিত্রের অভিনেতারাও প্রচলিত আলোর তলায় সতর্ক হয়ে চলাফেরা করার পরিবর্তে প্রতিফলিত স্থির আলোয় সুস্থির ভাবে অভিনয় করতে পেরেছেন।

আর্কিল দ্যুফ্যুর নামে এক ফরাসী ক্যামেরাম্যানের আবিষ্কার এর চাইতেও চমকপ্রদ। তিনি তাঁর প্রকাণ্ড ক্যামেরার মধ্যেই অভিনয়ের দৃশ্যপট সম্বলিত মডেল ঢুকিয়ে এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে বিপুলব্যয়ে সেট তৈরির খরচ প্রায় উঠেই যাবে। কেননা অভিনেতারা শাদা একটা পর্দার সামনে অভিনয় করলেই চলবে। দৃশ্যপট তো ক্যামেরার মধ্যেই ভরা আছে।
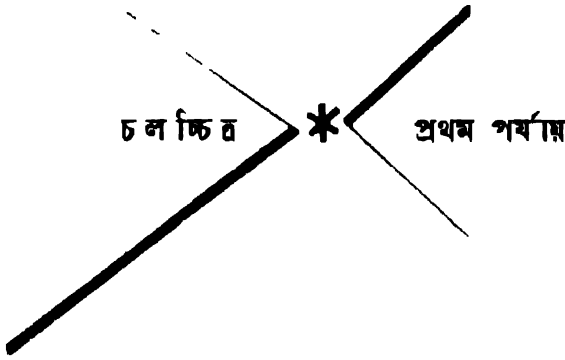
চলচ্চিত্রের জন্য পৃথিবীতে প্রেক্ষাগৃহ আছে প্রায় আশি হাজার। এই আশি হাজার প্রেক্ষাগৃহে প্রতিসপ্তাহে দর্শক হয় কমবেশি ত্রিশ কোটি। আশা করি এই ত্রিশ কোটির মধ্যে প্রতিসপ্তাহে না হোক, অন্তত প্রতি দুসপ্তাহে একবার, আপনিও একজন।

পৃথিবীজোড়া সর্বত্র চলচ্চিত্র আজ জীবনধারণের অত্যাবশ্যক অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশেবিদেশে এনিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা আর গবেষণার অন্ত নেই। হলিউড তো আছেই, তাছাড়া ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি যেসব দেশের চলচ্চিত্র সাধারণত আমরা দেখতে পাই না—সেসব দেশেও চলচ্চিত্র নিয়ে বিরাট আন্দোলন চলেছে আজকাল।

নিজের দেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র উৎপাদক দেশ হয়েও ভারতীয় চলচ্চিত্র আমাদের হতাশ করছে কেন—এসব বিষয় প্রগতিশীল মন দিয়ে বিচার করতে হলে এমন একটি দায়িত্বশীল পত্রিকার প্রয়োজন, যে-পত্রিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পটভূমিতে দেশীয় চলচ্চিত্রকে তুলনা করে যথাযোগ্যভাবে আপনার সামনে ধরে দিতে পারে।

বাঙলাদেশের এই অভাব মেটাতে, বিভিন্ন দেশের গুণীব্যক্তিদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে, 'চলচ্চিত্র' পত্রিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। 'চলচ্চিত্র' পত্রিকার আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়: [১] আপনার প্রিয় চলচ্চিত্র-শিল্পীদের বিস্তারিত সরস আলোচনা, [২] সংগীত আর চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংগীতের যোগাযোগ বিষয়ে যোগ্য-ব্যক্তিদের প্রবন্ধ, আর [৩] বিভিন্ন দেশের, বিশেষত এদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পীদের সর্বাধুনিক ছবি। অধিকাংশ ছবিই 'চলচ্চিত্র' পত্রিকার জন্য বিশিষ্ট আলোকচিত্র-শিল্পীরা তুলেছেন এবং তুলবেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ে যদি আপনার যথার্থ কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা থাকে, তাহলে 'চলচ্চিত্র' পত্রিকার প্রতিটি খণ্ডের সঙ্গে আপনার যোগ রাখতেই হবে॥